বনফুল-এর গল্প-সংগ্রহ

দ্বিতীয় শতক

বনফুলের

গল্প-সংগ্রহ

॥ দ্বিতীয় শতক ॥

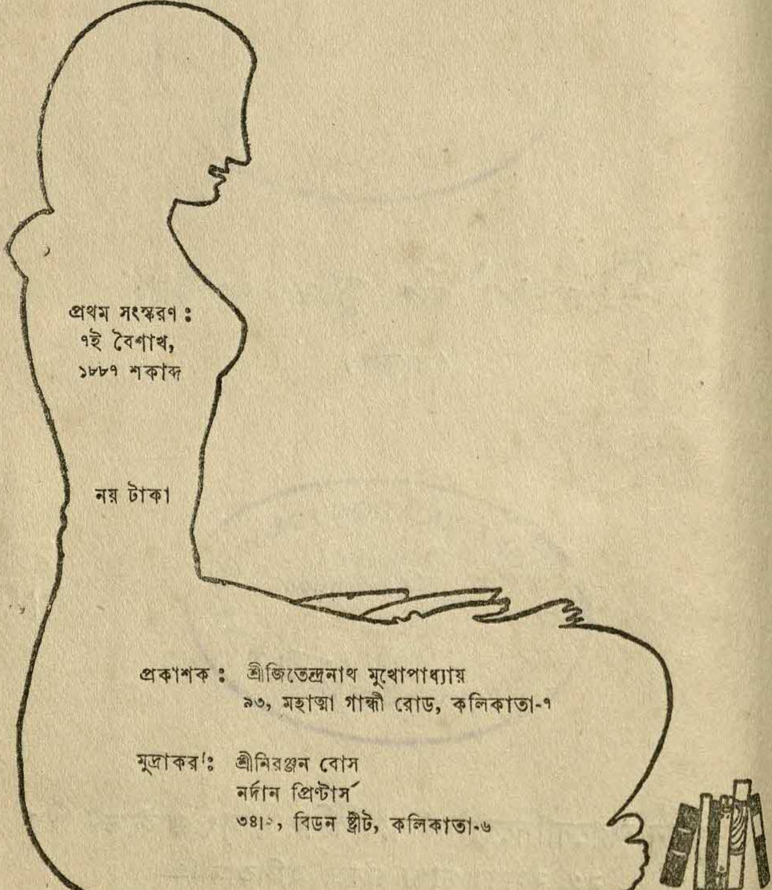
বনফুলের গল্প-সংগ্রহ

দ্বিতীয় শতক

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(বনফুল)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



প্রথম সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ,
১৮৮৭ শকাব্দ

নয় টাকা

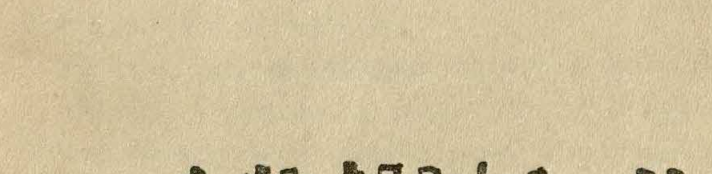
প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীনিরঞ্জন বোস
নর্দান প্রিণ্টার্স
৩৪।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

সহধর্মিণী
শ্রীমতী লীলাবতী মুখোপাধ্যায়ের
করকমলে

ভাগলপুর
৩।৫।৬৫



নিবেদন

গল্প-সংগ্রহ দ্বিতীয় শতক প্রকাশিত হল। প্রথম শতক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ শকাব্দে।

আমার গল্পগুলির একটি ভূমিকা লিখে দেবার জন্য আমি 'যুগান্তর'-সাময়িকীর প্রাক্তন সম্পাদক প্রখ্যাত ইতস্ততঃ-লেখক সুরসিক এককলমী শ্রীপরিমল গোস্বামীকে অনুরোধ করি। সে পত্রাকারে যা আমাকে লিখে পাঠিয়েছে তা ভূমিকা-রূপে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হল।

পরিমল আমার বহুকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার গল্প সম্বন্ধে পত্রটিতে সে যে-সব মন্তব্য করেছে সে-সবের উৎস আমার প্রতি তার অনাবিল প্রেম, না, নৈর্ব্যক্তিক রস-বিশ্লেষণ, তা রসিক পাঠক-পাঠিকারা বিচার করুন। আমি শুধু এইটুকু নিবেদন করছি,—তাকে আমি ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছিলাম সে আমার বাল্যবন্ধু বলে নয়, সে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে একজন নাম-করা সমালোচক, রসিক, রস-স্রষ্টা এবং গ্রন্থকার বলে। তাই এই ভেবে আমি পুলকিত হবার চেষ্টা করছি যে আমার গল্পগুলির রস-বিচারে সে তার স্বাভাবিক মাত্রা-বোধ অক্ষুণ্ণ রেখেছে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও হচ্ছে, কে জানে 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' কথাটাও তো অগ্রাহ্য করবার মতো নয়!

যাই হোক, তার এই সমালোচনার জন্য আমি যা অনুভব করছি তা অনির্বচনীয়। কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের ভাষাও নেই সে অনুভূতির।

আশা করি আমার এ নীরব অনুভূতির মর্ম মরমী পরিমলের অন্তরে গিয়ে পৌছবে।

৩।৫।৬৫ **বনফুল**

ভাগলপুর

ভূমিকা

ভাই বলাই,

তোমার ছোটগল্প লেখার প্রথম দিনগুলির সঙ্গে আমি কিঞ্চিৎ জড়িত আছি, তাই সম্ভবত আমি তোমাকে সহজে বুঝতে পারি। তার আরও কারণ আমি তোমার চরিত্রের সঙ্গেও পরিচিত। তোমার চালচলনে এমন একটি ঋজুতা এবং চিন্তায় এমন একটা স্বচ্ছতা আছে যা তোমার ব্যক্তিসত্তাকে এক অদ্ভুত আকর্ষক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। তোমার এই চরিত্র তোমার লেখার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। তোমার ছোটগল্পের মধ্যে তাই তোমার চরিত্রটিকেই আমি দেখতে পাই।

তোমার কল্পনাশক্তি বহুবিস্তারী। স্বর্গ মর্ত পাতাল ঘুরে আসা তোমার পক্ষে এক নিশ্বাসের ব্যাপার।

তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ, তার মধ্যে যেখানেই চিত্রধর্মিতা আছে তাকেই তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়। এই বেঁধে ফেলার কাজটি তোমার এমন দ্রুত এবং পাকা যে পড়তে বসলে মনে হয় এর জন্য তোমাকে যেন কোনো পরিশ্রমই করতে হয় নি। যেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপর তড়িৎগতিতে তার ছাপ পড়ে গেছে। বাক্যের বৃথা ব্যয় নেই, সরল সহজ ছবি।

সবই যে প্রচলিত প্রথা মান্য ক'রে ছোটগল্প হয়েছে তা নয়, কিন্তু তারা প্রথা অমান্য ক'রেও ছোট গল্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। একই উদ্দেশ্য, ছবি আঁকা। শিল্পসৃষ্টিতে কোনো নির্দিষ্ট ফর্মে আবদ্ধ থাকা তোমার ধাতে নেই।

মানুষের জীবনকে তুমি চলচ্চিত্রের মতো দেখেছ। জীবনের স্রোত, বিচিত্র মানুষের স্রোত, ভেসে চলেছে সম্মুখ দিয়ে, তুমি বসে আছ পাশে—তার এক একটি মুহূর্তকে টেনে তুলে এক একটি ছবি রচনা করবে ব'লে। মাছরাঙা মাছের আশায় যেমন জল থেকে একটু উঁচু জায়গায় বসে থাকে, তেমনি। তোমার গল্প ধরা আর তার মাছ ধরার মধ্যে কোনো তফাত নেই।

তোমার হাতের এই সব জীবন অথবা চরিত্র-চিত্রণ বিচিত্র, সংখ্যা অগণিত। নির্দিষ্ট পরিসরে এমন বহু বিচিত্র ছবি দেখা কম শিল্পীর ভাগ্যেই ঘটে। শুধু তাই নয়, তোমার গল্পের একটি বড় গুণ এই যে তুমি যে-গল্পই লেখ, তারই প্রথম লাইন পড়লে শেষ লাইন পর্যন্ত না প'ড়ে উপায় থাকে না। তোমার ভাষার মধ্যে কোনো খেলা নেই, অথচ তোমার প্রত্যেকটি বাক্য সরস। এবং তার প্রকাশ এমন তড়িৎগতি এবং প্রবল যে তা পাঠকমনকে তার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে। সমস্তটাই যেন এক জাতীয় জাপানী চিত্রকরের মতো তুলির একটানে আঁকা। তোমার গল্পের এই ফর্ম তোমার গল্প থেকে পৃথক কোনো বস্তু নয়। রক্ত-মাংসে গড়া একটি জীবন্ত মানুষের 'ফর্ম' যেমন তার সত্তা থেকে পৃথক নয়।

তুমি বিজ্ঞানী এবং তুমি কবি—তোমার গল্পে এ দুয়ের অদ্ভুত মিলন ঘটেছে। তার ফলে শিল্পীর নিস্পৃহতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা মিলে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বতন্ত্র করেছে। গল্পের বৈচিত্র্যও এরই জন্য। এই বৈচিত্র্য মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগে কতকগুলি গল্প বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু নির্মমতার পর্যায়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কশাই গল্পটি। এ রকম গল্প ইংরেজীতে অনেক লেখা হলেও বাংলায় এই বোধ হয় প্রথম। একটু বেশি নিষ্ঠুর। আর এক ভাগে পড়েছে কাব্যপ্রধান রচনা। সেগুলো গীতিকবিতার মতোই মধুর। রাত দুপুরে, মালাবদল, অধরা, প্রজাপতি প্রভৃতি।

তোমার তাজমহল, গণেশজননী, স্মৃতি প্রভৃতি গল্পে তোমার দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থরূপে মিলন ঘটেছে। এ গল্পগুলির তুলনা হয় না। আমার মতে এই গল্পগুলির ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় বা এশিয়ার নানা ভাষায়

অনুবাদ হওয়া উচিত। তাজমহলের মতো ছোট গল্প বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় আর লেখা হয় নি।

অলৌকিক বিষয় নিয়েও গল্প লিখেছ কয়েকটি। অবর্তমান, শেষ কিস্তি ইত্যাদি। জানা অজানা সকল জগতে তোমার আনাগোনা। অজানা বিষয় যে জানার সীমানায় আনোনি সেটি ভাল করেছ। অজানা, যে রহস্ত রূপে মানুষের জীবনে ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা দেয়, সে বিষয়ে তুমি ইঙ্গিত দিয়েই ছেড়ে দিয়েছ। তোমার 'কেন' গল্প এই "কেন ?" প্রশ্নটি নিয়েই এই সব অলৌকিক বিষয়ের গল্পের প্রতিনিধিত্ব করছে।

তোমার নিমগাছ একটি আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টি। এত সামান্য আয়োজনে, ছোট ছোট বাক্যের মাত্র ২৮টি লাইনে এমন একটি নিটোল কল্পনা এতে রূপ পেয়েছে যা অবাক ক'রে দেয়। এটি যেমন ছোট তেমনি এটি গল্পও। এটি পড়লে আর ছোটগল্পের নীচের সীমা নির্দেশের প্রশ্ন ওঠে না।

জীবনের একটুখানি অংশ মাত্র ছোট গল্পে দেখানো যায়—সেই অংশটি ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত। তবু জীবনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, কেননা মানুষ—মানুষ,—যন্ত্র নয়। এবং প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর বিষয়বস্তুকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেন ব'লেই তা আর্ট হয়। সবাই এক রকম দেখলে এবং এক রকম আঁকলে তা আর্ট হত না, অন্য কিছু হত। তাই তোমার গল্প যে পাঠকদের ভাল লাগে তা তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই। অত্যন্ত ছোট পরিসরে তুমি পাঠকমনে যে ব্যাপ্তির ধারণা জন্মাতে পার তা তোমার ঐ বিশেষ শিল্পরীতির জন্যই, এবং তারও মূলে চোরের মতো লুকিয়ে আছে একটি কবি—Lord, forgive him, for he knows not what he is doing! ছোটগল্পকে মিনিয়েচার এবং সাব-মিনিয়েচারে রূপান্তরিত ক'রে তুমিই ছোটগল্পকে পাঠকের চোখে আজ আরও বড় করে তুলেছ বলে আমার বিশ্বাস।

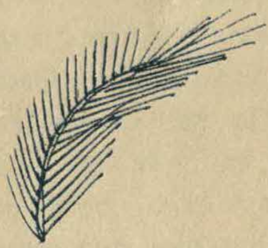
ছোটগল্পের উদ্দেশ্যের কথা আগে বলেছি। উদ্দেশ্য—নিজের দেখা ছবি অন্যের সম্মুখে তুলে ধরা, যাতে পাঠক গল্পচিত্রটিকে লেখকের দৃষ্টিতে দেখতে পায়। লেখক শেষ পর্যন্ত যে কথাটি ব'লে গল্প শেষ করেন, সেই কথাটি জানা হ'লে গল্পের বর্ণিত সমস্ত কথা পাঠকের চোখে নতুন অর্থ বহন করে। এক কোণে মধু জমবে ব'লে যেমন সমস্ত মৌচাকখানি দরকার, তেমনি আসল

দর্শনীয় বস্তুটি দেখাবার জন্য গল্পের একটা পরিসর দরকার। বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুযায়ী এই পরিসরের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। গল্পের পরিণতিতে কখনো থাকে একটি ইঙ্গিত, কখনো থাকে সমস্ত কাহিনীটির ব্যাখ্যা। আবার কখনো ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রেখে শুধু ছবিটি দেখিয়েই শেষ করা চলে— পাঠক নিজের ব্যাখ্যা নিজে খুঁজে নেয়। ছবিটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হলেই সেখানে যথেষ্ট মনে করা হয়। এ রকম গল্পও এ বইতে আছে দু' একটি।

তোমার কলমে সব রকম গল্পই এসেছে। এ এক চমকপ্রদ ব্যাপার। হাতী থেকে প্রজাপতি সব রকম গল্প সৃষ্টির ব্রহ্মা হয়ে ব'সে আছ তুমি, তাই তোমার লেখায় আমার বিস্ময় লাগে। চুম্বনান্তে—

পরিমল গোস্বামী









করুণা-ভাজন

চৈত্রমাস। রৌদ্রের তেজ বাড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরে উত্তরদিকে বারান্দার কোণটা শীতল। ভূরিভোজনান্তে একটি কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি আশ্রয় করিয়াছি। হস্তে খবরের কাগজ আছে, তন্দ্রাবিষ্ট-নয়নে মনুষ্যজাতির পাশবিকতার কথা পাঠ করিয়া বর্তমান সভ্যতার ভব্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছি. মনে হইতেছে, আমরা ভারতবাসীরা কোনো কারণেই বোধ হয় এমন নৃশংস বর্বর হইয়া উঠিতে পারিব না, যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়—। হঠাৎ কাগজটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ঢুল ধরিয়াছিল। উঠিয়া বসিতেই নজর পড়িল, সম্মুখের তপ্ত পথ দিয়া জীর্ণ মলিন বসন পরিহিত একজন পথিক একটা প্রকাণ্ড বস্তা মাথায় করিয়া পথ অতিবাহন করিতেছে। দুঃখ হইল। এই দারুণ রৌদ্র, মাথায় অতবড় বস্তা! নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি আমার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আর পারিল না, বস্তাটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অদ্ভুত চেহারা! মাথায় রুক্ষ চুল, মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, চোখে নিকেলের চশমা, মাথায় পাগড়ি, জামা নাই, খালি পা।

হঠাৎ একি! খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলাম। শেষটা উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। বস্তাটা নড়িতেছে! বেশ নড়িতেছে। গেট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কাছে গিয়াও দেখিলাম, সত্যই নড়িতেছে। বস্তার মুখ কষিয়া বাঁধা, ভিতরে কি আছে দেখা যায় না।

কি আছে ওর ভিতর?

কুকুরবাচ্চা।

কুকুরবাচ্চা!

হ্যাঁ। কুড়িটা কুকুরবাচ্চা।

বেশ নির্বিকারভাবে উত্তর দিল।

বস্তায় কুকুরবাচ্চা পুরেছ কেন?

রাত্রে ঘুমুতে দেয় না, বড় বিরক্ত করে। গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

বল কি ?

বস্তাটা আর একবার নড়িয়া উঠিল।

পাগল নাকি তুমি ? খুলে দাও।

বড্ড বিরক্ত করে বাবু।

দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে যে এই গরমে। খুলে দাও শিগগির।

নিজেই হেঁট হইয়া বস্তার মুখটা খুলিতে লাগিলাম। লোকটা বাধা দিল না। কোমরে হাত দিয়া ঘাড়টা একটু কাত করিয়া স্মিতমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। দুই-একজন বলিল, লোকটা সত্যিই পাগল। ভিন্ন গ্রামে থাকে।

দুই

কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই—কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—

কুড়িটা কুকুরশাবকের আর্তকণ্ঠ অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। প্রত্যেক শাবকটিই সবেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সজোরে ভূমিতে নিপাতিত হইতেছে। নিপাতিত করিতেছি আমিই। শুইতে গিয়া দেখি, কুড়িটাই আমার বিছানায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে! কি আপদ!

লাল বনাত

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায় মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টকটকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধপধপে সাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারী মকদ্দমায় তিনি আসামী—সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত। আজ এই প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিশ সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় সাগ্রহে, অপেক্ষমান, সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নিচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায় মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিশ সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায় মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিশ প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা পুলিশ সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায় মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের কোট গায়ে, মাথায় সাদা পাগড়ি অশ্বরোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে। দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায় মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায় মহাশয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও

ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন; রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নয়। দারোগার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া অপরিচিত লোকটা নীরবে দন্তপঙ্‌ক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহী বদল হইয়া গিয়াছে।

ছোটলোক

উন্নতমস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরের নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, মাথায় ছাতা নাই। পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কণ্টকসঙ্কুল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না। উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি দ্রুতপদেই চলিয়াছেন। সুনির্দিষ্ট নীতি-অনুসরণকারী, অনমনীয়-চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া এক রিক্‌শাওয়ালা তাঁহার পিছু লইল।

রিক্‌শা চাই বাবু—রিক্‌শা—

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারাই মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায়···ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিক্‌শা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না, চাই না।

দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল। সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বল্‌শেভিজ্‌ম, ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট। হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌছে দিই—কোথায় যাবেন?

ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি ?

ছ পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিক্‌শাওয়ালাও পিছু-পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, এই নে।

আপনি চড়লেন কই ?

আমি রিক্‌শা চড়ি না।

কেন ?

রিক্‌শা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন—

লোকটার চোখেমুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইতিহাস

অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ইতিহাস অবগত হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহা এই। গল্পাকারে বলিতেছি।

একদা জনৈক সর্বহারা নিষাদ ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে তমসা-তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এই নিষাদ এখন যদিও সর্বহারা, কিন্তু একদিন তাঁহার সব ছিল। বহু পত্নী, বহু গাভী, বহু বৃষ, বহু মেঢ্র, বহু কুক্কুর, বহু আরণ্য-সম্পত্তি, কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। বস্তুত ইনিই একদা তরক্ষু-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সর্বহারা—ধনুর্বাণ ছাড়া আর কিছুই নাই।

সহসা মনে হইতে পারে যে, অত্যাচারী আর্যগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াই বুঝি ইনি দুর্দশা-সাগরে নিপতিত হইয়াছেন। তৎকালে আর্যগণ অনার্যগণকে লাঞ্ছিত করিয়া হর্ষ-বোধ করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নিষাদ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব ছিল। এমন কি, এইজন্যই অন্যান্য নিষাদগণ তাঁহাকে আর্যপদলেহী গৃহশত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এইজন্যই সম্ভবত তাঁহার পত্নী গদ্‌গদা শবররাজ কিংকুর প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। গদ্‌গদা এবং কিংকু উভয়েরই স্বজাতিপ্রীতি অসাধারণ ছিল।

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, গদ্‌গদা এবং কিংকুর ষড়যন্ত্রেই তরক্ষুরাজ বিপন্ন হইলেন। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, ধনুর্বাণ মাত্র সম্বল করিয়া তাঁহাকে রাজ্য-ত্যাগ করিতে হইল। চিরাচরিত প্রথানুসারে তরক্ষুরাজ শ্মশানচারী জাদুকর চেম্বার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। চেম্বার অভিমত, বুদ্ধিভ্রংশই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। পুনরায় বুদ্ধিমান হইবার উপায়ও চেম্বা নির্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অভীষ্ট বস্তুটি কিছুতেই মিলিতেছে না। এতদিন কত কান্তারে, কাননে, নদীতটে তিনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কই—সহসা নিষাদের চক্ষুর্দ্বয় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

ওই তো এক জোড়া কাম-ক্রীড়া-পরায়ণ কোঁচ বক্‌!

তৎক্ষণাৎ নিষাদ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ধনুতে শরযোজনা করিয়া কামোন্মত্ত পুংবকের হৃদয়-দেশ বিদীর্ণ করিয়া সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন। বকী উড়িয়া গেল।

চেম্বার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবার নহে।

রতিক্রীড়াপরায়ণ পুংবকের মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র নিষাদের সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রতাপশালী আর্যগণের দ্বারস্থ হইলেন। আর্যগণ চিরকাল আশ্রিতবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং তাঁহারা শবর-রাজের বিরুদ্ধে ন্যায়-যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না।

ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। শতযোজন ব্যাপিয়া দিবারাত্রি যুদ্ধ। আকাশে বাতাসে কেবল কাড়া-নাকাড়া-দামামা-ভেরীর শব্দ; চতুর্দিকে ছিন্নমুণ্ড, কর্তিত হস্ত, বিচ্ছিন্ন পদ, বিদীর্ণ উদর, বিকৃত কবন্ধের স্তূপ; গ্রামে গ্রামে প্রজ্বলিত গৃহ, পথে-বিপথে পলায়নপর নরনারী, ধাবমান সৈন্যসামন্ত, ক্রন্দনে কলরবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ।

তরক্ষুরাজ-কণ্ঠেই বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্য দান করিলেন।

রণক্ষেত্রে কিংকুর চক্ষু উৎপাটন ও হৃদয় বিদারণ করিয়া নিষাদের প্রতিহিংসা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। গদ্‌গদার ব্যবস্থা গৃহে হইবে। রথারোহী হইয়া তিনি নিষ্কণ্টক রাজ্যে সদম্ভে পুনঃপ্রবেশ করিলেন—রথের পশ্চাতে গদ্‌গদার চুলের ঝুঁটি বাঁধা। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া তরক্ষুরাজ গদ্‌গদাকে একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের কাণ্ডে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে তাহার অনাবৃত দেহে শঙ্কর-মৎস্যোৎপন্ন কশাদ্বারা অবিরাম আঘাত করিতে লাগিলেন। শাসন সমাপ্ত হইলে নদীজলে কয়েকবার চুবাইয়া তৎপর তাহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন।

এই ব্যাপার হইতেই সতীত্ব জিনিসটির উদ্ভব এবং ইহার পর হইতেই আর্য-সভ্যতার বিস্তার। তরক্ষুরাজের সহায়তা ভিন্ন আর্যসাম্রাজ্যের এত দ্রুত বিস্তার হইত না।

সংক্ষেপে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিহাসে ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এ সম্পর্কে ইতিহাসে যেটুকু উল্লেখ আছে, তাহা সামান্য এবং ইতিহাসের দিক দিয়া অতিশয় হাস্যকর। শরাহত পুংবককে দেখিয়া বাল্মীকি নামক জনৈক বুড়া ব্রাহ্মণ নাকি দুই ছত্র সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন!

আশ্চর্য!

গণেশ

গল্পটি আপনার মনে হাস্য অথবা করুণ, কি রস উদ্রিক্ত করিবে, তাহা আপনার মনের উপর নির্ভর করে। গল্পটি এই।

গণেশের গল্প। গণেশ নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাহার সামান্য যাহা বিশেষত্ব, তাহা তাহার চেহারায়। রগের শিরাগুলি স্ফীত, চক্ষু দুইটি বহির্মুখী, দেখিলেই মনে হয় লোকটা যেন দম বন্ধ করিয়া রহিয়াছে। গ্রীবা বলিয়া কোনো অঙ্গই নাই যেন, ধড়ের উপর প্রকাণ্ড মাথাটি বসানো। এই গণেশ একবার অসুখে পড়িয়াছিল। জ্বর নয়, হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। দশ ক্রোশ দূরবর্তী শহর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়াছিলেন এবং যন্ত্রের সাহায্যে গণেশের রক্তের চাপ পরীক্ষা করিয়া চমকিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে, এত অল্প বয়সে এত বেশি ব্লাড-প্রেসার তিনি আর কখনও দেখেন নাই। বহুদর্শী ডাক্তারবাবুর উপদেশ অনুসারে নানারূপ পথ্য সেবন করিয়া গণেশ সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিল বটে, কিন্তু জেরবার হইয়া গেল। তরুণী ভার্যা বিভাবতীর বালা জোড়াটি পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল।

এইখানেই গল্পের শুরু।

সুস্থ হইয়াও গণেশ কেমন যেন অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। ঔষধ-পথ্যের গুণে সাময়িকভাবে রক্তের চাপ কিছু কমিয়া থাকে, কিন্তু বিভাবতীর হাতের পানে চাহিলে তাহার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া ওঠে, রক্তের চাপও হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়। গরীব গণেশের পক্ষে মূল্যবান ডাক্তারবাবুর পুনরায় নাগাল পাওয়া অথবা তাঁহার মূল্যবান উপদেশ বরাবর অনুসরণ করা কোনোটাই সম্ভবপর নয়, সুতরাং বর্ধিত-রক্ত-চাপ অবস্থাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

এইভাবেই চলিতেছিল।

এমন সময় একদিন একটা কাণ্ড হইয়া গেল। কাণ্ড এমন কিছু নয়, কিন্তু গণেশের চক্ষে তাহা শুধু কাণ্ড নয়, প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হইল। গণেশ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাজে বাহির হইয়া যায়। পাশের গ্রামে আঢ্যিদের কাপড়ের দোকানে সে কাজ করে। ফেরে রাত্রি দশটা এগারোটায়। বিভাবতী বাড়িতে একাই থাকে। কারণ গণেশের তিন কুলে কেহই নাই।

একদিন রাত্রে গণেশকে ভাত দিতে দিতে বিভাবতী বলিল, "আজ দাদা এসেছিল—"

"ও, তাই নাকি, ধরে রাখলে না কেন, আমার সঙ্গে দেখাটা হত—"

"বললাম তো কত করে, রইল না কিছুতে, জরুরি কাজ আছে না কি একটা তাই চলে গেল।"

গণেশ নীরবে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে পুরিল।

"কি কি গল্প হল—"

"এই সব আর কি—"

একটু থামিয়া মুচকি হাসিয়া বিভাবতী বলিল, "আমার বালা জোড়ার কথা জিগ্যেস করছিল—"

গণেশের চোখ দুইটা যেন আরও খানিকটা বাহির হইয়া আসিল।

"কি জিগ্যেস করছিল—"

"বলছিল হাত খালি কেন, বালা জোড়া কি হল—"

"কি বললে তুমি—"

"বললাম, ভেঙে আবার গড়াতে দিয়েছি নতুন প্যাটার্নের—"

ভাতের গ্রাসটা মুখে পুরিয়া গণেশ চিবাইতে লাগিল। তাহার রগের শিরগুলা আরও যেন ফুলিয়া উঠিল।

"মিছে কথা বলতে গেলে কেন, সত্যি কথা বললেই পারতে—"

"আমার লজ্জা করল—"

একটু থামিয়া বিভাবতী আবার বলিল, "বাপের বাড়িতে ছোট হতে যাব কেন, গড়িয়ে নিলেই হবে'খন পরে—"

গণেশ নীরব।

মুচকি হাসিয়া বিভাবতী বলিল, "আর একটু ডাল দি—"

"দাও—"

ষোড়শী পত্নী বিভাবতীর পানে চাহিয়া গণেশের মনে সহসা কেমন যেন একটা মাধুর্য সঞ্চার হইল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "চচ্চড়িও দাও একটু, বেশ হয়েছে চচ্চড়িটা—"

বিভাবতী চচ্চড়ি দিল। গণেশ নীরবে ডাঁটাগুলি চিবাইতে লাগিল।

"আর ভাত দেব ?"

"না।"

"দুধ গরম করে আনি—"

বিভাবতী পাশের ঘরে গেল। ঘরের গোরুটি আছে তাই গণেশ দুধটুকু খাইতে পায়, দুধ কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য তাহার নাই। খানিকক্ষণ পরে বিভাবতী দুধের বাটী লইয়া প্রবেশ করিতেই গণেশ বলিল, "তা ঠিকই করেছ তুমি, গড়িয়ে নিলেই হবে'খন পরে"—তাহার পর হাত চাটিতে চাটিতে বলিল, "ওদের কাছে ছোট হতে যাব কেন, ঠিক"—তাহার পর বিভাবতীর খালি হাতের পানে আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিয়া জলের গ্লাসটা তুলিয়া চক্‌চক্ করিয়া সমস্ত জলটা খাইয়া ফেলিল।

মাসখানেক কাটিল।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষ। একটু রাত করিয়াই চাঁদ উঠিয়াছে। পূর্বদিগন্তে একটা নীরব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। যে মেঘগুলি এতক্ষণে অন্ধকারে অদৃশ্য ছিল, জ্যোৎস্নালোকে তাহারা অপরূপ দৃশ্য হইয়া উঠিতেছে। বকুল গাছের ফাঁক দিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না গণেশের বিছানাতেও আসিয়া পড়িয়াছে। বিভাবতী ও গণেশ পাশাপাশি শুইয়া গল্প করিতেছে। তুচ্ছ গল্প, পাড়ার এর ওর তার কথা। হঠাৎ বিভাবতী বলিল, "মিত্তিরদের বউ নতুন বালা গড়িয়েছে। আজ দেখতে গেসলাম, কি চমৎকার গড়েছে বিধু স্যাকরা, যেমন পালিশ তেমনি গড়ন, চোখ ঝল্‌সে যায় একেবারে—"

"তাই নাকি ?"

গণেশের রগের শিরাগুলি ক্রমশ ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

"হ্যাঁ, শিমুলকাঁটা প্যাটার্ন"

"সে আবার কি রকম"

"সে চমৎকার। শিমুলকাঁটার মতো কাঁটা-কাঁটা দেওয়া—"

"ও"

"পালিশ চমৎকার খোলে"

গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে বিভাবতী বলিল, "একটা বিপদও আছে কিন্তু বাপু, কাঁটাগুলোর যা ধার, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে যেতে পারে"

গণেশ এবারও কিছু বলিল না। একটা দম্‌কা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া বকুল ফুলের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া দিয়া গেল।

"ঘুমুলে না কি?"

"হ্যাঁ, ঘুম পাচ্ছে"

গণেশ পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু ঘুমাইল না। নীরবে চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্ন দেখিল যেন সে বিভাবতীকে শিমুলকাঁটা বালা গড়াইয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহাকে লইয়া সে যেন শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, বিভাবতী তাহার দাদাকে যেন বালা দেখাইয়া বলিতেছে—দেখ তো দাদা, এ প্যাটার্ন'টা সুন্দর নয়?

পরদিন সে বিধু স্যাকরার সহিত দেখা করিল।

"শিমুলকাঁটা বালা গড়াতে কত পড়বে হে বিধু?"

"কত ভরির হবে?"

"যাতে ভাল হয়—"

"ভাল করে করতে গেলে শ' দুই টাকা পড়বে।"

"দুশো!"

গণেশের রগের শিরাগুলি দপদপ করিয়া উঠিল।

কয়েকদিন কাটিল।

অবশেষে অনেক ইতস্তত করিয়া মনিব দিগম্বর আঢ্যের নিকট সে কথাটা পাড়িল।

"আমাকে শ দুই টাকা ধার দিতে হবে"

টাকমাথা বেঁটে দিগম্বর আঢ্য কথাটা শুনিয়াই—যেমন তাঁহার অভ্যাস—চোখ হইতে চশমা খুলিয়া ফেলিলেন এবং ঘাড় হেঁট করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া কাচগুলি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। গণেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চশমা পরিধান করিয়া দিগম্বর গণেশের মুখের দিকে তাকাইলেন।

"ধার! তোমাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি করবে অত টাকা দিয়ে?"

"জরুরি দরকার আছে"

"তা না হয় আছে বুঝলাম, কিন্তু শুধবে কি করে?"

"মাইনে থেকে প্রতি মাসে কাটিয়ে দেব।"

"মাইনে তো পাও দশটি টাকা, তার থেকে আর কত কাটাবে তুমি! পাগল না ক্ষ্যাপা—"

ইহা সত্য কথা। গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

"গয়না-টয়না যদি বন্ধক রাখতে পার কিছু দিতে পারি।

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গণেশ কাজে চলিয়া গেল।

পুনরায় একদিন বিভাবতীর দাদা আসিয়া উপস্থিত। গণেশ তখন বাড়িতে ছিল।

"নেমন্তন্ন করতে এলুম। স্থবির বিয়ে—"

"কবে?"

"মাঝে আর দশটা দিন আছে।"

স্থবি বিভাবতীর ছোট বোন।

"যেও কিন্তু, না গেলে মা দুঃখিত হবে বড্ড, গাড়ি একটা ভাড়া করে যেও, সেখান থেকে পাঠানোর বড় হাঙ্গামা, ভাড়া দিয়ে দেব আমি।

"আচ্ছা"

খানিকক্ষণ বসিয়া, তামাক খাইয়া এবং বিবাহ বিষয়ে গল্পসল্প করিয়া বিভাবতীর দাদা চলিয়া গেল। থাকিতে পারিল না, কারণ নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে তাহাকে আরও কয়েক স্থানে যাইতে হইবে।

বিভাবতী বলিল, "আমি যাব না। গেলেই মা বালার কথা জিগ্যেস করবেন।"

গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

যথা সময়ে বিবাহের দিন আসিল। অসুখের ছুতা করিয়া বিভাবতী গেল না।

মাসখানেক পরে হঠাৎ বিভাবতী একদিন রাত্রে বলিল, "একটা জিনিস দেখবে?"

"কি!"

বিভাবতী একজোড়া বালা বাহির করিয়া দেখাইল। একজোড়া শিমুলকাঁটা বালা!

"কোথা পেলে তুমি?"

"যেখানেই পাই না, কেমন দেখতে, ভালো নয়?"

"চমৎকার! মিত্তিরদের বুঝি?"

"হ্যাঁ, তোমাকে দেখাতে এনেছি। আমাদের ছু'জনের হাতের মাপও এক, এই দেখ, আশ্চর্য কিন্তু—" বিভাবতী বালা ছুটি হাতে পরিয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইতে লাগিল, বিস্ফারিত চক্ষু গণেশ দেখিতে লাগিল।

"কাঁটাগুলো বড্ড ধার, নয় ?"

"চমৎকার"

তাহার পরদিন গণেশ দোকানে কাজ করিতেছিল এমন সময় বিধু স্যাকরা আসিয়া উপস্থিত। দিগম্বর আঢ্যের পুত্রবধূর জন্য একজোড়া শিমুলকাঁটা বালা গড়িতে হইবে তাহারই বায়না লইতে আসিয়াছে। দিগম্বর আঢ্যের পুত্রবধূর গহনার অভাব নাই, ছুই সেট গহনা তো বিবাহের সময় দিগম্বর আঢ্যিই দিয়াছেন। এই বিধুই গড়িয়াছে এবং গণেশ টাকা গণিয়া দিয়াছে।

দিগম্বর গদিতেই ছিলেন, বিধু স্যাকরাকে দেখিবামাত্র চশমা খুলিয়া মুছিয়া এবং পুনরায় পরিধান করিয়া বলিলেন, "বিধু এসেছ, শোন, বউমা ঝোঁক ধরেছেন নতুন ফেশিয়ানের কি বালা বেরিয়েছে আজকাল, শিমুলকাঁটা না কি, তাই একজোড়া গড়িয়ে দিতে হবে। দিতেই যখন হবে, তখন ভালো করে দেখে-শুনে নাও সব, দেখো আবার যেন প্যাটার্নের গোলমাল না হয়ে যায়, যাও ভেতরে যাও তুমি, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না—"

বিধু ভিতরে চলিয়া গেল।

আরও কিছুদিন কাটিল।

সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। বিভাবতী রান্নাঘরে পোস্ত বাটিতেছিল, হঠাৎ গণেশ আসিয়া উপস্থিত। রগের শিরাগুলি খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু ছুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বিভাবতী বিস্মিত হইল।

"একি আজ এত সকাল সকাল যে!"

"শোন—"

"কি—"

"বালা গড়িয়ে আনলুম। দেখ তো—"

গণেশের গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। বিস্মিত বিভাবতী দেখিল, সত্যসত্যই একজোড়া শিমুলকাঁটা বালা বেগুনি রঙের কাগজে মোড়া রহিয়াছে।

"আমাকে বল নি তো কিচ্ছু। টাকা কোথায় পেলে ?"

"পেলাম যেমন করে হোক। প'রে দেখ তুমি।"

"হাতটা ধুয়ে আসি—"

"না, আগে পর—"

জোর করিয়া পরাইয়া দিল। বাঃ, চমৎকার মানাইয়াছে। গণেশের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিল।

"ওটা কি—"

"ল্যাভেণ্ডার—"

"ল্যাভেণ্ডার কি হবে—"

"ছেটাব চারদিকে, চল না—"

বিস্মিত বিভাবতীকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া গণেশ ঘরে ঢুকিল।

বকুল গাছের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার ফালি বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে। বকুল ফুল ও ল্যাভেণ্ডারের উগ্রগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত। গণেশ ও বিভাবতী পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছে। বিভাবতীর হাতে শিমুলকাঁটা বালা পরা।

"উঃ—উঃ—"

গণেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিভাবতীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল।

"কী হল?"

"রগের কাছে লাগল খুব, তোমার বালার কাঁটায় বোধ হয়, একি রক্ত পড়ছে যে উঃ খুব রক্ত পড়ছে, আলোটা জ্বাল তো—"

বিভাবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল। দেখিল ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে! বালার কাঁটায় রগের স্ফীত শিরা একটা কাটিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিল, ন্যাকড়া দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া গেল। উঠান হইতে দূর্বাঘাস আনিয়া চিবাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইল, ন্যাকড়ায় রেড়ির তেল ভিজাইয়া পুরু করিয়া পটি দিল, আঙুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া রাখিল খানিকক্ষণ, পুরু করিয়া পটি দিল, আঙুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া রাখিল খানিকক্ষণ, খয়ের গুলিয়া দিল,—কোনো ফল হইল না। রক্ত সমানে পড়িতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে দিগম্বর আঢ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বিধু স্যাকরা এবং লালপাগড়ি পুলিশ। গণেশের মাথাতেও একটা লাল পাগড়ি ছিল, কিন্তু অত টকটকে লাল নয়, একটু কালচে গোছের লাল। শিয়রে বসিয়া বিভাবতী হাওয়া করিতেছিল।

বিধু বলিল— "এই যে এই বালা—আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এল আপনার নাম করে। আমিও দিয়ে দিলাম, এতদিনের পুরোনো চাকর আপনার, ভাবতেই পারি নি—"

চোরাই মাল পাওয়া গেল, চোরকে কিন্তু ধরা গেল না। কয়েক মিনিট পূর্বেই গণেশ মারা গিয়াছিল। বিভাবতী বুঝিতে পারে নাই, সে মৃত স্বামীকেই বসিয়া হাওয়া করিতেছিল।

দোলের দিনে

সত্যই তো, দোলের দিন। অখিলবাবুরা যে পাড়ায় বাস করেন সে পাড়ায় সুজাতা দেবীর স্বস্তি না পাবারই কথা। আশেপাশে যত কুলি মজুর মুটে মিস্ত্রী মারোয়াড়ী। ছোটলোকের পাড়া। অখিলবাবুরা এসে পর্যন্ত খুঁতখুঁত করছেন সবাই। অখিলবাবুর দুই মেয়ে অণিমা তনিমা তো বটেই, ছোট খোকা ওস্তাদ পর্যন্ত। সুজাতা দেবীর তো কথাই নেই। তিনি বিলেতফেরত ঘরের মেয়ে। ফিরপো, লেড্‌ল, হ্যামিল্টন, আরমি-নেভির আবহাওয়ায় মানুষ। অখিলবাবুর হাতে পড়ে তাঁর অধঃপতনই হয়েছে একথা তিনি এবং তাঁর স্বজনবর্গ সবাই জানেন, বলেনও। কিন্তু নিয়তির ওপর তো আর কথা চলে না। অখিলবাবু সাবডেপুটি। সম্প্রতি এই শহরে বদলি হয়ে এসেছেন। জিতেনবাবুর ওপর বাড়ি ভাড়া করবার ভার ছিল। জিতেনবাবু অখিলবাবুর অধস্তন কর্মচারী। তিনি আলো হাওয়া, সস্তা, এইসব দেখে বাড়িটা পছন্দ করেছিলেন, পাড়াটাও খুব খারাপ বলে তাঁর মনে হয় নি। কিন্তু তাঁর মন আর সুজাতার মন আকাশ-পাতাল তফাত যে। সে কথা সুজাতা মুখ ফুটে বলেও দিয়েছেন তাঁকে একদিন। জিতেনবাবু ভদ্রতর পাড়ায় একটা বাড়ি খুঁজে বার করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। চাকরি বজায় রাখতে গেলে এসব করতেই হবে। উপায় কি!

কোনোক্রমে তবু চলছিল, দোল এসে পড়াতে ব্যাপারটা কিন্তু জটিলতর হয়ে উঠল। অণিমা তনিমার বয়স হয়েছে, তাদের নিয়েই আরও বেশি মুশকিল হল। পাড়ায় যত সব অসভ্য লোকদের ছোয়াচ বাঁচিয়ে কাঁহাতক চলতে পারে মানুষ। দোলের হিড়িকে আরও বেয়াদব হয়ে উঠেছে যেন সবাই। শুক্লপক্ষ যেদিন থেকে পড়েছে সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে। বাড়ির পাশে খানিকটা মাঠ আছে। সন্ধ্যের পর সেখানে এসে লোকগুলো গানবাজনার নামে যে হল্লা হৈ-হৈটা করেছে এ কদিন তা বলবার নয়। গান বাজনারই বা কি বাহার—খচ-খচ-খচ-খচ আর তার সঙ্গে বেসুরো চিৎকার তাড়ির ভাঁড় সামনে রেখে। এ কদিন এতটুকু স্বস্তি ছিল না বাড়িতে। অণিমা সন্ধ্যের পর সেতার বাজায়, তনিমা স্বরলিপি দেখে গান শেখে কিন্তু কানের কাছে এই তাণ্ডব হতে থাকলে কি আর কিছু করা যায়। ওস্তাদের

পড়াও শিকেয় উঠেছে। পাড়ার যত অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে এরই মধ্যে দুটো একটা খারাপ কথা শিখেছেন ছেলে। এ পাড়ায় থাকলে জংলি বুনো হয়ে যাবে ও। অখিলবাবু সকালে খেয়ে কোর্টে বেরিয়ে যান, ফেরেন পাঁচটায়। জলখাবার খেয়েই আবার ক্লাবে যান, ফেরেন রাত দশটায়। যত ঝঞ্ঝাট সুজাতাকেই পোয়াতে হয়। এরকম অসভ্য পাড়ায় সুজাতা আর কখনও থাকেন নি। জানলা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধবার জো নেই—হাঁ করে চেয়ে দেখবে। আবার এখানে এসে কপালগুণে যে চাকর বামুন আর দাই জুটেছে তারা এমন আনাড়ি যে তাদের পিছনে ঘুরতে ঘুরতেও সুজাতার প্রাণ অন্ত হবার যোগাড় হয়েছে। বোনপোর জন্যে যে শোয়েটারটা বুনতে শুরু করেছিলেন, এবার শীতে সেটা শেষই করতে পারলেন না।

ছ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—

ওই আসছে। এখনই একদল গেল, আবার আসছে আর-একদল। উঃ, কাল থেকে কি কাণ্ডই যে হচ্ছে। কাল "ধুর-খেল" ছিল। সে কি কাণ্ড! ছেলে বুড়ো সবাই আপাদমস্তক ধুলোকাদা মেখে ভূতের মতন ঘুরে বেড়িয়েছে রাস্তায় দল বেঁধে! সামনে কাউকে পেলেই হল, অমনি সমস্বরে চীৎকার করে তাকে ঘিরে ধরেছে—আর তার গায়ে মুখে মাথায় ধুলো কাদা মাখিয়ে তাকেও ভূত বানিয়ে নাস্তানাবুদ করে তবে ছেড়েছে। নর্দমা থেকে পাঁক তুলে ছোঁড়াছুড়ি করতেও বাধছিল না লোকগুলোর। হি হি করে হাসতে হাসতে দুহাত তুলে নাচছিল আবার। মানুষ না ভূত প্রেত! ছি ছি ছি ছি!

ছ্যা রা রা রা রা—

"অণিমা সরে আয় ওখান থেকে—"

কিন্তু ওরা বোধ হয় অণিমাকে দেখতে পেয়ে গেল। হৈ-হৈ করে উঠল সমস্বরে। গলির দিকে জানলাটা খোলা ছিল। সুজাতা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন একদল ফাগ-মাখা ছোঁড়া ঢোল আর খঞ্জনী বাজিয়ে মহানন্দে নৃত্য করছে। দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

ছ্যা রা রা রা—

মুখে মুখে তৈরি করে একটা অশ্লীল ছড়া তারস্বরে গেয়ে দিলে একজন। অণিমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। সুজাতা গুম হয়ে

বসে রইলেন। লোকগুলো যাবার নাম করে না। সুজাতার চোখের দৃষ্টিতে আগুন লাগল। উনিও আজ সকাল থেকেই বেরিয়েছেন। এমন এক লক্ষ্মীছাড়া এস. ডি. ও. জুটেছে যে ছুটির দিনেও রেহাই দেবে না। খানিকক্ষণ বসে থেকে সুজাতা হঠাৎ ছাতে উঠে গেলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নিচে বসে থাকা নিরাপদ মনে হল না। কিন্তু ছাতেও বিপদ ছিল। যেতে না যেতেই কোথা থেকে এক-পিচকিরি রঙ এসে লাগল তাঁর শাড়িতে। কে দিলে দেখতে পেলেন না। আশেপাশে সব ছাত, আলসের পাশে কে কোথা লুকিয়ে আছে দেখা যায় না। রাগে বিরক্তিতে সমস্ত মনটা ভরে উঠল তাঁর! এতবড় স্পর্ধা! নিচে নেমে এলেন দুমদুম করে।

"রামশরণ—"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে চাকরকে ডাকলেন। সাড়া পাওয়া গেল না।

"দুবেজি—"

ঠাকুরেরও সাড়া নেই। খিড়কি খুলে দুজনেই বেরিয়ে গেছে। অল্পবয়সী দাইটা উঠানে বাসন মাজছিল। সে আজ ছুটি চেয়েছিল কিন্তু সুজাতা ছুটি দেন নি। তার হলদে রঙের ছোপানো আধময়লা শাড়িতেও এক-পিচকিরি রং কে যেন দিয়েছে। বাঁদর সব! বুনো! জংলি!

"উ লোককো বোলাও, আর কেবাড়ি লাগা দেও—"

সুজাতার ভয় হতে লাগল ওই ভিড়টা যদি উঠানে ঢুকে পড়ে তাহলেই তো সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি মেয়েদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি।

খিড়কি দরজা দিয়ে দাই মুখ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে হর্ষধ্বনি উঠল।

ছ্যা রা রা রা রা—

সুজাতা বাথরুমে ঢুকে রঙ দেওয়া কাপড়টা ছেড়ে তখনি রঙটা ভালো করে ধুয়ে ফেললেন। ভিজিয়ে দিলেন কাপড়টা।

ক্রমশ বাইরের হল্লাটা কমে গেল, মনে হল তারা চলে যাচ্ছে। খিড়কি বন্ধ করার শব্দ পাওয়া গেল। সুজাতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন দাইটাকে লাল রঙে চুবিয়ে দিয়েছে ব্যাটারা একেবারে, ভিজে কাপড় গায়ে সেঁটে গেছে। বেহায়া মেয়েটা মুচকে মুচকে হাসছে তবু। রামশরণ এবং দুবেজিরও আপাদমস্তক রঞ্জিত এবং তারাও আনন্দে গদগদ।

কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

"উনি এলেন বোধ হয়—"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুজাতা তাড়াতাড়ি কপাটটা খুলেই ভয়ে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেল।

জিতেনবাবুর একি অদ্ভুত চেহারা। ভদ্রলোকের মাথায় মুখে কামিজে কাপড়ে লাল নীল সবুজ হলদে বেগুনী কোনো রঙ আর বাকি নেই।

"একি কাণ্ড—"

অপ্রস্তুত মুখে জিতেনবাবু বললেন, "একটা ভালো বাড়ির খবর পেয়েছি তাই ভাবলাম খবরটা বলে যাই—"

"কোথায়—"

জিতেনবাবু যে পাড়ার নাম করলেন সেটা এখানকার নামজাদা পাড়া। সাহেব-সুবো অফিসারদের পাড়া। সুজাতা অকূলে কূল পেলেন যেন।

"কবে খালি হবে?"

"কাল খালি হয়েছে।"

"ও, যে বাড়িতে ডি. এস. পি. ছিলেন?"

"হ্যাঁ, সেইটেই।"

"সে তো চমৎকার বাড়ি। এখনই যাওয়া যায়?"

"এখনই?"

"এখনই যাব তাহলে। এখানে চতুর্দিকে যা কাণ্ড ঘটছে—"

"কেন কি হল—"

"কপাট বন্ধ করে বসে আছি সকাল থেকে—"

জিতেনবাবু সুজাতা দেবীর শুভ্র কাপড়খানার দিকে চেয়ে দেখলেন। সুতির হলেও দামী কাপড়। রঙ লেগে নষ্ট হয়ে গেলে সত্যিই কষ্টের কারণ ঘটবে।

"আচ্ছা দেখি তাহলে—"

জিতেনবাবু চলে গেলেন।

সুজাতা দেবী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করলেন। একটু পরে এক ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে অখিলবাবু এলেন। গাড়োয়ান লালে লাল, ঘোড়া দুটোর গায়েও রঙ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় অখিলবাবুও নিস্তার পান নি।

"রাস্তায় দিলে বুঝি কেউ—"

"না, রাস্তায় দেয় নি। দিলেন স্বয়ং এস. ডি. ও.। ভদ্রলোক সেকেলে গোঁড়া লোক, কি আর করি বল—"

"সোফাটায় বোসো না যেন ধপ করে। কাপড়চোপড় ছাড় আগে। ছি, ছি, পাঞ্জাবিটা নষ্ট করে দিয়েছে একেবারে, এমন দামী সিল্কটা—"

দুই

সন্ধ্যা আসন্ন।

উন্মত্ত জনতা আনন্দে অধীর হয়ে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়-রাস্তায়। তাদের আনন্দ-কলরব এখনও থামে নি। আম্রমুকুলের গন্ধে আকাশ-বাতাস মদির হয়ে উঠেছে, অশোক পলাশ কিংশুকের পল্লবে পল্লবে জীবনবহ্নি লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন, স্বর্ণকান্তি কর্ণিকার-পুষ্পভারে শাখা-প্রশাখা অবনত, শুভ্রকুন্দকুসুম-গুচ্ছ ঠিক তেমনি-ভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রিয়াদন্তপংক্তিশোভা, কালিদাসের কালে যেমন দিত। কোকিল ডাকছে, ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত হয়ে উঠেছে কানন-কান্তার, প্রাকৃতজনতা সমস্ত লজ্জা সমস্ত ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে রঙে-রসে আনন্দে-নেশায় বিভোর হয়ে উন্মত্তের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও।

ছ্যাকড়া গাড়ির দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ করে সুজাতা দেবী চলেছেন সভ্য পাড়ায়।

নাম

আমাদের পাড়ায় নবাগত যতীনবাবু লোকটিকে এক হিসাবে অভদ্রই বলা চলে সমাজের সাধারণ আইনকানুন মেনে কিছুতেই চলবেন না ভদ্রলোক। কোথা নিমন্ত্রণ করলে যান না, পাড়ার কারো খবর নেন না, বাড়িতে কেউ গেলে আপ্যায়ি হবার ভাব দেখান না বরং ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন যেন একটু বিরক্ত হয়েছেন। তবু আমরা প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তাঁর বাড়িতে যাই এ সব সত্ত্বে এবং নিয়মিতভাবে চা পান করে থাকি। যতীনবাবুর চরিত্রে যতই খুঁত থাক তাঁ বাড়ির চা-টি একেবারে নিখুঁত। সেদিন বিকেলে আমরা যখন গেলাম—আমরা মানে আমি, মাধববাবু আর পুণ্ডরীকাক্ষবাবু—তখন তিনি আর একজন কার সঙ্গে যেন গল্প করছিলেন। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি বলে মনে হল না যতীনবাবুর যা স্বভাব আমাদের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন মাত্র কিন্তু মুখে ফাঁকে যে একবার 'আসুন' বা 'বসুন' বলা তা একবারও না, গল্পই করে যে লাগলেন। তবু আমরা বসলাম।

যতীনবাবু বলছিলেন—"ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম। পাণ্ডাগিরি ক বেড়াত ইস্কুলে, আর সেই সময়েই মদ খেতে শেখে বোধ হয়—"

পুণ্ডরীকাক্ষবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না।

"আমাদের হেমবাবুর ছেলে ফটকের কথা বলছ বুঝি ?"

যতীনবাবু এর কোনো জবাব দিলেন না, একটু হেসে সেই লোকটির দিকে চে বলে যেতে লাগলেন—"তারপর তার বাপ তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, অব ঠিক যে কেন ছাড়িয়ে নিলে তা বলা শক্ত, কিন্তু ছাড়িয়ে নিলে, ছাড়িয়ে পাঠি দিলে বেহারের এক শহরে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে। হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলেছি— ইতিমধ্যে ছোকরা কবিতা লিখতে শুরু করেছিল।"

মাধববাবু পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর দিকে চেয়ে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বললেন, "আমাদের জগা কথা বলছেন, বুঝছ না—" বার দুই আই-এ. ফেল করে আমাদের তপোনাথে জ্যেষ্ঠপুত্র জগদীশ পরের পয়সায় মদ এবং সিনেমার কাগজে প্রেমের প লিখতে শুরু করেছিল, সম্প্রতি সে ছাপরাও গেছে মামার বাড়িতে। সুতরা

মাধববাবুর অনুমান খুব অসঙ্গত নয়। যতীনবাবু কিন্তু সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করলেন না।

বলে যেতে লাগলেন—

"বেহারে গিয়ে তার কাব্যরোগ হু হু করে বেড়ে গেল। বেহারে তার বাপ তাকে পাঠিয়েছিল আত্মীয়ের কাছে থেকে সেই আত্মীয়েরই কারবারে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে। ছোকরা কারবারের ধার দিয়েও গেল না, লম্বা লম্বা কবিতা লিখে মাসিকে আর সাপ্তাহিকে পাঠাতে লাগল আর বাকি সময়টা ঘরের কোণে বসে কাটাতে লাগল যত সব বাজে বই পড়ে—"

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"বাজে বই মানে, কি বই—"

"দর্শন, কাব্য, সাহিত্য—এই সব আর কি, অর্থাৎ ইনডিগো সম্বন্ধে কোনো বই নয়—"

"ইনডিগো সম্বন্ধে বই মানে—"

"অর্থাৎ যে বই পড়লে ব্যবসার উপকার হত। সেই আত্মীয় ভদ্রলোকের নীলের কারবার ছিল—"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি, উত্যক্ত হয়ে উঠলেন আত্মীয়টি ক্রমশ—"

চা এসে পড়ল। পুণ্ডরীকাক্ষ আপিঙের কৌটা বার করলেন। ইনডিগো শুনেই আমরা বুঝেছিলাম এ জগো নয় আর কেউ। মাধব ভাবছিলেন কে হতে পারে।

যতীনবাবু বললেন—"তারপর হল এক কাণ্ড। কোলকাতার এক সম্পাদক ডেকে পাঠালে ছোকরাকে, বললে তোমার প্রতিভায় আমি মুগ্ধ, তুমি আমার কাগজের সহকারী সম্পাদক হও আর তোমার কবিতাগুলো ছাপিয়ে ফেল—ছুটল ছোকরা কোলকাতায় আর জুটল গিয়ে সাহিত্যিক মহলে—"

অহিফেনের বটিকাটি গলাধঃকরণ করে পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন—"আমাদের ক্ষীরোদচন্দ্র আর কি—" ক্ষীরোদের সঙ্গে এই ছোকরার একটু মিল ছিল অবশ্য ক্ষীরোদও একটা কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়েছিল কিছুদিন।

যতীনবাবু বলতে লাগলেন—"ছোকরা কিন্তু জমিয়ে ফেললে কোলকাতায়—"

যদিও যতীনবাবু পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে ফিরেও চান নি তবু পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন—"তাই না কি ?"

"খুব জমিয়ে ফেললে, সাহিত্যিক মহলে নাম তো হলই, অসাহিত্যিকরাও বলাবলি করতে লাগল তার বিষয়ে, ফলে একটা চাকরি জুটে গেল।"

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন—"কি চাকরি ?"

"ইস্কুল মাস্টারি—"

"তারপর—"

"দিন কতক খুব নামডাকও হল খুব ভালো মাস্টার খুব ভালো মাস্টার, কিন্তু াতিরিক্ত রকম বাহাদুরি করতে গিয়েই মল ছোকরা—"

"কি রকম—"

"ছাত্রদের সঙ্গে খুব বেশিরকম মাখামাখি শুরু করে দিলে, ছাত্ররা হয়ে উঠল তার ইয়ার—"

মাধববাবু চা পানান্তে ময়লা রুমাল দিয়ে ঝোলা গোঁফ-জোড়া মুছছিলেন। তিনি এই কথায় একটু টিপ্পনী করলেন—"আজকালকার ছেলেদের ধরন-ধারণই ওই রকম,—বুঝতে পেরেছি আমাদের আশু মাস্টারের কথা বলছেন আপনি, ওর হিষ্টি জানেন না কি ?"

যতীনবাবু একটু হাসলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না। আমাদের এখানকার স্কুলের নবাগত শিক্ষকটির বদনাম রটেছিল তিনি ছেলেদের সঙ্গে বড্ড বেশি মেশেন না কি।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"তারপর—"

"তারপর আর কি, চাকরিটি গেল। নানারকম বদনাম রটতে লাগল, গার্জেনরা ভয় পেলেন ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে, কমিটি তাড়িয়ে দিলে, মানে দিতে বাধ্য হল।"

"ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে ! কেন ?"

"ও ছেলেদের সঙ্গে মদ খেত, বলত ধর্মটর্ম সেকেলে বন-মানুষের কাণ্ডকারখানা এ যুগে ওসব অচল। বলত কুসংস্কার তুলে দাও—ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের গল্প করত, বেন্থাম মিল আওড়াত—"

"তারপর—"

"এদেশে আর কত 'তারপর' থাকবে, দিন কতক ভ্যারেণ্ডা ভেজে ভেজে ঘুরে বেড়ালে, বুড়োদের উপদেশ আর গালাগালি শুনলে তারপর পট করে একদিন মরে গেল—"

"মরে গেল! কেন, কি হল—"

"কলেরা।"

মাধববাবু বললে—"বুঝেছি, নিপুর ভাগ্নের কথা বলছেন, সেও কোলকাতায় মাস্টারি করছিল, একটু বখাটে গোছেরই ছিল, বছরখানেক হল মারা গেছে। নিপুর ভাগ্নের কথাই বলছেন, নয়?"

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিবাদ করলে—"নিপুর ভাগ্নে মদ খেত না। মদ খেত আমাদের ছিরে, মাস্টারিও করত, কিন্তু সে মারা গেছে টাইফয়েডে, আপনি বোধহয় ভুল খবর শুনেছেন যতীনবাবু—"

যতীনবাবু আবার একটু হাসলেন, জবাব দিলেন না। এমন অভদ্র-লোক কদাচিৎ চোখে পড়ে!

অপরিচিত লোকটির দিকে চেয়ে যতীনবাবু বললেন, "শ্রদ্ধা হয় লোকটার উপর?"

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন—"এই আপনার গ্রেট ম্যানের গল্প?"

"নামটা চেপে রেখেছি বলে মনে হচ্ছে না, নামটা আগে বললে প্রতি পদে গ্রেটনেস দেখতে পেতে! I hate you, I hate you all."

"নামটা কি শুনিই না।"

"হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।"

তিলোত্তমা

সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটি নাটকীয় মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব, সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমেষে বদলাইয়া যায়। উত্তরবাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, উত্তুঙ্গ পর্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।

নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মতো সে-ও বি.-এ. পাশ করিয়া এখানে-ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া, শখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারেণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল। আর পাঁচজনের যেমন বিবাহের সম্বন্ধ আসে গোকুলেরও তেমনি আসিতে লাগিল। বিবাহের বাজারে গোকুল স্থপাত্র। শহরের উপর একখানি ত্রিতল বাড়ি, পিতার তেজারতি ব্যবসায়, মাতুলালয়ের বিষয়সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে কোনোকালে গোকুলকে উদরান্নের জন্য চাকুরির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভগবান তাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে সারাজীবন শখের থিয়েটারে রিজিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা নকুল নন্দী অভিজ্ঞ লোক। কোষ্ঠী, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সমস্ত দিক বিচার করিয়া নন্দী মহাশয় যে পাত্রীটিকে মনোনীত করিলেন তাহার ডাক নাম তিলু। ভালো নাম তিলোত্তমা। নন্দী মহাশয় সেকেলে লোক, সুতরাং পুত্রকে না পাঠাইয়া নিজেই কন্যা দেখিতে গেলেন এবং পছন্দ করিয়া আসিলেন। নাম শুনিয়া গোকুলও মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে সে যে ছবিটি আঁকিতে লাগিল কাব্যের তিলোত্তমা তার কাছে কিছু নয়।

দুই

শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গেল। তিলোত্তমাই বটে! তিলের মতোই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি। উলুধ্বনি,

শঙ্খধ্বনি, কোলাহল-ধ্বনি, পরিবেশন-ধ্বনি নানারূপ ধ্বনির মধ্যে ইহারই পাণিপীড়ন তাহাকে করিতে হইল। উপায় নাই। কিন্তু ঘাবড়াইয়া গেল।

পিতা নকুল নন্দীও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি বেহাইটিকে যেরূপ সোজা লোক মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন আসলে তিনি মোটেই সেরূপ সোজা নহেন। লোকটা হাত কচলাইয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া চলিয়াছে অথচ একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। নগদ পাঁচ শত টাকা পণ কম দিয়াছে, বলিতেছে এখন সব জুটাইতে পারা গেল না, বাকি টাকা পরে পরিশোধ করিয়া দিব। দানপত্র যাহা দিয়াছে অত্যন্ত খেলো। চেলীর রঙ উঠিয়া যাইতেছে। রিস্টওয়াচ নাই—কলিকাতায় নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। আংটিটা সোনার কিনা কে জানে—দেখিতে তো পিতলের মতো। তিনি কি শেষে একটা ধড়িবাজের সহিতই কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন নাকি! তখন তিনি যাহা যাহা দাবি করিয়াছিলেন লোকটা তাহাতেই রাজী হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘাড় নাড়িয়াছিল। দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশীই করিয়াছিলেন, কিন্তু টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিত হাঁদামুখো মোটা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইবেনই বা কেন তিনি! সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে তো! কিন্তু এ কি কাণ্ড। ওই অতি-বিনয়ী লোকটার নিকট এ ব্যবহার কে প্রত্যাশা করিয়াছিল! বাড়িতেও যৎপরোনাস্তি গাল খাইতে হইল। গোকুলের মা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বার বার বিঘোষিত করিতে লাগিলেন যে, নকুলের 'ভীমরতি' ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে! ছি ছি ছি ছি। নকুল মিথ্যা কথা বলিয়া রেহাই পাইলেন—"ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম তার টকটকে রঙ, একপিঠ চুল, দিব্যি চোখমুখ, গোলগাল গড়ন। চোর চোর, জোচ্চোর ধড়িবাজ ব্যাটা! ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।" সকলেই ইহাতে সায় দিল। এমন কি গোকুল পর্যন্ত।

তিন

তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বই কি। একটা জিনিস গোকুল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না—তিলু ভারি ভালো মানুষ। মুক্তোকেশী বেগুনের মতো তাহার

মুখখানিতে ভালোমানুষি যেন মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। আলাপ করিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবাকে সকলে মিলিয়া যে এত গালাগালি দিল তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সকালে সূর্য উঠিলে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি নামিলে সে বিস্মিত বা বিচলিত হয় না। এ ব্যাপারেও হইল না। বিবাহ ব্যাপারে এসব হইয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্য বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

নকুল নন্দী তাহার সম্পর্কে যে মিথ্যা ভাষণ করিয়াছিলেন ইচ্ছা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত। কিন্তু করিল না। স-সঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। গোকুলকে স্বামীরূপে পাইয়া সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, অকারণ বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন কি। সে প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছে, সে গোকুলের অনুপযুক্ত, অনধিকারী হইয়াও সে ভাগ্যবলে সুখ-স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে; কলহ কোলাহল তুলিয়া এ আনন্দলোক হইতে নির্বাসিত হইতে সে চায় না।

গোকুল বলিল—"বাবা মা বলছেন আবার আমার বিয়ে দেবেন।'

তিলু চুপ করিয়া রহিল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে?"

"বেশ তো। হিঁদুর ঘরে হয় তো অমন।"

"তোমার কষ্ট হবে না?"

"আমার? না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, "হলেও তোমার যদি তাতে সুখ হয় সে কষ্ট সহ্য করব।"

গোকুলের মনে হইল ইহা অভিমানের কথা। কিছু বলিল না।

চার

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

তিলুর সম্বন্ধে মোহমুক্ত হইবার পক্ষে এক বৎসর যথেষ্ট সময়। না জানেলেখা-পড়া, না জানে গানবাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মতো খাটিতে পারে। কাঁড়ি-কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি-

রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রূক্ষেপ নাই। মা তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেন না, সে বাহিরের কাজকর্ম লইয়াই থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আকাশে চাঁদ উঠিল কি না, বকুল বনে পাপিয়া ডাকিল কি না, এ সবের খোঁজ রাখা তাহার সাধ্যাতীত।

নাট্য-শিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!

বাবা যদিও এখনও বেহাই-গুষ্টির উপর চটিয়া আছেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা তিনি আর উত্থাপন করেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোকুলের পক্ষেও মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করা শক্ত। এমন সময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

পাঁচ

'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। সেলুকাস ও আন্টিগোনাস অভিনয় করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে—কিন্তু পোশাক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীক পোশাক আনিবার জন্য গোকুল কলিকাতা যাইতেছিল। স্টেশনে টিকিট করিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল একজন প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুঁটুলি ও কাপড়-চোপড় সামলাইয়া তিনি কিছুতেই টিকিট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকে চতুর্দিক হইতে ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাঁহাকে কেবল পিছাইয়া দিতেছে। গোকুল তাঁহাকে সাহায্য করিল। টিকিট কিনিয়া দিল। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সহিত কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই, সুতরাং গোকুলকে সে ভারও লইতে হইল। গোকুলের কামরাতেই তিনি উঠিলেন। গোকুল নিজের নানারূপ অসুবিধা করিয়া, এমন কি একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কলহ করিয়াও তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ হইলেন।

কামরা ক্রমশ খালি হইয়া গেলে প্রৌঢ়া পুঁটুলি হইতে পান বাহির করিয়া গোকুলকে একটি দিলেন, নিজেও একটি লইলেন। তাহার পর চকচকে একটি রূপার কৌটা হইতে খানিকটা জরদাও বাহির করিলেন। গোকুল লইল না, অভ্যাস ছিল না। প্রৌঢ়া স্মিতমুখে নিজের মুখ-বিবরে খানিকটা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"কপাল যখন পুড়ে গেল তখন একে একে সবই ছাড়তে হল—এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারি নি বাবা।"

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিচ ফেলিলেন।

আলাপ শুরু হইয়া গেল।

দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে তিনি গোকুলের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমন কি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন—"তুমি যে আবার বিয়ে করব বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও ?"

"এখনও হয় নি।"

আর-এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, "দেখ বাবা, তাহলে সব কথা তোমাকে খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে আছে, ওই মেয়েটি হবার পরই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মতো একটি পাত্র আমি খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পালটি ঘর, তোমাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার, আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয়—যদি বল তাহলে—"

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

"ঊষাকে আগে দেখ তুমি। তোমার যদি পছন্দ হয় তাহলে—"

আমতা আমতা করিয়া গোকুল বলিল, "আমার একটি স্ত্রী বর্তমান আছে সে কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।"

"আমার কথার ওপর কথা কইবে ঊষা! তেমন মেয়েই সে নয়। তাকে লেখাপড়া গানবাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মতো অবাধ্য তাকে হতে দিই নি। আর একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তা ছাড়া তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়— অ্যাঁ, কি বল—"

"তা তো ঠিকই—"

"তা হলে সে স্ত্রী থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি—অ্যাঁ, কি বল—"

"তা তো ঠিকই।"

ছয়

উষা উষা নয়—দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে, চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌড় সারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই, হাসির পরদায় পরদায় এমন গিটকিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল।

গোকুল কূল হারাইল।

সাত

ইহার মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সব ঠিক হইয়া গেল। উষাকে লইয়া উষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কথাবার্তা চালু করিয়া দিলেন। উষাকে দেখিয়া গোকুলের মা মুগ্ধ নয় আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটো-খাটো একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। উষার মায়ের নামে একটি কলঙ্ক নাকি আছে—যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দিলে না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়! যৌবনকালে অমন পদস্খলন দু-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি। উষা একটি শর্ত করিল এবং সে শর্তেও গোকুল, গোকুলের মা, বাবা সকলে রাজী হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মতো বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আট

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে—কাল সকালেই উষার মা তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। কই তিলোত্তমা তো এখনও আসিল না। এত কাণ্ড

"কপাল যখন পুড়ে গেল তখন একে একে সবই ছাড়তে হল—এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারি নি বাবা।"

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিচ ফেলিলেন।

আলাপ শুরু হইয়া গেল।

দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে তিনি গোকুলের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমন কি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন—"তুমি যে আবার বিয়ে করব বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও?"

"এখনও হয় নি।"

আর-এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, "দেখ বাবা, তাহলে সব কথা তোমাকে খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে আছে, ওই মেয়েটি হবার পরই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মতো একটি পাত্র আমি খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পালটি ঘর, তোমাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার, আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয়—যদি বল তাহলে—"

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

"ঊষাকে আগে দেখ তুমি। তোমার যদি পছন্দ হয় তাহলে—"

আমতা আমতা করিয়া গোকুল বলিল, "আমার একটি স্ত্রী বর্তমান আছে সে কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।"

"আমার কথার ওপর কথা কইবে ঊষা! তেমন মেয়েই সে নয়। তাকে লেখাপড়া গানবাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মতো অবাধ্য তাকে হতে দিই নি। আর একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তা ছাড়া তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়— অ্যাঁ, কি বল—"

"তা তো ঠিকই—"

"তা হলে সে স্ত্রী থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি—অ্যাঁ, কি বল—"

"তা তো ঠিকই।"

ছয়

উষা উষা নয়—দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে, চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌড় সারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই, হাসির পরদায় পরদায় এমন গিটকিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল।

গোকুল কূল হারাইল।

সাত

ইহার মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সব ঠিক হইয়া গেল। উষাকে লইয়া উষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কথাবার্তা চালু করিয়া দিলেন। উষাকে দেখিয়া গোকুলের মা মুগ্ধ নয় আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটো-খাটো একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। উষার মায়ের নামে একটি কলঙ্ক নাকি আছে—যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দিলে না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়! যৌবনকালে অমন পদস্খলন দু-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি। উষা একটি শর্ত করিল এবং সে শর্তেও গোকুল, গোকুলের মা, বাবা সকলে রাজী হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মতো বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আট

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে—কাল সকালেই উষার মা তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। কই তিলোত্তমা তো এখনও আসিল না। এত কাণ্ড

হইয়া গেল, তিলোত্তমা একটি কথাও বলে নাই—তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। গোকুল এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল। সমস্ত কাজ সারিয়া তিলোত্তমা অনেক রাত্রে শুইতে আসে, খুব ভোরে আবার উঠিয়া যায়। তাহার দেখা পাওয়াই শক্ত। গত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও তাহার সহিত নির্জনে দেখা হয় নাই—এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয় নাই। একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বই কি। গোকুল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ গোকুলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল তিলোত্তমা স-সঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছে।

"শোন, শোন।"

"কি ?"

"আজ আশীর্বাদ, মনে আছে তো ?"

"আছে।"

"দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো ?"

"না।"

"বিয়ের পরই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলছে—শুনেছ সে কথা ?"

"শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক আধবার যাও যদি দয়া করে, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

চলিয়া গেল।

গোকুল কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল তিলোত্তমা ছাই গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

নয়

আশীর্বাদের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ঊষার মা আসিলেন। প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালাও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, ঊষা সারারাত ধরিয়া নিজের হাতে মালাটি গাঁথিয়াছে।

গোকুল স্নান করিয়া আসিল। কার্পেটের আসন পাতা হইল। মালা পরিয়া গোকুল আসনে বসিতে যাইবে এমন সময় গোকুলের মা বলিলেন—"শাঁক বাজায় কে, আমার ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ হয়েছে আবার। ও বৌমা, কোথা গেলে তুমি—শাঁখটা বাজাও—"

শাঁখটা হাতে লইয়া স-সঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

"আমাকে মাপ করবেন।"

দুই হাতে মালাটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

● দ্বিতীয় শতক ●

চান্দ্রায়ণ

ট্রেন চলিতেছে।

কামরার মধ্যে চন্দ্রবাবু একা। আপাত-দৃষ্টিতে দ্বিতীয় লোক না থাকিলেও চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের মনের কথা স্তূপীকৃত। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন কালিতে বিভিন্ন কাগজে নিবদ্ধ অজস্র লোকের সহস্র প্রকার মনোভাব। নীরব অথচ মুখর। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে···অন্ধকার গভীর রাত্রি··· স্বপ্নলোকে বিচরণ করিবার এই তো উপযুক্ত সময়। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে চন্দ্রবাবু এক খিলি পান মুখে ফেলিয়া দিলেন। জরদার কৌটাটি ফতুয়ার পকেট হইতে বাহির করিয়া ঢাকনির উপর বার দুই তর্জনী-আঘাত করিয়া তাহা খুলিলেন, বেশ খানিকটা জরদা তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে ধীরে ধীরে তাহা ব্যায়ত-আননে নিক্ষেপ করিলেন। জানালা খুলিয়া পিক ফেলিলেন। জানালাটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিতে হইল—বেশ জোরে একটা হাওয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নাবিষ্ট চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রবাবু ধীর প্রকৃতির মানুষ। তড়বড় করিয়া এটা উলটাইয়া ওটা ভাঙিয়া ছটফট করিয়া বেড়ানো তাঁহার স্বভাব নয়। যাহা করেন, ধীরে সুস্থে করেন। পাঁচখানি চিঠি বাছিয়াই রাখিয়াছিলেন। সব চিঠি পড়িবার সময় নাই···চাকরি করিতে হইবে তো। সময় থাকিলে চন্দ্রবাবু সব না হোক আরও অনেক চিঠি নিশ্চয়ই পড়িতেন। এ সব বিষয়ে তাঁহার কৌতূহলী মন কখনও ক্লান্তি-বোধ করে না। খামের চিঠি খুলিবার বিবিধ কৌশল তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহার জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন তাহা তাঁহার সঙ্গেই থাকে।

খামগুলি চন্দ্রবাবু একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর নিবিষ্টচিত্তে শুরু করিলেন।

দুই

চন্দ্রবাবু যুবক নন, স্থবির বৃদ্ধও নন। বস্তুত বাহির হইতে দেখিতে তাঁহাকে মনুষ্যরূপী ঝুনা নারিকেল বলিয়া মনে হয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের ঠিক

কোন স্থানে তিনি অবস্থিত তাহা বলা কঠিন। চাকরির খাতা অনুসারে তাঁহার বয়স আটচল্লিশ—কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা। কয় বৎসর যে তিনি কমাইয়াছেন তাহা জানাও শক্ত, কারণ সে খবর যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কেহ বাঁচিয়া নাই। মুখ দেখিয়াও সঠিক কিছু বলা যায় না। দাড়ি-গোঁফ-জুলফিতে পাক ধরিবামাত্রই তিনি ক্ষুর ও কলপের সাহায্য লইয়াছেন। তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা মাধুরীর নিকট অপ্রতিভ হইবার লোক তিনি নন। কিন্তু বয়স যাহাই হউক চন্দ্রবাবু রসিক ব্যক্তি। ঝুনা নারিকেলের অন্তরে শাঁস-জল আছে। তাঁহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয় তাহা স্বপ্নালুতারই ছদ্মবেশ। আ-কৈশোর রস-পিপাসু তিনি। ছন্দ মিলাইয়া কবিতা অবশ্য কখনও লেখেন নাই—ও সব তুচ্ছ ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি হয় না তাঁহার। কবিতা লিখিয়া কি হইবে? কবিতা করা কিংবা কবিতা অনুভব করা—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে তাহার রসাস্বাদন করাই তো আসল কথা। তাহা তিনি বহুবার করিয়াছেন। মাসতুতো ভাই তেনা বাঁচিয়া থাকিলে বলিতে পারিত যে, কি আগ্রহভরে এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি বাসরঘরে, অথবা নবদম্পতির শয়ন-কক্ষে কৈশোর-কালে আড়ি পাতিতেন। চোরের মতো চুপিচুপি উঠিয়া গিয়া কত বাতায়ন-তলে যে তিনি কান পাতিয়াছেন, কত ছিদ্রপথে যে চোখ রাখিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যৌবনকালেও কবিতা করিয়াছেন অনেক। তাহার ইতিহাস তৎকালীন পরিচিত ডাক্তারেরা এবং তাঁহার বিগত দুই পত্নী জানিতেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভগবান চাকরিটিও জুটাইয়া দিয়াছেন চমৎকার। আর. এম. এস. এর সর্টার তিনি।

বহু কবিতা অনুভব করিবার সুযোগ মিলিয়াছে এবং মিলিবে।

চিঠির ভিতর কত জিনিসই যে দেখিয়াছেন! কত অদ্ভুত রকম মজা! চিঠির কাগজে প্রকাণ্ড ডিগ্রিওলা লোকের নাম ছাপা—মহা বিদ্বান লোক কিন্তু স্ত্রীকে (অবশ্য, স্ত্রী কি না ভগবানই জানেন!) এমন অশ্লীল ভাষায় চিঠি লিখিয়াছেন যে, তাহা উচ্চারণ করা যায় না। পড়িতে কিন্তু বেশ লাগে।

আগে আগে চন্দ্রবাবু মেয়েলী হাতের লেখা দেখিয়া পত্র খুলিতেন—এখনও দুই একটা খোলেন—কিন্তু এখন চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, মেয়েরা তেমন রসাল চিঠি লিখিতে পারে না। প্রায়ই 'আমি ভালো আছি', 'তুমি কেমন আছ' জাতীয়

কথায় ভরতি। বড় জোর 'তোমার জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে—তুমি কবে আসিবে'--আর শেষে সেই এক বাঁধা গৎ 'চিঠির উত্তর দিও। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জেনো'—অজস্র বানান ভুল। 'চুমু নাও' মাঝে মাঝে পাইয়াছেন অবশ্য, কিন্তু অধিকাংশই বাজে। কখনও কোনো রসবতীর দেখা যে পান নাই তাহা অবশ্য সত্য নহে—সেই লোভেই এখনও দুই-একটা মেয়েলী হাতের লেখা খোলেন—কিন্তু কদাচিৎ সে রকম রসিকার দেখা পাওয়া যায়। অধিকাংশই বাজে। কী কী জিনিস কিনিয়া আনিতে হইবে তাহারই লম্বা ফর্দ সেদিন পাইয়াছিলেন একটা। চিঠি নামমাত্র—সবই ফর্দ। স্বামীকে নয়, যেন বাজার সরকারকে পত্র লিখিতেছে! মেয়েরা মজাদার চিঠি লিখিতে পারে না ইহাই চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা।

খামের উপর পুরুষ-হস্তে মেয়ের ঠিকানা-লেখা দেখিলে চন্দ্রবাবু পুলকিত হইয়া ওঠেন। পুরুষদের লেখা চিঠিতেই বস্তু থাকে। এ বিষয়েও অবশ্য চন্দ্রবাবুকে হতাশ হইতে হইয়াছে—বাংলা ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা তাঁহার জানা নাই। পুরুষের লেখা মেয়েলী নামের চিঠি খুলিয়া হয়তো দেখিলেন হিন্দী কিংবা অন্য কোনো ভাষা। কিংবা হয়তো কোনো পিতা কন্যাকে পত্র লিখিতেছেন কিংবা পুত্র মাতাকে। আর এক জাতীয় বিশেষত্বহীন চিঠিও তিনি মাঝে মাঝে খুলিয়া ফেলেন যাহাতে বোঝাই যায় না যে লেখকের সহিত উদ্দিষ্টা রমণীটির ঠিক সম্পর্ক কি। কিন্তু এ সব কথা বাদ দিলেও মোটের উপর পুরুষদের লেখা চিঠিতেই চন্দ্রবাবু বেশী মজা পাইয়াছেন। ভালো ভালো চিঠির অংশবিশেষ টুকিয়াও রাখিয়াছেন। পুরুষরা নির্লজ্জ—তাহারাই কলম ছুটাইতে জানে! তাছাড়া তাহারা বেপরোয়া। পুরুষদের লেখা চিঠির ভিতরেই তিনি একবার একশত টাকার নোট একখানা পাইয়াছিলেন। কে যেন লুকাইয়া প্রিয়তমাকে উপহার পাঠাইতেছিল। নোট অবশ্য ওই একবারই পাইয়াছেন কিন্তু ছবি পাইয়াছেন বহু। তাঁহার একটা অ্যালবামই ভরিয়া গিয়াছে। ফরাসী, জার্মানী, ইহুদী, ইংরেজ, জাপানী, বাঙালী, উড়িয়া—কত জাতের কত ঢঙের কী ছবি সব। পুরুষদের লেখা চিঠিতেই যে প্রকৃত রসের সম্ভাবনা এ বিষয়ে চন্দ্রবাবু নিঃসন্দেহ। মেয়েলী হাতের লেখা চিঠিও মাঝে মাঝে তাক লাগাইয়া দেয় অবশ্য। একবার একটা চিঠিতে ঠোঁটের ছাপ ছিল। রসের কথাও থাকে মাঝে মাঝে। তবু পুরুষের লেখা চিঠির দিকেই চন্দ্রবাবুর ঝোঁক বেশী।

তিন

মেয়েলী হাতের লেখা প্রথম চিঠিখানি খুলিয়া চন্দ্রবাবু হতাশ হইলেন। তবু পড়িতেছিলেন।

দিদি,

তোমার রিপ্লাই কার্ড গতকাল পাইলাম। তুমি আমাদের রিপ্লাই কার্ড লেখ ইহা তোমার পক্ষে লজ্জাকর না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমাদের লজ্জা হয়। তোমার বোঝা উচিত যে, এখানে এখন সব দিক সামলাইবার মতো লোক এক আমি ছাড়া আর কেহ নাই। বাবা কিছুই দেখেন না। সমস্ত হাঙ্গামা আমাকে একা পোহাইতে হয়। তা ছাড়া আমার চাকরী আছে। এক মুহূর্ত বিশ্রামের সময় পাই না। তবু তোমার চিঠি পাওয়ার দুই দিন আগেই গদাধরকে স্যাকরার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার গহনা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। সাত দিন পূর্বে যখন গিয়াছিলাম তখন মাত্র কানপাশাটা হইয়াছিল। শনিবার আমার নিজে গিয়া পুনরায় দেখিবার কথা ছিল। কিন্তু আমার মোটে অবসর নাই—স্কুলের প্রাইজ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছি—গার্লস গাইডের সমস্ত ভার আমার উপর। তোমার রসিদটা আমি আজই তালুকদার মহাশয়কে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি তাঁহাকেই চিঠি লিখিয়া গহনা ডেলিভারি লইবার ব্যবস্থা কর। কানপাশাটা আমি দেখিয়াছি, চমৎকার হইয়াছে। অন্যগুলির কথা বলিতে পারিলাম না। দেখিবার সময় নাই। তোমাকে মিনতি করিতেছি এরকম কড়া কড়া চিঠি লিখিয়া আমার মন খারাপ করিয়া দিও না।

ইতি—নমিতা

চন্দ্রবাবু চিঠিখানা একবার শুঁকিলেন। মৃদু আতরের গন্ধ আছে একটা। চক্ষু বুজিলেন। কল্পনানেত্রে একটি স্ফুরিতাধরা রুষ্টা তরুণীকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মানস-পটে অনিবার্যভাবে যে ছবিটি বারংবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাহা তাঁহার পরিচিত একটি শিক্ষয়িত্রীর—গলার সাঁকি বাহির করা—শাকচুন্নি-মার্কা সুঁটকো কালো মূর্তি—গলার এবং গালের হাড় উঁচু—খাঁড়ার মতো নাক—

"মরুক গে—"

চন্দ্রবাবু দ্বিতীয় পত্র খুলিলেন।

সাবিত্রীসমানেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা যদি একটু বুঝিয়া সমঝিয়া না চল তাহা হইলে এ বাজারে তো আমি গেলাম। চাউলের মন চল্লিশের উর্ধ্বে উঠিয়াছে, দাইলও অগ্নিমূল্য, তরিতরকারি কয়লা সমস্তই তদ্রূপ। সোপস্টোন-মিশ্রিত আটার দাম নীলাম্বর বলিল বারো আনা সের। সরিষার তেল দুই টাকা—ঘৃতের দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহসই হয় নাই। অতি সাধারণ কাপড় দশ টাকা জোড়া। তবু মাসের খরচ যথাসাধ্য কিনিয়াছি। সব নগদ দিতে পারিলাম না, নীলাম্বরের দোকানে অনেক ধার রহিয়া গেল। ধার না করিয়া উপায় কি, নবীনকে কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইল। আমি একা আর কত পারি বল। এমন দুঃসময়ে সায়া কি না পরিলেই নয়? হটাস্ করিয়া একটাকা গজ মার্কিন ধারে কিনিয়া বসিলে! আমাকে তুমি নবাব খাঞ্জা খাঁ মনে কর নাকি। প্রত্যহ জুতার চোটে চাঁদির চটা উঠাইয়া মনিব আমাকে পাঁচ শতও নয়, হাজারও নয়, মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা দেয় এ-কথা তোমাদের কত মনে করাইয়া দিব। আমার হাড়-মাস কালি হইয়া গেল যে। অত দাম দিয়া জরদা কিনিবারই বা কি দরকার। বাড়ির পাশে প্রফুল্লর দোকান হইয়া আমাকে ডুবাইবে দেখিতেছি—

"কি আপদ—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রবাবু পত্রটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। পুরা চার পৃষ্ঠা ধরিয়া ক্ষুদি-ক্ষুদি অক্ষরে কেবল ওই এক কথাই লিখিয়াছে লোকটা।

তৃতীয় পত্রটিও পুরুষের হস্তাক্ষর।

ঠিকানায় নাম নীলিমা বসু। খামের রঙ গোলাপী। এ পত্রটিও চন্দ্রবাবুকে হতাশ করিল। নীলিমা পুরুষের নাম!

নীলিমাবাবু,

আপনি যাইবার সময় দুইটি জিনিস ফেলিয়া গিয়াছেন—হকি স্টিক এবং সিগার কেস। আপনার ইউরিন পরীক্ষার রিপোর্ট আজ আসিল—এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। চার পার্সেন্ট সুগার আছে—কি সর্বনাশ!"

"কচু খেলে যা—"

বাজে চিঠি পড়িবার সময় নাই চন্দ্রবাবুর।

চতুর্থ পত্রটি খুলিলেন। এটি বেশ মোটা চিঠি। পুরুষের হস্তাক্ষর। খাম

খুলিতেই একটি ছবি বাহির হইল। অদ্ভুত ছবি! নানারকম পোস্টকার্ডে নানা-রকম ছবি তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু ঠিক এ রকমটি কখনও আর চোখে পড়ে নাই। বাঃ! মুগ্ধনেত্রে চন্দ্রবাবু চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি সহসা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। ছবি রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্রটি পড়িতে লাগিলেন। বাঃ বাঃ চমৎকার। এতক্ষণে শ্রম সার্থক হইল। এই তো চিঠির মতো চিঠি। বাহাদুর বটে ছোকরা। বাৎস্যায়ন, হ্যাভেলক এলিস, ফ্রয়েড, কিছু আর বাকি রাখে নাই। কী ভাষা, কী বর্ণনা! চন্দ্রবাবুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল—ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার তিনি পত্রখানি পড়িলেন। তবু তৃপ্তি হইল না। একবার ইচ্ছা হইল চিঠিখানি রাখিয়া দেন—কিন্তু তখনই আবার মনে হইল—না সেটা অধর্ম হইবে। রাখিবার দরকার কি, ভালো জায়গাটা টুকিয়া লইলেই হইল। এসব জিনিস টুকিতেও সুখ। মাধুরীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। মাধুরীর সঙ্গে অবশ্য তিন দিনের আগে দেখা হইবে না—কিন্তু তিন দিন পরে তো হইবে। ইতিপূর্বে অনেকবার তিনি এই ধরনের চিঠি টুকিয়া মাধুরীকে শুনাইয়াছেন। সহসা মাধুরীর মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল! মাধুরীটা কেমন যেন! কিছুতেই যেন খুশী হয় না, কাছে গেলে প্যাচার মতো মুখ করিয়া বসিয়া থাকে! অথচ কী সুন্দর মুখখানি, হাসিলে গালে টোল পড়ে—কিন্তু কিছুতেই হাসিবে না। যাই হোক এই চিঠির খানিকটা মাধুরীকে শুনাইতেই হইবে—দেখি হাসে কি না এবার।

সাগ্রহে টুকিতে লাগিলেন।

টোকা হইয়া গেলে আদ্যোপান্ত পত্রটি আর একবার পড়িয়া চন্দ্রবাবু সেটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। ছবিটি অবশ্য বাহিরে রহিল।

এইবার পঞ্চম চিঠি।

ঠিকানাটা ইংরাজিতে টাইপ করা। নীল খাম।

এ ধরনের চিঠিতে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত রকম মজা পাওয়া যায়। অনেক স্বামী টাইপ-করা খাম স্ত্রীকে দিয়া আসেন। টাইপিস্ট ছুঁড়ীগুলাও তাহাদের প্রেমাস্পদকে মাঝে মাঝে চমৎকার চিঠি লেখে। টাইপ-করা ঠিকানায় অনেক ভালো জিনিস মিলিয়াছে অনেকবার।

চন্দ্রবাবু আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখবিবরে প্রেরণ করিয়া অর্ধস্তিমিত-লোচনে ধীরে ধীরে চোয়াল নাড়িতে লাগিলেন। লালারসে মুখ ভরিয়া

উঠিল। জানালা খুলিয়া আর একবার পিক ফেলিলেন। বাস্ রে কী তীব্র বিদ্যুৎ হানিতেছে। জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ চিঠিটা যেন নেশার মতো তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কী সাংঘাতিক বর্ণনা। ইহা পড়িলে মাধুরী এবার নিশ্চয়—

পঞ্চম চিঠিটি খুলিলেন।

অনঙ্গ,

তুমি আসবে শুনে খুব সুখী হলাম। তোমারই আশাপথ চেয়ে আছি। আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যেখানে হোক নিয়ে যাও। তুমি যেখানে যেমনভাবে রাখবে সেইখানেই তেমনিভাবে থাকব আমি। কেবল এ নরক থেকে উদ্ধার কর আমাকে। তুমি দেরি কোরো না। বুড়োটা কাল সকালে ডিউটিতে বেরুবে—তিনদিন পরেই ফিরবে আবার। আশা করি কাল বিকেলে কিংবা সকালে এসে পড়বে। আমি তৈরী থাকব। আমার অসংখ্য চুম্বন নাও।

ইতি—

তোমারই মাধুরী

প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বাহিরে একটা বজ্র পড়িল।

কাত্যায়নী

প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রভাতিক গীতি-বন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ পাঠে মগ্ন, কেহ গোচারণে গিয়াছেন, কেহ সমিধ আহরণে ব্যস্ত। আশ্রম-অঙ্গন-প্রান্তে যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী কাত্যায়নী উদূখলে মুষল প্রহার করত নীবার কণ্ডন করিতেছেন এবং কৌতুকসহকারে লক্ষ্য করিতেছেন অদূরে ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-সন্নিহিত গুল্ম-ছায়ায় সাবধান-সঞ্চরণে তিত্তির-দম্পতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অতিশয় চতুর সঙ্গোপনশীল প্রাণী ইহারা, আশ্রম শান্ত না হইলে আত্ম-প্রকাশ করে না। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলে প্রত্যহই কাত্যায়নীর যে-কাহিনীটি মনে পড়ে অদ্যও তাহা পড়িল। কথিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে পৌরোহিত্য করিতে অস্বীকৃত হইয়া গুরুর নিকট শিক্ষিত বেদ বমন করিয়া দেন এবং সে সমস্তই তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরিয়া নাকি বহির্গত হয়। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলেই কাত্যায়নী উক্ত অলৌকিক কাহিনীটি স্মরণ করেন। একদা স্বামীকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেন নাই, মৃদুহাস্য করিয়াছিলেন মাত্র। জ্ঞান-গম্ভীর তপস্বী স্বামীকে প্রগল্‌ভ প্রশ্ন করিতে কাত্যায়নীর শঙ্কা হয়। বস্তুত, স্ত্রী-প্রজ্ঞা কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্য-সমীপে চিরকালই সঙ্কুচিতা, গৃহকর্মের মধ্যে তিনি আজীবন আপনাকে অবলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, মৈত্রেয়ীর মতো তো তাঁহার বাক্‌পটুতা অথবা বিদ্যাবত্তা নাই যে স্বচ্ছন্দে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দীর্ঘ কথোপকথনে নিরত হইতে পারেন। ভারতপূজ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তিনি কী আলাপ করিবেন!

সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন কুটীর-অভ্যন্তরে ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "অয়ি, পতির প্রতি প্রীতিবশত পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি, জায়ার প্রতি প্রীতিবশত জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। অয়ি, পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশত পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়—"

কাত্যায়নীর ওষ্ঠপ্রান্ত ঈষৎ বক্র হইল। তিনি অনুমান করিলেন অদ্যও সপত্নী মৈত্রেয়ী স্বামী-সহ ব্রহ্ম-বিষয়ক বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াছেন। কাত্যায়নীর মনে প্রশ্ন

জাগিল, ইহা না করিয়া অরণি-সহযোগে অগ্নি উৎপাদন করত ভর্তার নিমিত্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিলে কি পত্নী-কর্তব্য চারুতর রূপে নিষ্পন্ন হইত না ? কাত্যায়নী বুঝিতে পারেন না মৈত্রেয়ীর মনোভাব কী। মৈত্রেয়ী কোনোদিনই গৃহকর্ম বিষয়ে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ করেন না, গৃহকর্মে সাতিশয় নিপুণাও নহেন, ব্রহ্ম-বিদ্যা-অনুশীলনেই তাঁহার যত কুশলতা ! ব্রহ্ম, আত্মা, অমৃত ! কাত্যায়নীর ওষ্ঠপ্রান্ত বক্রতর হইল। তিনি অধিকতর শক্তিপ্রয়োগ করত উদূখলে মুষলচালনা করিতে লাগিলেন। ক্ষুব্ধ ক্ষোভে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুনরায় তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল স্বামী বলিতেছেন, "যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণাকে গ্রহণ করিলে অথবা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দসমূহ গৃহীত হয়, যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক পৃথক ধূম নির্গত হয়, তেমনি অয়ি মৈত্রেয়ি, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ—"

ধূম শব্দটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিবামাত্র কাত্যায়নীর স্মরণ হইল গতসন্ধ্যায় ধূম্রানাম্নী আশ্রম-ধেনুটি কিঞ্চিৎ অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল, অবিলম্বে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্তব্য, হয়তো অচিরে তাহার শুশ্রূষারও প্রয়োজন হইবে। উদূখল-গাত্রে মুষলটি তির্যগ্‌ভাবে স্থাপনকরত কাত্যায়নী গোশালা অভিমুখে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া তাঁহার চিন্তা দূরীভূত হইল, দেখিলেন ধূম্রা সুস্থ হইয়াছে, তৃণচর্বণে আর অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। কাত্যায়নীকে দেখিয়া ধূম্রবর্ণা স্নিগ্ধনেত্রা ধূম্রা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল, কাত্যায়নী তাহার সুচিক্কণ পৃষ্ঠদেশে স্নেহভরে হস্তার্পণকরত তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

অদূরে বৃদ্ধ আশ্রম-মৃগ চিত্রক ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্বাদল-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল, কাত্যায়নীর পদশব্দে সে-ও তাহার শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত-শৃঙ্গ-শোভিত মস্তক তুলিয়া স্নেহ-প্রত্যাশী একাগ্র দৃষ্টিতে কাত্যায়নীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী তাহার নিকটেও গেলেন এবং ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমাকে লইয়া খেলা করিবার মতো সময় এখন আমার নাই, আমার অনেক কাজ।" চিত্রক শৃঙ্গ-শোভিত মস্তকটি একবার সঞ্চালিত করিয়া পুচ্ছটি ঈষৎ আন্দোলিত করিল এবং ভর্ৎসিত হইয়া অমনোযোগী বালক যেমন পাঠে মনঃসংযোগ করে তেমনি নবদূর্বাদলে মনঃসংযোগ করিল।

কাত্যায়নী পুনরায় অঙ্গন-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল হয়তো এতক্ষণ বায়সকুল আসিয়া নীবার ভোজন করিতেছে। এবম্বিধ আশঙ্কা সত্ত্বেও কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাঁহাকে থামিতে হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, নবাগত আশ্রম-বালক আরুণির পীতবর্ণ উত্তরীয়টি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে। আরুণি কিছুক্ষণ পূর্বে গোচারণে গিয়াছে। প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে বিধৌত আর্দ্র উত্তরীয় শুষ্ক করিবার মানসে আরুণি প্রত্যহ সেটি আমলকী-শাখায় প্রলম্বিত করিয়া দেয়, কিন্তু গ্রন্থি শিথিল থাকে বলিয়া প্রায়শই তাহা বায়ুতাড়িত হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রায় প্রত্যহই কাত্যায়নী আরুণির উত্তরীয়টি ধূলি হইতে উদ্ধার করেন। উত্তরীয় হইতে ধূলি অপসারণ করিতে করিতে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করত অন্য দিনের মতো আজিও স্থির করিলেন যে আরুণির ঈদৃশ অনবধানতার জন্য অদ্য তাহাকে ভর্ৎসনাই করিতে হইবে। একাধিক বার তিনি এ সঙ্কল্প করিয়াছেন। আরুণিকে এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে তিনি সচেতন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কণ্ঠে ভর্ৎসনার স্বর এ-যাবৎ ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। দুষ্টমতি এই চঞ্চল বালকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভর্ৎসনাবাক্য রসনা হইতে নির্গত হইতে চাহে না, পরন্তু স্নেহ-রসে সমস্ত অন্তর আপ্লুত হইয়া যায়। ইহা আশ্চর্যের বিষয় হইলেও সত্য যে আরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়া-প্রবণতা, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদ্‌গুণাবলীই তাহাকে কাত্যায়নীর নিকট প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রবাসী বটুর উপর কিছুতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।

অঙ্গনে প্রত্যাগত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার আশঙ্কা অমূলক ছিল না, একাধিক বায়স আসিয়া নীবার-অপহরণে রত হইয়াছে। করতালি-শব্দে তিনি তাহাদের বিতাড়িত করিলেন, ইঙ্গুদী বৃক্ষ তলস্থ তিত্তির-দম্পতিও এই শব্দে সচকিত হইয়া গুল্মান্তরালে আত্মগোপন করিল। কাত্যায়নী উদূখল-সমীপবর্তিনী হইয়া পুনরায় নীবার-সংস্কারে মনোযোগ দিলেন।

পুনরায় তাঁহার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল স্বামী আবেগভরে বলিতেছেন, "যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক করিয়া গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু জলের যে-কোনো অংশ হইতে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তেমনি অয়ি, এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘন। এই মহান্ আত্মা এই সমুদয় ভূত হইতে উত্থিত হইয়া ইহাতেই আবার বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"

এই সকল আধ্যাত্মিক বাক্যাবলী কাত্যায়নীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল না। অন্য কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল স্বামীর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর। সপত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া এমন আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে স্বামী কী বলিতেছেন। কই, এমন আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে স্বামী তাঁহাকে কোনো দিন কিছু বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না তো।

সহসা মৈত্রেয়ীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষা হইল। ক্ষোভ-সহকারে তিনি স্মরণ করিলেন মৈত্রেয়ী কেবল শাস্ত্র-চর্চাই করে, আর কিছু করে না। এই যে বৃহৎ আশ্রমে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মানী গুণী অতিথিবৃন্দ সততই আগমন করেন, যে আশ্রম পূর্ণ করিয়া বিদ্যার্থীর দল সর্বদাই বিরাজমান, যেখানে যাগ-যজ্ঞ নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই আছে, সে-আশ্রমের যাবতীয় পরিশ্রম-সাধ্য কর্মভার তিনি একাই তো এতকাল বহন করিলেন। মৈত্রেয়ী তাঁহার শ্রমভার লাঘবে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে? সে তো অহরহ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা লইয়াই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কাত্যায়নীর স্মরণপথে উদিত হইল কিছুকাল পূর্বে আশ্রমে যখন মন্থ-কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখনও মৈত্রেয়ী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত না করিয়া সমাগত জনৈক মুনির সহিত ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিয়াছিল। একা কাত্যায়নীই কয়েক জন আশ্রম-বালকের সহায়তায় উডুম্বর বৃক্ষ হইতে স্রুব, চমস, ইন্ধন, অরণি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে একাই ব্রীহি, যব, তিল, মাস, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসুর, খল্য, খলকুল প্রভৃতি গ্রাম্য শস্য একত্র করিয়া দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিতে হইয়াছিল। তিনিই রাত্রি জাগরণ করিয়া সমাগত অতিথিবর্গের জন্য পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী কিছুই করে নাই। তাঁহার আরও মনে পড়িল গত বৎসর ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য অংসল-বৃষ-মাংস-ভক্ষণেচ্ছু হইয়াছিলেন, তাহারও সমস্ত আয়োজন কাত্যায়নীকেই একা করিতে হইয়াছিল। তিনিই যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া মাংস-শূল্য প্রস্তুত করত স্বামীর সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ী কিছুই করেন নাই। অথচ স্বামীর আবেগ-কম্পিত যত আলাপ সব মৈত্রেয়ীর সঙ্গে! কাত্যায়নী একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার মনে হইল, না, না, ইহা মিথ্যা। মৈত্রেয়ী যতই না কেন ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনা করুক, স্বামীর নিভৃত অন্তর-দেশে কাত্যায়নীর আসন অবিচলিত আছে।

সহসা কুটীরাভ্যন্তরে আলোচনা বন্ধ হইল। দ্বারপ্রান্তে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দেখা দিলেন।

প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, পিঙ্গল জটাভারে বার্ধক্যের রজতচ্ছটা, জ্যোতির্ময় নয়ন-যুগল আনন্দ-সমুজ্জ্বল। কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "অয়ি কাত্যায়নি, আমি অদ্য বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। মৈত্রেয়ী সত্যই আনন্দদায়িনী, তাহার আগ্রহ-বিশুদ্ধ অমৃত-পিপাসা প্রকৃতই অনন্তমুখিনী, সত্যই ব্রহ্মবাদিনী সে। অয়ি কাত্যায়নি, গৃহস্থাশ্রমে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া আমি জীবনের শেষ-প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এইবার আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। সেজন্য তোমার ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে আমার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার মানসে আমি মৈত্রেয়ীকে আজ আহ্বান করিয়াছিলাম। মৈত্রেয়ী কী বলিল, জান? সে বলিল, আমি বিত্ত চাহি না, আমি অমৃতত্ব চাই, সমুদয়ের একায়ন যে আত্মা আমি তাহাকেই উপলব্ধি করিতে চাই। বিত্ত লইয়া আমি কী করিব। অয়ি কাত্যায়নি, আনন্দে, বিস্ময়ে, গর্বে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন মৈত্রেয়ী আমার প্রিয়া ছিল, আজ সে আমার প্রিয়তমা হইয়াছে—"

আবেগের আতিশয্যে বাক্‌রুদ্ধ হইল, যাজ্ঞবল্ক্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ব্রীড়াবনতমুখী মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া এক অপরূপ শোভা বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

ব্রহ্ম-অনভিজ্ঞা কাত্যায়নী পাংশু বিবর্ণমুখে উদূখল-সমীপে বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

স্মৃতি

হোটেলটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যে ঘরটিতে আমাকে থাকিতে দিয়াছে সেটিও সুন্দর। দক্ষিণ দিক খোলা, পাখাও আছে। খাওয়াও নিন্দনীয় নয়! যে কয়দিন কলিকাতায় থাকিব এইখানেই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে। কাহারও বাসায় উঠিয়া সসঙ্কোচে থাকার চেয়ে অনেক ভালো। ভালোই হইয়াছে। হোটেলের চাকর আসিয়া বিছানা করিয়া গেল। বেশ চাকরটি। ছিমছাম। পরিষ্কার ফতুয়া গায়ে, মাথায় ঈষৎ টেরি। চোখ মুখ হইতে বিনীত সম্ভ্রম বিকীর্ণ হইতেছে। বেশ ভালো লাগিল। মন্মথ আমাকে ভালো হোটেলই দেখিয়া দিয়াছে। নালিশ করিবার কিছু নাই। আহারাদি হইয়া গিয়াছিল, শুইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়াও ঘুম আসিল না। মুদিত চোখের সম্মুখে বহুদিন আগেকার বিস্মৃতপ্রায় একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকদিন আগে একবার একটি ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেদিনকার সেই ছবিটি বার বার মনে পড়িতেছে। ভদ্রলোক স্টেশন মাস্টার ছিলেন। স্থানটি গঙ্গার ধারে। স্টেশন খুব বড় নয়, কিন্তু সেখান হইতে প্রচুর মাছ চালান হইত। মাছের ব্যবসায় উপলক্ষেই সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানকার জেলেদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় মাছের কারবার খোলার ইচ্ছা ছিল। ব্যবসায়-সম্পর্কিত কাজ শেষ করিয়া পরের ট্রেনে ফিরিয়া আসিবার কথা, কিন্তু কাজ শেষ হইল না, থাকিতে হইল। কোথায় থাকা যায় চিন্তা করিতেছিলাম। জেলেদের বাড়িতে থাকিবার প্রবৃত্তি হইল না। পল্লীগ্রাম—হোটেল, ডাকবাংলা, ধর্মশালা কিছুই নাই। একজন বলিল—মাস্টার মশায়ের ওখানে যান না, সেখানে অবারিত দ্বার। গেলাম। একটু কুণ্ঠার সহিতই গেলাম। মাস্টার মশায়ের সহিত সকালে স্টেশনে আলাপ হইয়াছিল, মাছ চালান দিবার রেট, সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি জানিতে তাঁহার আপিসে গিয়াছিলাম। পুষ্ট-কান্তি সদা-হাস্যমুখ ভদ্রলোক। মাথায় ঈষৎ টাক, প্রশান্ত প্রদীপ্ত একজোড়া চোখ, পুরুষোচিত একজোড়া গোঁফ। তখন গ্রীষ্মকাল, আপিসেও খালি গায়ে ছিলেন। একবুক চুল, তাহার উপর ধপধপে সাদা উপবীত গুচ্ছ। টেবিলের উপর একটি টুকটুকে লাল গামছা পাট করা

আছে, প্রয়োজনের সময় তাহা দিয়াই হাতমুখ মুছিতেছেন। বাড়িতেও দেখিলাম সেই একই বেশ। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আসুন আসুন, আজকের ট্রেনে যাওয়া হল না বুঝি? বসুন, খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হল—ওই জেলে বেটাদের ওখানে তো সুবিধে হওয়ার কথা নয়, তার চেয়ে নিমু হালুয়াই ঢের ভালো। কিছু যদি না করে থাকেন আমার এখানেই হোক না না-হয়।"

একটু ইতস্তত করিয়া শুরু করিতেছিলাম, "ব্যবস্থা যা হয় একটা হয়ে যাবেই। আপনার এখানে আবার এত রাত্রে"—আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া মাস্টার মশায় বলিয়া উঠিলেন, "আরে রাত আর কত হয়েছে, এই তো সবে আটটা। আমার এখানেই হোক—বলে আসি ভেতরে," আমাকে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন—"গিন্নিকে কেবল একটু খবর দেওয়া যে আর চারটি চাল বেশী করে নাও। রাবণের চুলো তো জলছেই দিন রাত। রেলের কয়লা, পয়সা তো লাগে না—হা—হা—হা—"

চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া মাস্টার মশায় হাসিয়া উঠিলেন।

"এইবার আপনার পরিচয়টা নেওয়া যাক ভালো করে—চা খাবেন?"

"না থাক!"

"খানই না এক কাপ, এক কাপ চা খেলে আর কী হয়? কোথা দেশ আপনার?"

"হুগলী জেলায়।"

"বাঃ, আমারও যে হুগলী..."

একটু পরেই চা আসিল। তন্ন তন্ন করিয়া মাস্টার মশায় আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। এমন কি আমার শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর খবর যতটা আমার জানা ছিল তাহা তাঁহাকে বলিতে হইল। হাঁটু দোলাইয়া "বেশ বেশ" বলিতে বলিতে সাগ্রহে তিনি সব শুনিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন কোনো মনোজ্ঞ কাহিনী শুনিতেছেন। পরে জানিয়াছিলাম ইহাই তাঁহার স্বভাব। তুচ্ছ উচ্চ যাহাই হোক, মানবমাত্রেই তাঁহার প্রিয়। বহু মানুষের সঙ্গ, বহু মানুষের কাহিনী, বহু মানুষের সুখ-দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন। তাঁহার নিজের সংসারটি খুব ছোট। একটিমাত্র পুত্র, বিদেশে বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়ে। বাড়িতে স্ত্রী

ছাড়া আর কেহ নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রায় কুড়ি-বাইশ জন লোক খায়। টালি ক্লার্ক বাবুর বউ বাপের বাড়ি গিয়াছেন, তিনি মাস্টার মশায়ের বাসায় খান। নবাগত টিকিট কালেক্টারটির এখনও বিবাহ হয় নাই, একাই এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে মাস্টার মশায় আর রান্নার হাঙ্গামা করিতে দেন নাই। গঙ্গার ধারে বায়ুপরিবর্তন মানসে মাস্টার মশায়ের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কয়েকজন আসিয়াছেন, তাঁহারা নিত্য অতিথি। আমার মতো অনাহূত লোকও প্রায়ই থাকেন তুই-একজন। চাকরির আশায় গ্রামের একটি ছেলেও আসিয়াছেন। স্থানীয় বাঙালীরা মিলিয়া ছোটখাটো থিয়েটার পার্টি করিয়াছেন,তাহাতে যিনি বাঁশি বাজান তিনি এখানে খান। নানালোকের নানা পরিচয়, সকলেরই আশ্রয় এখানে। মাস্টার মশায়ের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, গুটিগুটি সকলে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বংশীবাদক ভদ্রলোক (স্থানীয় একটি মাড়োয়ারীর আড়তে মাস্টার মশায় তাঁহার চাকরি জুটাইয়া দিয়াছেন) প্রথমেই আসিলেন। ক্রমশ তবলা হারমোনিয়মও বাহির হইল। মাস্টার মশায়ের গানবাজনার শখ আছে। গায়কেরও অভাব নাই দেখিলাম। টালিক্লার্ক, ডাক্তারবাবু, দারোগাবাবুর শালা, বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও জন তুই—বেশ গাহিতে পারেন। দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। নিধুবাবু, রবিবাবু, দ্বিজুবাবু, রামপ্রসাদ কেউ বাদ গেলেন না। সব রকমই হইল। রাত্রি এগারোটার মালগাড়ি 'পাস' করিয়া ছোটবাবু আসিলেন। তথন চাকর আসিয়া খবর দিল—খাবার জায়গা হয়েছে। সকলে উঠিয়া ভিতরে গেলাম। এখনও ছবিটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। মাস্টার মশায়ের কোয়ার্টারের অপরিসর বারান্দায় আহারের স্থান হইয়াছিল। ছোট বারান্দায় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিতে হইল। সকলের ভাগ্যে আসনও জোটে নাই। পাট-করা শতরঞ্জি কম্বল বোরা প্রভৃতি দিয়া মাস্টার-গৃহিণী সমস্যার সমাধান করিয়াছেন দেখিলাম। আহারও অতি সাধারণ গোছের—কলাপাতার উপর গরম ভাত, একটু ঘি, আলুভাতে, ডালভাতে, একটা সাধারণ একটু ডাল, একটু তরকারি, মাছের ঝোল, একটু অম্বল। অতি সাধারণ ভোজ্য, কিন্তু কী পরিতৃপ্তি সহকারেই সেদিন যে খাইয়াছিলাম, আজও ভুলিতে পারি নাই। আহারাদির পর কোথায় শোওয়া যায় তাহাও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। মাস্টার মশায়ের কোয়ার্টারে স্থানাভাব। আমি ওয়েটিং রুমে রাতটা

কাটাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেই মাস্টার মশাই বলিয়া উঠিলেন—"খবরদার খবরদার, ছারপোকায় খেয়ে ফেলবে, অমন কাজটি করবেন না। দেখুন না এই-খানেই হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। গোটা দুই বেঞ্চি আছে—তাই জুড়েই করে দিচ্ছি দেখুন না।" বাইরের বারান্দায় দুইখানি বেঞ্চি জুড়িয়া মাস্টার মশাই নিজে দাঁড়াইয়া আমার বিছানা করাইয়া দিলেন। স্থানে-অস্থানে পেরেক ঠুকিয়া একটা হাওড়ার হাটের শতচ্ছিন্ন মশারিও টাঙানো হইল।

...সেদিন আহার শয্যা কিছুই ভালো ছিল না, কিন্তু এক ঘুমে রাত কাটিয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, সেদিন হইতে মাস্টার মশাই আমার আপনলোক হইয়া গিয়াছিলেন।

.. মাস্টার মশায়ের সম্বন্ধে কত কথাই মনে পড়িতেছে। একবার মনে আছে শীতকালে গিয়াছিলাম। ট্রেনটা খুব ভোরে পৌঁছিত। ট্রেন হইতে নামিয়া দেখি অভূতপূর্ব ব্যাপার। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের এক কোণে চায়ের একটা স্টল-গোছের হইয়াছে। অনেকেই চা পান করিতেছেন। পুলকিত চিত্তে আমিও আগাইয়া গেলাম। শীতকালের ভোরে এখানে চা পাইব আশাই করি নাই। চমৎকার চা। চা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাম কত ?"

"দাম লাগবে না বাবু।"

"দাম লাগবে না! সে কী!"

"মাস্টারবাবু মোসাফিরদের রোজ মাংনিতে পিলান"—এই অদ্ভুত আধাবাংলা আধাহিন্দীতে যে লোকটা জবাব দিল ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম সে স্টেশনেরই কুলি একজন। অবাক হইয়া গেলাম। সমস্ত প্যাসেঞ্জারদের মাস্টার মশাই বিনা পয়সায় চা খাওয়াইতেছেন! মাস্টার মশায়ের সহিত একটু পরে দেখা হইল।

"চায়ের সদাব্রত খুলেছেন, ব্যাপারটা কি ?"

দরাজ গলায় মাস্টার মশায় হাসিয়া উঠিলেন।

"আমার সে সামর্থ্য কি আছে ভাই? একজন টি মার্চেণ্ট এক 'কেস' চা এমনই দিয়েছিল। ভাবলাম একা খাই কেন, পাঁচজনে মিলে খাওয়া যাক। গণেশ মাড়োয়ারীকে বলাতে চিনিও পাঠিয়ে দিলে কিছু। ঘরের গায়ের দুধ—দুটো গোরুতে সের আষ্টেক দিচ্ছে আজকাল। আর রেলের কয়লা, রাবণের চুলো দিনরাত জ্বলছে। জংশন থেকে একটা বড় কেতলি আর কিছু কাপ সসার

আনিয়ে নিয়েছি। ঝক্স্বর ভোরে ডিউটি—তাকে বললাম তুইও খা, পাঁচজনকেও খাওয়া। বাস, মিটে গেল—"

আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মাস্টার মশায়ের উপর জোর-জবরদস্তি করিতেও কাহারও বাধিত না। লাইনের সকলের তিনি 'দাদা' ছিলেন। আর একবারের আর-একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। শীতকালে প্রচুর মাছ চালান হইত, প্রত্যেক জেলেই মাস্টার মশায়কে মৎস্য উপঢৌকন দিত। মাস্টার মশাই নিজের জন্য কিছু রাখিয়া বাকিটা বিতরণ করিতেন। ডাক্তারবাবু, দারোগা, পোস্ট মাস্টার প্রভৃতিকে তো দিতেনই, বেশী হইলে পরের স্টেশনের বাবুদেরও পাঠাইয়া দিতেন। একবার মাছ বেশী হয় নাই। চালান কম। পরের স্টেশনে পাঠাইবার মতো প্রচুর মাছ একদিনও জোটে নাই। হঠাৎ একদিন মাস্টার মশায়ের নামে একটা প্রকাণ্ড পার্শেল আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। আমি তখন সেখানে উপস্থিত। বাক্সটা খুলিতেই দুইটা বিড়াল লাফাইয়া বাহির হইয়া গেল। বাক্সে একখানা চিঠি ছিল। পরের স্টেশনের বাবুরা লিখিতেছেন—"দাদা, বিড়াল দুইটাকে পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা অন্তত আপনার পাতের কাঁটা চিবাইয়া বাঁচুক।"

"দেখেছ, দেখেছ, ছোঁড়াগুলোর কাণ্ড দেখেছ—"

মাস্টার মশাইয়ের চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল। তখনই বাজার হইতে কিছু মাছ কিনিয়া পরের ট্রেনে পাঠাইয়া দিলেন।

এমনই কত ঘটনা।...

কলিকাতায় নিজের কাজে আসিয়াছিলাম। হাওড়া স্টেশন হইতে সোজা হয়তো বড়বাজারের সেই হোটেলটাতেই উঠিতাম। হাওড়া স্টেশনেই পূর্ব-পরিচিত একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। তাহারই মুখে শুনিলাম মন্মথ বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, ভালো চাকরি পাইয়াছে, একটা ঠিকানাও আমাকে দিল। অনেকদিন মন্মথকে দেখি নাই, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল, হাওড়া হইতে সোজা তাহার বাসাতেই গেলাম। বাড়িটি বেশ সুন্দর।—আমি বারান্দায় উঠিতেই একটি বালক ভৃত্য আগাইয়া আসিল।

"কি চান আপনি ?"

"মন্মথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বল—"

বালকটি আমার কথা শেষ করিতে দিল না। ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটি শ্লেট-পেন্সিল আনিয়া বলিল—"আপনার নাম আর কেন দেখা করতে এসেছেন তা এতে লিখে দিন—"

লিখিয়া দিলাম। বালক-ভৃত্যটি ড্রইং রুম খুলিয়া দিয়া বলিল, "আপনি বসুন এখানে···"

বসিলাম। সোফা সেটিতে সাজানো ড্রইং রুমটি বেশ সুন্দর। সুরুচির পরিচয় দিতেছে। প্রায় মিনিট দশেক পরে মন্মথ বাহির হইল। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে চিনিতে পারিতাম না। ঢিলা পায়জামা পরা, বাটারফ্লাই গোঁফ। আশা করিয়াছিলাম প্রণাম করিবে, কিন্তু করিল না। কিন্তু আমাকে দেখিয়া তাহার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"ও আপনি এসেছেন—"

"অনেকদিন দেখি নি। ভাবলাম—"

"বেশ করেছেন। উঠেছেন কোথায়—"

"কোথাও উঠি নি এখনও। হাওড়া স্টেশনে বেচুলালের সঙ্গে দেখা, সেই তোমার খবর আর ঠিকানা দিল। সোজা এখানেই চলে এলাম···"

মন্মথ হাতঘড়িটা একবার দেখিল। তাহার পর বলিল—"আমার বাসায় আজ মোটে জায়গা নেই। একে ছোট বাসা, তার উপর আমার শালী ভায়রাভাই সবাই এসেছেন। চলুন আপনার থাকবার জায়গা একটা ঠিক করে ফেলা যাক আগে। বেশী রাত হয়ে গেলে হোটেলেও জায়গা পাওয়া যাবে না। যা লোকের ভিড় আজকাল কোলকাতায়—" অতিশয় যুক্তিযুক্ত এ উক্তিতে রাগ করিবার কিছু নাই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতেছে তাহার সোফা সেটি সরাইয়া ওই ড্রইংরুমে আমার শুইবার একটু স্থান কি করিয়া দিতে পারিত না?

আপনারা হয়তো বলিবেন এমন অসঙ্গত প্রত্যাশা আপনি করেন কেন? করিতাম না যদি এই মন্মথ সেই মাস্টার মশায়ের ছেলে না হইত।

মকরধ্বজ-মহিমা

স্থান বঙ্গদেশ, বৃন্দাবনবাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁহার পুত্র নিকুঞ্জবিহারী সাধারণ দৃষ্টিতে নিন্দনীয় পাত্র নয়—বিদ্বান্ এবং চাকুরিস্থ। তথাপি কালের গতিক এমনই হইয়াছে যে বৃন্দাবনবাবুকে পুত্রের বিবাহের জন্যই চিন্তিত হইয়া পড়িতে হইল। নিকুঞ্জবিহারী অবশ্য কন্যা নয়, বৃন্দাবন বাহিরে ব্যস্ততা দেখাইবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না, মনে মনে কিন্তু তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন। বিবাহের প্রস্তাব যে আসে নাই তাহা নয়, অনেক আসিয়াছিল, কিন্তু নিকুঞ্জকে দেখিবার পর আর কেহ ফিরিয়া আসে নাই। নিকুঞ্জ ট্যারা। সুতরাং পুত্রের বিবাহ ব্যপদেশে বৃন্দাবন অর্থাগমের যে আশা করিয়াছিলেন তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া রুষ্ট চিত্তে কালের গতিকেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এ সম্পর্কে ইহা ছাড়া তাঁহার আর কিছু করিবার ছিল না। পরিস্থিতি এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত শানাই বাজিল। কারণ কালের গতিক পরিবর্তিত হইলেও প্রেমের গতিক পরিবর্তিত হয় নাই। ট্যারা নিকুঞ্জ খাঁদা কাদম্বিনীর প্রেমে পড়িয়া গেল। একেবারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িল।...

কাদম্বিনীর পিতা ত্রিলোচন দাঁ ও নিকুঞ্জের পিতা বৃন্দাবন মল্লিক সহকর্মী। একই ব্যাঙ্কে উভয়ে কর্ম করেন। বৃন্দাবন কেশিয়ার, ত্রিলোচন কেরানী। উভয়ের বাসাও কাছাকাছি, ঘরও পালটি। তথাপি কোনো পক্ষই যে ইতিপূর্বে বিবাহের প্রস্তাব করেন নাই তাহার কারণ মৌখিক ভদ্রতা বজায় থাকিলেও মনে মনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ত্রিলোচনের আধুনিক চালচলন বৃন্দাবন পছন্দ করিতেন না, বৃন্দাবনের উচ্চপদ ত্রিলোচনের গাত্রদাহ সৃষ্টি করিত। সুতরাং ত্রিলোচন ট্যারা নিকুঞ্জবিহারীকে জামাইরূপে কল্পনা করিতে পারেন নাই, বৃন্দাবনের পক্ষেও কলেজ-গামিনী নাতি-উচ্চ-নাসা কাদম্বিনীকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল। প্রেমের দেবতা এসব গ্রাহের মধ্যে না আনিয়া তরুণ হৃদয়যুগলকে এক অদৃশ্য বঁড়শিতে গাঁথিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন।

পরিস্থিতি পরিবর্তিত ও জটিলতর হইল।

দুই

প্রেম ও অগ্নি বেশীদিন চাপা থাকে না।

নিকুঞ্জবিহারী ও কাদম্বিনীর প্রণয়ও বেশীদিন চাপা রহিল না। প্রকাশ হইয়া পড়িল। একদা ত্রিলোচন-গৃহিণী অগোছাল কন্যার টেবিল গুছাইতে গিয়া তাহার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যে কাগজের টুকরাটি আবিষ্কার করিলেন তাহা নিকুঞ্জবিহারী-লিখিত প্রণয়লিপি। সরল বঙ্গভাষায় লেখা। বুঝিলেন যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যখনই উনি মেয়েকে কলেজে পড়িতে দিয়াছিলেন তখনই খাল খনিত হইয়াছিল। এখন কুম্ভীর ঢুকিবেই, জানা কথা। ত্রিলোচন আকাশ হইতে পড়িলেন। গৃহিণীর তাড়নায় এবং বিবেকের তাগিদে অবিলম্বেই কিন্তু তাঁহাকে উঠিতে হইল। একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

তিন

ব্যবস্থা করিতে গিয়া ত্রিলোচন স্বয়ং অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। কন্যার মনোভাব দেখিয়া তিনি ঘাবড়াইয়া গেলেন। যতদিন গোপনতার আবরণ ছিল ততদিন সঙ্কোচ ছিল। এখন সহসা-উদঘাটিত-আবরণা মুহুর্মুহু-নিক্ষিপ্ত-শাণিত-মাতৃবাক্যবাণ-সম্মুখীনা কাদম্বিনী মরীয়া হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। দেশটা যে বাংলা দেশ, রাশিয়া নয়, কাদম্বিনী কিছুতেই তাহা বুঝিবে না। ট্যারা নিকুঞ্জকে ছাড়া আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না তা সে ব্যক্তি আই-সি-এস-ই হোক বা কন্দর্পই হোক। বড় ভয়ানক কথা। কন্যার অটল প্রবৃত্তিকে টলাইবার চেষ্টা যে বৃথা তাহা ত্রিলোচনকে অবশেষে উপলব্ধি করিতে হইল। অনুনয়-বিনয় তর্জন-গর্জন কিছুই কাজে লাগিল না। এই রাশিয়ান প্রবৃত্তির মুখে অগত্যা তখন তিনি সনাতন বঙ্গীয় মুখোস পরাইবার প্রয়াস পাইলেন। অর্থাৎ আন্তরিক বিরূপতা দমন করিয়া দন্তে হাসি ঝুলাইয়া বৃন্দাবনেরই দ্বারস্থ হইলেন। ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

চার

বৃন্দাবন চতুর লোক। কিন্তু অভদ্র নন।

তিনিও দন্তে হাসি ঝুলাইলেন,—"বেশ তো। এ তো আনন্দের কথা, আপনি

ঘরের লোক, আপত্তির তো কিছু দেখি না। বেশ, নিকুঞ্জকে দেখি ব'ল,… আজকালকার ছেলে জানেনই তো…"

আবার হাসিলেন।

"আচ্ছা, আমি তাহলে, পরে আসব একদিন—"

ত্রিলোচন চলিয়া গেলে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বৃন্দাবন কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ব্যাপারটা প্রণিধান-যোগ্য। ছেলেটা ট্যারা হইয়াই যত গোল করিয়াছে কি না। ভালো ভালো সম্বন্ধ সব ফিরিয়া গেল। ত্রিলোচনের মেয়েটাও কুরূপা। জুতা খটখটাইয়া কলেজে যায়। দেখিয়াছেন তিনি। খাঁদা নাক, কালো রঙ। নিকুঞ্জ পছন্দ করিবে কি? ট্যারা হইলেও অন্ধ তো নয়। তাহার মতটা আগে লওয়া যাক। আজকালকার ছেলে, কিছুই বলা যায় না। ভাবিবে হয়তো আমি ট্যারা বলিয়া একটা খাঁদা-বোঁচা ধরিয়া দিয়াছি। মা বাঁচিয়া থাকিলে কি…। বিপত্নীক বৃন্দাবন ঈষৎ বিচলিত হইলেন। পুত্রের প্রণয়-কাহিনী তিনি শোনেন নাই, কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল তাঁহার পক্ষে। সুতরাং একটু ইতস্তত করিয়াই পুত্রের নিকট কথাটা একদিন পাড়িলেন তিনি। উত্তরে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। আধুনিক উপমা দিতে হইলে বলিতে হয় যেন অ্যাটম বম পড়িল। বৃন্দাবন সাধারণ লোক হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেন, কিন্তু তিনি অসাধারণ ব্যক্তি। মাথা ঠিক রাখিতে পারিলেন। পুত্রকে "আচ্ছা" বলিয়া বিদায় দিয়া টাকে একবার হাত বুলাইলেন। বুঝিলেন এ বিবাহে মত দিতেই হইবে। দেখা যাক—ফাঁকতালে মোচড় দিয়া ব্যাটার কাছ হইতে যদি কিছু আদায় করিতে পারা যায়। হাজার হোক আমি ছেলের বাপ। দেখাই যাক।

ত্রিলোচন আসিতেই তিনি বলিলেন, "আসুন। অনেক কষ্টে ছেলেকে রাজী করেছি, কিছুতে রাজী হয় না, বলে কালো মেয়ে—হ্যা হ্যা—। যাক রাজী হয়েছে। কিন্তু…"

মোচড়টি দিলেন।

পাঁচ

নগদ তিন হাজার টাকা।

বিপদবারণ মধুসূদনকে খানিকক্ষণ স্মরণ করিয়া ত্রিলোচন বুঝিলেন সময় নাই

হইতেছে, ইহা অপেক্ষা রামতারণের শরণাপন্ন হইলে বেশী কাজ হইবে। রামতারণ হাজরা অল্প সুদে টাকা ধার দেন। লোকটি পরোপকারী। কিন্তু সেখানে গিয়াও ত্রিলোচনকে হতাশ হইতে হইল। রামতারণ অল্প সুদে টাকা ধার দেন বটে কিন্তু সকলকে দেন না। আদায় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলে মৃদু হাসিয়া বলেন—"দিতে পারলে খুবই সুখী হতাম, কিন্তু আমার হাতে এখন টাকা নেই—হেঁ হেঁ"—ত্রিলোচনকেও তাহাই বলিলেন। কন্যার পিতা ত্রিলোচন নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। কন্যাকে তিনি বৃন্দাবনের দাবির কথা কিছুই বলেন নাই। নিকুঞ্জবিহারীর আন্তরিক বার্তাও তিনি জানিতেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল কোনক্রমে বিবাহটা তাড়াতাড়ি হইয়া গেলে বাঁচেন তিনি। ভিতরে ব্যাপার যে কতদূর গড়াইয়াছে কে জানে। মেয়ে যখন এরূপ বদ্ধপরিকর তখন গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়। কলেজ যাইবার নাম করিয়া মেয়ে যে উচ্ছন্ন যাইতেছিল তাহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। উফ্! নানারূপ বিভীষিকা ত্রিলোচনের নয়ন হইতে নিদ্রা হরণ করিল। মেয়েকেও তিনি পণ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না—তাঁহার ভয় হইল যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে। টাকার চেষ্টায় ব্যাকুলচিত্তে তিনি নানাস্থানে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

…ঋণ কিন্তু কোথাও মিলিল না।

অবশেষে ত্রিলোচন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তাঁহাদের মনিব, মিস্টার মকরধ্বজ ভার্গবের কাছে গেলেন। নিরতিশয় কৃপণ বলিয়া লোকটার যদিও অখ্যাতি আছে, কিন্তু লোকটা বুদ্ধিমান। হয়তো কোনো বুদ্ধি বাতলাইতে পারে। ত্রিলোচন তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল ভার্গব হৃদয়বানও। ত্রিলোচনকে তিনি আশ্বাস দিলেন। ইংরেজি ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার মর্ম—তুমি ওইখানেই বিবাহ ঠিক কর, কেশিয়ার বাবুকে বল যে টাকা তিনি দাবি করিয়াছেন তাহা তিনি পাইবেন। কি করিয়া টাকাটা পাওয়া যাইবে নিম্নকণ্ঠে তাহার পরামর্শও তাহাকে দিলেন। ভার্গবের বিচক্ষণতায় ত্রিলোচনকে বিস্মিত ও হৃষ্ট হইতে হইল। কিছুক্ষণ পরে বৃন্দাবনও বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। ত্রিলোচন তিন হাজার দিতেই রাজী। একটু দরদস্তর বা কচলাকচলি করিল না। মত পরিবর্তন করিয়া এ আশাও বৃন্দাবন পোষণ

করিলেন যে হয়তো ত্রিলোচনের সহিত আত্মীয়তা করিয়া ভবিষ্যতে আনন্দও মিলিতে পারে।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

ছয়

……সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য দানসামগ্রীর সহিত পণের নোটগুলি একটি রুপার থালায় গুচ্ছ করিয়া বাঁধা আছে। বৃন্দাবন তখনও সেগুলি তুলিয়া রাখেন নাই।

বরকন্যা বাসরঘরে।

বরযাত্রী কন্যাযাত্রীদের আহার সমাপ্ত হইয়াছে।

বৃন্দাবন মাঝে মাঝে প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। সকলেই আসিয়াছেন কেবল ভার্গব এখনও আসেন নাই। এখনও আসিবার সময় আছে। ওই যে…

সহসা মকরধ্বজ ভার্গবকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল। অতিশয় গম্ভীর মুখ।

"আইয়ে আইয়ে—"

বিকশিত-দশন উচ্ছ্বসিত বৃন্দাবন আগাইয়া গেলেন।

ভার্গবের অধরে কিন্তু প্রত্যাশিত ভদ্রতাসূচক হাসিটি ফুটিল না। বরং ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ হইল।

বৃন্দাবন নিকটে যাইতেই তিনি ইংরেজি ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার বাংলা মর্ম এই—"আমি এইমাত্র খবর পাইলাম যে ব্যাঙ্ক হইতে তিন হাজার টাকার নোট চুরি গিয়াছে এবং তাহা নাকি আপনার বাড়িতেই আছে। আপনি পণস্বরূপ যে টাকাগুলি পাইয়াছেন সেগুলি কোথায়?"

"ওই যে—"

ভার্গব আগাইয়া গিয়া নোটের গোছা তুলিয়া লইলেন। "এই তো আমাদের ব্যাঙ্কেরই ছাপ মারা নোট!"

"ত্রিলোচনবাবু—"

বৃন্দাবন গর্জন করিতেই ত্রিলোচন আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন—"আমিই ব্যাঙ্ক থেকে আজ চুরি করে এনেছি ওগুলো।"

"কি করে?"

ভার্গব ইংরেজিতে পুনরায় বলিলেন—"তাহার বর্ণনা পরে শুনা যাইবে। টাকাগুলি যখন পাওয়া গিয়াছে তখন আর পুলিসে খবর দিব না, দিলে অনর্থক একটা হাঙ্গামা হইবে।"

বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আপনাকে হয়তো অ্যারেস্ট করবে।"

"আমাকে! কেন?"

"কারণ আপনি কেশিয়ার। যাক, টাকা যখন পাওয়া গেল তখন ওসব ফ্যাসাদের মধ্যে গিয়া লাভ কী।"

ভার্গব হাসিয়া নোটের তাড়া পকেটে পুরিলেন। তাহার পর ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দিস্ ইজ শেমফুল। আপনাকে ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। নট্ নাউ, টুমরো। চলুন এখন যাওয়া যাক—"

ত্রিলোচন সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন।

অনুবীক্ষণ

ডাক্তার বসু কিছু পুঁজ ও রক্ত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাই পরীক্ষ করিতেছিলাম। এমন সময় ডাক্তার বসু নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক।

"আমার রিপোর্ট দুটো কখন দেবেন?"

"বিকেল পাঁচটা ছটা নাগাদ।"

"ইনি আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাইছেন। তাই নিয়ে এলাম। আমি আর পরিচয় করিয়ে দেব না, নিজের পরিচয় ইনি নিজেই দেবেন। আমি চলি; আমার অনেক কাজ বাকি।"

প্রাকটিস্-তুরঙ্গারূঢ় ডাক্তার বসু চলিয়া গেলেন। আমি আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ঘুরিয়া বসিলাম। তাঁহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। প্রৌঢ়বয়স্ক বটে কিন্তু অনিন্দ্যকান্তি। আলাপ করিয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। এরকম পণ্ডিত লোক সচরাচর দেখা যায় না। সক্রেটিস হইতে শুরু করিয়া স্ট্যালিন পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কণ্ঠস্থ। ভারতবর্ষেরও বৈদিক যুগ হইতে গান্ধীযুগ পর্যন্ত নখদর্পণে। সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি সর্ববিষয়ে চৌকোস। নানাবিধ আলোচনার পর অবশেষে তিনি ব্রহ্মচর্য বিষয়ক আলোচনা শুরু করিলেন। বলিলেন—"দেখুন, অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি ব্রহ্মচর্য না হোলে কিছু হবার উপায় নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।"

"তাই নাকি?"

"নিশ্চয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে এবিষয়ে ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। যে অগাধ জলে সাঁতার কেটেছে সেই জানে অগাধ জলে সাঁতরাবার কি সুখ।"

সহসা ভদ্রলোকের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা হইল, কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন—এখানে তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। যেকয়দিন থাকেন এখানকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বেড়াইবেন।

"কারণ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করাও একটা মস্ত শিক্ষা, বুঝলেন না?"

আমি কাজ করিতে করিতেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, এখন উঠি। পরে আসব আবার।"

চলিয়া গেলেন। আমি কাজ করিতে লাগিলাম। একটু পরে শশধর পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শশধর আমাকে হতাশ করিয়াছিলেন। লোকটার কদর্য চেহারা; মাথায় টিকি, কপালে চন্দন, ত্রিসন্ধ্যা, সদা-সঙ্কুচিত-ভাব, ইংরাজি জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি হইতে আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে তাঁহার ঠোঁটের ঘায়ের কারণ—সিফিলিস। পরীক্ষা করিয়া কিন্তু অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি। রক্তে দোষ নাই। শশধর ফী দিয়া রিপোর্ট লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমার কাজ শেষ হইল। ল্যাবরেটরি বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছি, ডাক্তার বন্ধু পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

"আমার রিপোর্ট হল মশাই"

"হ্যাঁ, হয়ে গেছে! কিন্তু রোগীর নাম তো দিয়ে যান নি—তাই রিপোর্টটা লেখা হয় নি।"

"স্বয়ং রোগীকেই তো দিয়ে গেলাম তখন!"

"কে? ওই ভদ্রলোক! বলেন কি?"

"এতে আর বলার কি আছে! কি পেলেন?"

"সিফিলিস গনোরিয়া দুটোই পজিটিভ যে!"

"তাই তো প্রত্যাশা করেছিলাম। বিলিতি এডুকেশনের মজাই ওই! এম. এ. ডি. লিট—প্রচণ্ড বিদ্বান্!"

ডাক্তার বন্ধু মুচকি হাসিলেন।

গণেশ-জননী

আমি পশু চিকিৎসা করি। যে দেশে অসুস্থ মানুষেরই ভালো করিয়া চিকিৎসা হয় না সে দেশে পশু-চিকিৎসা করিয়া কি প্রকারে আমার জীবিকা-নির্বাহ হয় এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিতেছে তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি যে আমি সরকারী পশু-চিকিৎসা-বিভাগে চাকুরি করি। কমিশনার সাহেবের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিস সাহেবের গাভী প্রভৃতির স্বাস্থ্য-তদারক করিয়া এবং ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া 'পাস' করিয়া আমার অন্ন সংস্থান হয়। মনুষ্য-চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মতো নির্ভরযোগ্য 'প্রাকটিস' আমাদের নাই। এই পরাধীন দরিদ্র দেশে থাকিবার কথাও নয়। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা 'কল' জোটে। সেদিন একটি অপ্রত্যাশিত 'কল' জুটিল। একটি জরুরি তার পাইলাম—'আমার হস্তী অসুস্থ—অবিলম্বে চলিয়া আসুন।' উল্লসিত হইলাম। মোটা টাকা পাওয়া যাইবে। যেখানে যাইতে হইবে তাহা ট্রেনযোগে সাত-আট ঘণ্টার পথ। এতদূর যাইতে হইবে, হাতির অসুখ···খুব কম করিয়া ধরিলেও দুইশত টাকা 'ফি' পাওয়া যাইবে। ব্যাগ-প্যাটরা বাঁধিয়া সানন্দে বাহির হইয়া পড়িলাম। সামনেই পূজা···ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন।

···সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গন্তব্য স্থানে পৌছান গেল। মফস্বল জায়গা, ছোট গ্রাম। স্টেশনটিও ছোট। বেশী যাত্রী নাই। সেকেণ্ড ক্লাসে আমিই একমাত্র লোক। স্টাইল জাহির করিবার নিমিত্ত সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট করিয়াছিলাম। যিনি আমাকে স্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি আগাইয়া হাতল ঘুরাইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া সসম্ভ্রমে আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনিই কি ভেটেরেনারি সার্জন?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন, আসুন, আমি আপনাকেই নিতে এসেছি"

তাড়াতাড়ি আমার সুটকেসটা ভদ্রলোক তুলিয়া লইলেন। গোমস্তার মতো চেহারা। পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা, গায়েও মলিন জামা-কাপড়, একমুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোফদাড়ি, পাঁচ-সাত দিন কামানো হয় নাই। আমি

ভাবিলাম যে জমিদারের হাতি ইনি বোধহয় তাঁহারই কর্মচারী।...স্টেশন হইতে বাহির হইলাম। আশা করিতেছিলাম মোটর বা ওই-জাতীয় কিছু একটা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু দেখিলাম সে সব কিছু নাই। ভদ্রলোক সাইকেলে আসিয়াছিলেন। সাইকেলটি স্টেশনের বাহিরের দেওয়ালে ঠেসানো ছিল। তিনি আমার জন্য একটি ছ্যাকড়া গাড়ি ঠিক করিয়া দিয়া সাইকেল আরোহণ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে ছ্যাকড়া গাড়ি একটি বাড়ির সম্মুখে থামিল। গাড়ির জানলা হইতে মুখ বাড়াইলাম। স্বল্পালোকে যে বাড়িটি চোখে পড়িল তাহা কোনো বড়লোকের বাড়ি বলিয়া মনে হইল না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি। এ বাড়ির মালিকের হাতি পুষিবার কথা নয়। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিব কি না ভাবিতেছিলাম এমন সময় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। সাইকেলযোগে তিনি আগেই আসিয়াছিলেন। সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, "আসুন, আসুন, ডাক্তারবাবু আসুন—এই ঘরে—হ্যাঁ—"

তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম।

একটি চৌকি, দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, একটি নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি—ইহাই সে ঘরটির সাজসজ্জা। ভদ্রলোক আমার সুটকেসটি ঘরের এক কোণে নামাইয়া আমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন—"এক মিনিট বসুন, আমি একবার বাড়ির ভিতর থেকে আসি। দেখি, চা হল কি না।"

"আমার রুগী কোথায় ?"

"এইখানেই আছে। আমারই হাতি..."

ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটা রসিকতা করিতেছে না কি !

মিনিট খানেক পরেই তিনি হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"আগে চা-টা খেয়ে নিন, তারপর রুগী দেখবেন।"

"হয়েছে কী ?"

"বিশেষ কিছু নয়, খাওয়া বন্ধ করেছে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতির

খোরাক যোগাতে হচ্ছে না, কিন্তু গিন্নিও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি—" ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"হাতি পুষেছেন কি শখ করে ?"

প্রশ্নটা না করিয়া পারিলাম না।

"আরে না মশাই। জুটে গেসল, গরিব গেরস্ত মানুষ, হাতি পোষবার শখ হতে যাবে কেন"—

চায়ের খালি পেয়ালাটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম, "কি রকম ?"

"সে কি আজকের কথা! আমার কিছু ক্ষেত খামার আছে বুঝলেন, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি করে খেতে হয় না। বছর দশেক আগে একদিন অনেক রাত্রে মাঠ থেকে ফিরছি হঠাৎ নজরে পড়ল একটা লোক মুখ গুঁজড়ে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে, ঝুঁকে দেখলাম একেবারে অজ্ঞান। লোকজন ডেকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। সেবা-শুশ্রূষা করাতে তার জ্ঞান হল। পরিচয় হতে জানতে পারলাম সে একজন কচ্ছি। ব্যবসাদার। ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠামাঠি আসছিল, ঘোড়াটা তাকে ফেলে পালিয়েছে। পর দিনই তার লোকজন এসে পড়ল, ঘোড়াটিও পাওয়া গেল। আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল সে। কয়েকদিন পরে দেখি একটা লোক ছোট্ট একটি হাতির বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির—সেই কচ্ছি ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি হাতির ব্যবসা করেন। একটি চিঠিও লিখেছেন—আপনারা আমার প্রাণদান করেছেন, বিনিময়ে আপনাদের কি আর দিতে পারি, সামান্য উপহার পাঠালাম, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। হাতির বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার—তখন ছোট্ট ছিল—দুষ্টু দুষ্টু চোখ, ছোট্ট শুঁড়, খুব ভালো লাগল তখন। গিন্নি তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। বললে—ও আমার গণেশ এসেছে। বলেই একবাটি দুধ তার সামনে এগিয়ে দিলে! বাস সেই থেকেই গণেশ থেকে গেল। আমাদের ছেলেপিলেও হয় নি, ওই গণেশই আমাদের সব···"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। আমি সবিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার এইটুকু বাসায় ওকে রাখেন কোথা ?"

"উঠোনের দিকে জায়গা আছে অনেকখানি। তা ছাড়া সব বাড়িটাই তো ওর—দরজা দেখছেন না—সব কেটে কেটে বড় করতে হয়েছে যাতে ও যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারে—আমরাই সসঙ্কোচে একধারে বাস করি।"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"গণেশের পান থেকে চুন খসবার জো নেই, তাহলেই গিন্নি তুল্‌কালাম করবে। একশ বিঘে জমি আছে মশাই—যা কিছু হয় সব ওরই পেটে যায়—একটা হাতির খোরাক, বুঝছেন না? পুজোর সময় ওর সাজ করিয়ে দিতে হয়—এবার গিন্নি একটা রুপোর ঘণ্টা করিয়ে দিয়েছে……স্যাকরার ধার শোধ করতে পারি নি এখনও……"

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাতি পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।

"খুব পোষ মেনেছে?"

"পোষ মেনেছে মানে! গিন্নি যখন নাইতে যায়, বালতি-গামছা শুঁড়ে করে' নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নি যখন রাঁধে ও শুঁড়ে করে' পাখা ধরে হাওয়া করে।"

"রান্নাঘরে ও ঢুকতে পারে?"

"আর মশায় আমাদের ঘর কি আর মানুষের ঘর আছে; হাতির ঘর হয়ে গেছে। এই বাইরের ঘরটিই যা ছোট। এ ছাড়া আর দুটি ঘর আছে—একটি রান্না ভাঁড়ার আর একটি শোবার—দুটোই বিরাট 'হল'—মানে 'হল' করতে হয়েছে ওর জন্য…বাইরের ঘরের দরজাই দেখুন না…এই দিক দিয়ে উনি বেড়াতে বেরোন… কেটে বড় করতে হয়েছে…"

"আপনাদের সব কথা বোঝে?"

"সমস্ত। মানুষ একেবারে। মান—অভিমান পর্যন্ত করে। এই যে খাওয়া বন্ধ করেছে আমার বিশ্বাস সেটা অভিমানে।"

"কেন, কিছু হয়েছিল না কি?"

"বাগান থেকে দুশ ল্যাংড়া আম এসেছিল মশাই, মালী দিয়ে গিয়েছিল আমি বাড়ি ছিলাম না, গিন্নিও পাড়ায় কোথা বেরিয়েছিলেন, এসে দেখেন একটি আম নেই। সব গণশা খেয়েছে। তাই গিন্নি একটি চাপড় মেরে বলেছিলেন—রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ, একটি রাখতে পার নি আমাদের জন্যে। সেই যে

ফোঁস করে গুম মেরে বসেছে তারপর থেকে আর জলস্পর্শ করে নি। এরকম মাঝে মাঝে করে ও। একটু বকলে-ঝকলেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়···কিন্তু এরকম একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা খাওয়া বন্ধ আর কখনও করে নি···তা ছাড়া অতগুলো আম খেয়েছে তো—ভয় হয়ে গেছে আমাদের···"

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল।

"চলুন দেখি গিয়ে।"

ভিতরে গিয়া দেখি একটি বিরাট 'হলে' প্রকাণ্ড শতরঞ্চির উপর গণেশ গুম হইয়া বসিয়া আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তাহার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে খাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি 'বাথ টব' কি একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তূপ।

"খাও লক্ষ্মী তো—লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বালি করে এনেছি। চেখেই দেখ না একটু—"

গণেশ কুলার মতো কান দুটি নাড়িয়া ফোঁস করিয়া শব্দ করিল।

মহিলা আমার দিকে তাকাইয়া সজলকণ্ঠে বলিলেন, "ওর নিশ্চয় কোনো অসুখ করেছে—ওকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি।"

দেখিলাম। রোগের কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। গণেশ সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্যাপারটা অভিমানই।

ফিরিবার সময় কর্তা বলিলেন—"আপনার দক্ষিণা কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু···"

"অপরের কাছে হলে দুশ টাকা নিতাম কিন্তু আপনার কাছে কিছু নেব না।"

"না, না, তা কি হয়, এত কষ্ট করে এসেছেন"—

"না আমি নেব না—"

কিছুতেই লইতে রাজী হইলাম না। তখন তিনি বারান্দায় গিয়া দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়ে যাও।"

বুঝিলাম গণেশজননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার 'ফি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

অন্ধ

যাঁহাদের গায়ের চামড়া সাদা তাঁহাদের একটা প্রধান গুণ তাঁহারা ভারি পরোপকারী। পরের, বিশেষত কালা আদমীর, উপকার করিতে পারাটাই যেন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, পর্বত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কেবলই তাঁহারা পরোপকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

সদ্য-পাশ-করা ক্যাপটেন জোন্স আই. এম. এস. মহাশয়ও ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করিয়াই পরোপকারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'টুরে' বাহির হইয়া তাঁহার অধীন জনৈক নেটিব ডাক্তারের নিকট একদা নিজের মহৎ অভিপ্রায়টি ব্যক্তও করিলেন। অবশ্য ইংরেজিতে।

"দেখ, আমি ঠিক করিয়াছি বিনা পারিশ্রমিকে গরিবদের চোখের ছানি কাটিয়া দিব। তুমি রোগী যোগাড় করিয়া সদর হাসপাতালে পাঠাইয়া দিও।"

নেটিব ডাক্তারটি কালা আদমী। সুতরাং অকৃতজ্ঞ। সাহেবের এবম্বিধ উদারতায় গদগদ না হইয়া মনে মনে বাংলায় বলিলেন—"ব্যাটা হাত পাকাবার মতলবে আছে।"

মনের কথা কিন্তু মুখে বলিতে পারিলেন না। সাহেব মানুষ, তাহার উপর মনিব। সুতরাং ভুল ইংরেজিতে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই—"ও ইয়েস সার! এ তো খুব ভালো কথা। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার হাসপাতালে যে সব রোগী আসে তাহারা সাধারণতঃ বড় গরিব। ট্রেনের ভাড়া দিয়া যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ!"

সাহেব ইহাতে দমিলেন না, তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"বেশ তো, তেমন গরিব যদি হয় আমিই তাহার যাইবার খরচ বহন করিব। তুমি যত পার রোগী যোগাড় কর। ভাড়ার জন্য আটকাইবে না। এখান হইতে সদরে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইবার মাশুল আট আনা। রোগী-পিছু আট আনা আমিই দিয়া দিব। বল তো পাঁচটা টাকা তোমাকে অগ্রিম দিয়া যাইতেছি।"

ডাক্তারবাবু দেখিলেন ব্যাটা বদ্ধপরিকর।

বলিলেন—"না, না, টাকা অগ্রিম দিতে হইবে না। রোগী যোগাড় হইলে ভাড়ার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার এখানে তো চোখে-ছানি-পড়া রোগী আসে না। যদি আসে এবং যাইতে চায় আমি আপনাকে খবর দিব।"

"থ্যাঙ্কিয়্"

সাহেব চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবুও মনে মনে 'শ'কার 'ব'কার করিয়া যথারীতি দাদের মলম কুইনিন মিক্শ্চার প্রভৃতি পরিবেশনে মন দিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় পনর দিন কাটিল। ইহার মধ্যে ডাক্তারখানার কোনো 'ক্যাটারাক্ট' রোগী আসিল না। আসিলে হয়তো ডাক্তারবাবু চেষ্টা করিতেন। চাকরি করেন। মনিবের মনোরঞ্জনের সুযোগ পাইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। কিন্তু সুযোগ আসিল না। ক্রমশ তিনি সে কথা ভুলিয়া গেলেন। সাহেব কিন্তু ভোলেন নাই। তাহার প্রমাণ কয়েকদিন পরে পাওয়া গেল। একটি টাইপ-করা পত্র আসিয়া উপস্থিত।

প্রিয় ডাক্তারবাবু,

আশা করি ক্যাটারাক্ট বিষয়ক আমার প্রস্তাবটি আপনি ভুলিয়া যান নাই। ইতিমধ্যে কিন্তু আর একটি সুযোগ ঘটিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিস্টার সরকারকে আমি আমার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক থানার দারোগাকে জানাইয়াছেন যে প্রত্যেকের এলাকায় যত অন্ধ রোগী বা রোগিণী আছে তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আপনার নিকট চৌকিদার সহ যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আগামী রবিবার দিন বিভিন্ন এলাকা হইতে আপনার হাসপাতালে রোগী সমবেত হইবে। আমি সকালের ট্রেনে যাইব এবং অপারেশনের উপযুক্ত রোগী নির্বাচন করিয়া আসিব। তাহাদের আপনি যত্ন করিয়া বসাইয়া রাখিবেন এবং বলিবেন যে তাহাদের যাতায়াতের সমস্ত ভাড়া আমি দিব। তাহারা হাসপাতালে থাকিবে। কোনো খরচ লাগিবে না। যদি খুব গরিব হয় চশমাও কিনিয়া দিব। আশাকরি আপনি এ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি—

বশম্বদ
জে. জোন্‌স
ক্যাপটেন আই. এম. এস.

ডাক্তারবাবু আর একবার মনে মনে 'শ'কার 'ব'কার করিলেন। এ আবার এক ফ্যাসাদ জুটিল। একটি কথা মনে করিয়া তিনি একটু পুলকিতও হইলেন। নি-খরচায় কেবলমাত্র কলমবাজি করিয়া যদি সাহেবটাকে খুশী করিতে পারেন মন্দ কি। অনেক দিন হইতে সাধ একটা ভালো জায়গায় বদলি হইবার। সাহেব প্রসন্ন হইলে তাহা অচিরাৎ সম্ভব।

দুই

নির্দিষ্ট দিবসে হাসপাতালের সম্মুখস্থ ময়দানে বিভিন্ন থানা হইতে পুলিস কর্তৃক নীত হইয়া বহু চক্ষু-রোগী সমবেত হইল। বিরাট জনতা, সকলেরই চোখে যে ছানি পড়িয়াছে তাহা নয়, কিন্তু থানার দারোগারা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। পুলিস সাহেবের হুকুম—চোখের অসুখ থাকিলেই তাহাকে হাজির করিয়া দিবে—সিভিল সার্জন বাছিয়া লইবেন। তাঁহারা নিখুঁত-ভাবে হুকুম পালন করিয়াছেন। এত চক্ষু-রোগী দেখিয়া ডাক্তারবাবুরও চক্ষু স্থির হইয়া গেল। তিনি ইহাদের ভিতর হইতে ছানি-গ্রস্ত রোগীগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া একধারে জড়ো করিতে লাগিলেন। করিতে গিয়া দেখিলেন কেহই আলাদা একটা দল-ভুক্ত হইতে রাজী নয়। কেবল পুলিসের ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছে না। একটি বৃদ্ধ থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—"আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আমার ঘরে আমার বুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই, আমি চলে গেলে তাকে দেখবে কে? দোহাই ডাক্তারবাবু, আমাকে বাদ দিন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এতে ভয় পাবার কী আছে! সাহেব নিজের খরচে তোমাকে নিয়ে যাবেন, তোমার চোখ ভালো হয়ে গেলে আবার তুমি ফিরে আসবে।"

বৃদ্ধটি ডাক্তারবাবুর সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু তাহার ভয় ঘুচিল না। বেচারা দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

একটু পরেই ভয়ের কারণটা বোঝা গেল। তখন 'সারা-ব্রিজ' তৈয়ারি হইতে-ছিল। কে যেন রটাইয়া দিয়াছিল যে নর-কঙ্কাল দিয়া ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য গভর্নমেন্টের এই আয়োজন। কানাগুলাকে লইয়া সেইখানে পুঁতিবে। জীবন্ত পোঁতা যায় না—তাই চিকিৎসার ছুতায় হাসপাতালে লইয়া গিয়া আগে শেষ

করিবে—তাহার পর সারা-ব্রিজে চালান দিবে। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সুশাসন সত্ত্বেও এই অসম্ভব গুজবে কেহ অবিশ্বাস করে নাই। পুলিশ কর্তৃক রোগী সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তাহারা সত্যই ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের চোখের অসুখের জন্য পুলিসের এত মাথাব্যথা কেন? বিরাট জনতা ভয়ে থমথম করিতেছে। কখন কী হয়।

তিন

যথাসময়ে সাহেব আসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু যে কয়েকটি ক্যাটারাক্ট রোগীকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সাহেবকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। এত রোগী দেখিয়া সাহেব মহাখুশী। ডাক্তারবাবু ভিড়ের ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। আবক্ষ সাদা দাড়ি, পাকা ভুরু, দুই চোখেই ছানি পড়িয়াছে। একেবারে অন্ধ।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এই কেসটি আমার খুব ভালো বলিয়া মনে হইতেছে।"

"চোখের টেন্‌শন্ দেখিয়াছ?"

"আপনি দেখুন।"

বৃদ্ধ ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

"ডরো মাৎ, ডরো মাৎ, আচ্ছা হোগা।"

বৃদ্ধের কাঁপুনি থামে না।

সাহেব তখন তাহাকে চক্ষু বুজিতে বলিয়া চোখের উপরের পাতায় আঙুল দিয়া ঈষৎ চাপ দিলেন—উদ্দেশ্য 'টেন্‌শন্' দেখা। সামান্য চাপ—লাগিবার কথা নয়—বৃদ্ধ কিন্তু দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"আঁ—আঁ—আঁ—"

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অন্ধ, অর্ধ-অন্ধ, চক্ষুষ্মান যে যেদিকে পারিল দৌড়াইতে লাগিল। কেহ পড়িয়া গেল, কেহ হোঁচট খাইল, কাহারও মাথা ঠুকিয়া গেল, কেহ ভিড়ে আটকাইয়া গিয়া চীৎকার জুড়িল। নিমেষের মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সাহেব হকচকাইয়া ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন—"দেহাতী লোক, ভয় পাইয়াছে।" চৌকিদার লাঠি উঠাইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিতে গোলমাল আরও বাড়িল।

তারস্বরে অনেকে আর্তনাদ শুরু করিয়া দিল। সাহেব চতুর লোক। নিমেষের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিলেন বল-প্রদর্শন করিলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে।

ডাক্তারবাবুকে বলিলেন—"যাহারা চলিয়া যাইতে চায় তাহাদের বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। যে স্বেচ্ছায় যাইবে সে-ই চলুক। একজনও যদি যায় আপাতত তাই যথেষ্ট। তুমি এই লোকটিকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া বল।"

দাড়ি-ওলা বৃদ্ধ তখনও সাহেবের কবলে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

"ভয়টা তোমার কিসের? এস তুমি আমার সঙ্গে।"

ডাক্তারবাবু তাহাকে লইয়া হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাহেব ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া আরও দুই-একজনকে বাগাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করিলেন যে তাহা অসম্ভব। তিনি যেদিকে যান সেই দিকেই হাহাকার পড়ে, যে দিকে চান সেই দিক হইতে সকলে পলায়ন করে।

স্বেচ্ছায় কেহই যাইতে রাজী নয়।

চার

দাড়ি-ওলা বুড়াকে একটি নিভৃত ঘরে বসাইয়া ডাক্তারবাবু তাহাকে বুঝাইতেছিলেন।

"কিসের ভয়টা তোমার বল না।"

অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বৃদ্ধ অবশেষে কারণটা চুপিচুপি বিবৃত করিল।

"শুনছি না কি সারায় যে পুল হচ্ছে তাতেই আমাদের পুঁতবে।"

"পাগল না কি তুমি! তাহলে কি আমি তোমাকে পাঠাতে পারি?"

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। সত্যই তো, ডাক্তারবাবু যখন তাহাকে যাইতে বলিতেছেন তখন গুজবটা নিশ্চয়ই অমূলক। এই ডাক্তারবাবু তাহার ছেলেকে বাঁচাইয়াছেন, স্ত্রীকে বাঁচাইয়াছেন, তাহাকেও দুইবার যমের মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন। সব সময় 'ফিস্'ও লন নাই। ইনি জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে কখনও এমন বিপদে ফেলিবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের ইহাও মনে হইল—হয়তো ডাক্তারবাবু নিজেই জানেন না। সাহেব হয়তো ইঁহাকেও ধাপ্পা দিয়াছে। এ কথা কিন্তু সে প্রকাশ করিল না।

বলিল—"কোথায় পাঠাচ্ছেন আমাকে, আপনিই ওষুধ দিন। আপনার ওষুধেই আমার চোখ ভালো হয়ে যাবে। আপনার কাছে কি ওষুধ নেই?" ডাক্তারবাবু সোজাসুজি নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিতে পারিলেন না।

বলিলেন—"আমার কাছে যে ওষুধ আছে তাতে সারতে অনেক দেরি লাগবে। সাহেবের কাছে যাও, দুদিনেই সেরে যাবে। অত বড় ডাক্তার, নিজে এসে সাধছে, এমন সুযোগ আর পাবে না! চলে যাও। কত যত্ন করবে দেখো। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, খেতে দেবে, পরতে দেবে, চোখ সারিয়ে চশমা পর্যন্ত দিয়ে দেবে। যাও, চলে যাও।"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন—"একা যেতে সাহস না হয় তোমার ছেলেকে সঙ্গে নাও। ভয় কী, আমি যখন বলছি চলে যাও।"

অনেক বলা-কহার পর পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ যাইতে রাজী হইল।

পাঁচ

ডাক্তারবাবুর কথায় অন্ধ বৃদ্ধের সত্যই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সাহেব সত্যই তাহার হিতৈষী এবং আপনার লোক। তাহা না হইলে কি সঙ্গে করিয়া এমন করিয়া লইয়া যায়। ডাক্তারবাবু নিজে আসিয়া ট্রেনে চড়াইয়া দিয়া গেলেন। ট্রেন ছাড়িলে বৃদ্ধ তাহার পুত্রকে চুপিচুপি বলিল—"সাহেব কোথায়? তার সঙ্গে আলাপ কর না একটু। বল, সাহেব আমি ভালো হয়ে গেলে—ঘরের তৈরি গাওয়া ঘি, দই, মাছ—তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

চক্ষুষ্মান পুত্র বলিল—"সাহেব তো ফাসটো কেলাসে উঠল। এটা থাড় কেলাস।"

"ও, তাই না কি! তবে যে বললে—"

বৃদ্ধ ইতস্তত করিয়া চুপ করিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে গন্তব্য স্টেশনে নামিতে হইল। ভাগ্যে পুত্রটি সঙ্গে ছিল, তাহা না হইলে নামিতে গিয়া বেচারা হয়তো পড়িয়া যাইত। গাড়ি হইতে নামিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে বলিল—"ওরে সাহেব কোথা, দেখ ভিড়ে আমাদের খুঁজছে হয়তো—"

"এই বুড্‌ঢা, হামারা সাথ চলো।"

"তুমি কে ?"

"হাম সাহেব কা চাপরাশি।"

"সাহেব ডাকছে বুঝি ? ও—চল, চল।"

"সাহেব মোটর মে গিয়া। তুম হামারা সাথ পয়দল চলো—"

বৃদ্ধ বিমূঢ়ের মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"চল।"

হাসপাতাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ও তাহার পুত্র বিনিদ্রনয়নে একটি ঘরে পাশাপাশি জাগিয়া আছে। সামনে বারান্দা। জুতা খটখট করিয়া নার্সরা যাতায়াত করিতেছে। মাঝে মাঝে কাহাকে যেন ধমকাইতেছে। চতুর্দিকে কার্বলিক অ্যাসিড ও আয়োডোফর্মের গন্ধ। পাশের ঘর হইতে কাহার যেন অস্ফুট কাতরানি শোনা যাইতেছে।

আসিয়া পর্যন্ত সাহেবের সহিত বৃদ্ধের দেখা হয় নাই। অন্য আর একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া তাহার দাড়ি-গোঁফ এমন কি ভুরু পর্যন্ত কামাইয়া দিয়াছেন। চোখে কী একটা ঔষধ দিয়া চোখটা বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। চোখের ভিতরটা জ্বালা করিতেছে।

বারান্দায় পদশব্দ হইল।

বৃদ্ধ শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কী ?"

পুত্র চুপিচুপি উত্তর দিল—"আর একটা।"

"আর একটা মড়া ?"

"হ্যাঁ, এই নিয়ে তিনটে হল।"

সেদিন হাসপাতালে মৃত্যুসংখ্যা বেশী।

বারান্দার এক প্রান্ত হইতে সুরামত্ত একটা ডোম জড়িতকণ্ঠে বলিল—'সব শালা খতম্ হোগা আজ।"

খানিকক্ষণ কোনো শব্দ নাই।

"বাপ রে—বাপ রে—জান্ গিয়া—ওঃ ওঃ—"

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে যেন কোথায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

আবার চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

ভোর হইতেছিল।

ডাক্তারবাবুও বিনিদ্র নয়নে জাগিয়া ছিলেন। কল্পনা করিতেছিলেন যে সাহেব যদি খুশী হয় তাহা হইলে হয়তো তাঁহাকে মুরারিগঞ্জ ডিস্‌পেনসারিতে বদলী করিতে পারে। তাহা যদি করে তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই বেলারানীকে আনিতে পারিবেন। মুরারিগঞ্জে কোয়ার্টার্স আছে। নবোদ্ভিন্নযৌবনা বেলারানীর ঢলঢলে মুখখানি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই বুড়াটাকে বুঝাইয়া যখন পাঠাইতে পারা গিয়াছে তখন আরও দুই-চারিজনকেও হয়তো পারা যাইবে। তাহা হইলে হয়তো—

"ডাক্তারবাবু—"

আর্তকণ্ঠে বাহিরে কে যেন ডাকিয়া উঠিল।

"কে—"

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন।

প্রথমটা তিনি চিনিতেই পারিলেন না। বুড়ার চুল দাড়ি ভুরু কিছুই নাই।

বাহিরে আসিতেই বুড়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ভালো চিকিৎসার আমার দরকার নেই ডাক্তারবাবু। আপনার খারাপ ওষুধই আমাকে দিন আপনি। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন, বুড়ীকে বাঁচিয়েছেন, আপনার ওষুধেই আমার চোখ ভালো হবে—"

ডাক্তারবাবু বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কী করে এলে? এ সময় তো ট্রেন নেই—"

পুত্র উত্তর দিল—"হেঁটে এসেছি। বাবা কিছুতেই থাকতে চাইলেন না। একটু ফাঁক পেতেই পালিয়ে এলাম—"

"এঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে এলে?"

"না, বাবাকে আমি কাঁধে করে এনেছি।"

নিস্তারিণী

"ডাক্তারবাবু, একটু বিরক্ত করতে এলাম আপনাকে"—

"কি বলুন ?"

হৃষ্টপুষ্ট স্টেশন মাস্টার মহাশয় হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"যদি অভয় দেন তাহলেই বলি—"

"বলুন না।"

"সার্টিফিকেট দিতে হবে একখানা ?"

"কিসের সার্টিফিকেট ?"

"সিক্ সার্টিফিকেট।"

"কার অসুখ ?"

"আমার স্ত্রীর।"

"কী হয়েছে ?"

মাস্টার মহাশয় হাসিলেন। চর্বি স্ফীত গাল দুইটিতে টোল পড়িল।

"কিছুই হয় নি।"

"তবে ?"

"বদলির অর্ডার এসেছে। ঠেলেছে বেগমপুরে। ম্যালেরিয়ার ডিপো সেটি মশাই। খাসা আছি এখানে—সুন্দর জলহাওয়া, মাছ দুধ সস্তা। তাই স্ত্রীর অসুখের ছুতো করে একটা দরখাস্ত করব ভাবছি যে এখন যেতে পারব না। মাস দুই কোনো রকমে টালমাটাল করে কাটিয়ে দিতে পারলেই ফাঁড়াটা কেটে যাবে। মাস দুই পরে আমাদের চাটুজ্জে মশাই জয়েন করবেন। তখন আমার পোয়া-বারো! তিনি ছুটিতে গিয়েই মুশকিল হয়েছে কি না। তাঁর জায়গায় কাজ করছে গোখাদক এক ব্যাটা, কোন কথাই শুনবে না—"

"চাটুজ্জে মশাইটি কে ?"

"আমাদের হেড অফিসের বড়বাবু। আমার পেটোয়া লোক। তিনি এসে পড়লে আমার ভাবনা নেই।"

"আপনাদের রেলের ডাক্তারের কাছ থেকে নিন না সার্টিফিকেট।"

"তাই তো চিরকাল নিয়েছি মশাই। সম্প্রতি এমন এক ব্যাটা যুধিষ্ঠির এসে জুটেছে যে"—

মাস্টার মহাশয় বাক্যটি সম্পূর্ণ করিলেন না। চক্ষু পাকাইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। মাস্টার মশাই লোকটি ভালো। সেদিন আমার জন্য ট্রেন ডিটেন করিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে মাছ পাঠান। ইহাকে সাহায্য করিতে আমার আপত্তি নাই।

"আপনার স্ত্রীর কোন অসুখ নেই?"

"কিছু না। বাধকের ব্যথা একটা ছিল, আজকাল কিছু নেই। বরং মুটিয়েছে আরও।"

একটু বিব্রত হইলাম।

বলিলাম—"তাহা মিথ্যে কথা লিখি কি করে বলুন। লিখে না হয় দিলাম কিন্তু আপনার হেড আপিস যদি রেলের ডাক্তারের সার্টিফিকেট চায় আর তিনি এসে যদি দেখেন যে আপনার স্ত্রীর কিছু হয় নি, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখুন—"

"তা বটে। ব্যাটা যুধিষ্ঠির হয়েই মুশকিল হয়েছে কি না। তাহলে উপায় একটা বাতলান—কি করি"—

হাসিয়া বলিলাম, "বটতলার নিস্তারিণী দেবীর কাছে সিন্নি মানত করুন কিছু।"

"করি নি ভেবেছেন? মাসখানেক আগেই করেছি। কিন্তু কিছু হল না। আজ আবার চিঠি এসেছে। নিস্তারিণী ফেল করাতেই না আপনার কাছে এলাম।"

"আমি কিন্তু কি করি বলুন। লিখে দিতে আমার আপত্তি ছিল না কিন্তু সব দিক বাঁচিয়ে লিখতে হবে তো—"

মাস্টার মশাই ক্ষুণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে আবার তিনি আসিয়া হাজির।

"উপায় একটা হয়েছে ডাক্তারবাবু। নিস্তারিণী মুখ তুলে চাইলেন বোধ হয়।"

"কী?"

"দরখাস্ত করব ভাবছি স্ত্রী আমার আসন্নপ্রসবা, এ অবস্থায় তাকে নিয়ে ট্রেনে ট্রাভল করা বিপজ্জনক। আপনি সেই মর্মে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন।"

"স্ত্রী সত্যই আসন্নপ্রসবা না কি?"

"আরে না মশাই। কাল রাত্রে আমার এক শালী এসেছে। পেটের ভারে একেবারে নদপদ করছে। এখন-তখন। রেলের ডাক্তার যদি আসে তাকে স্ত্রী বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। কী বলেন—"

মাস্টার মশাই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সার্টিফিকেটখানা লিখিতেছি, এমন সময় মাস্টার মশায়ের বড় ছেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা, শিগগির চল। মাসীমার ছেলে হয়ে গেছে।"

"অ্যাঁ, বলিস কি ?"

"হ্যাঁ, ব্যাটাছেলে। শিগগির এস তুমি—"

"যাচ্ছি। যা তুই।"

ছেলেটা চলিয়া গেল।

মাস্টার মশাই বলিলেন, "নিস্তারিণীর কাণ্ডটা দেখছেন। প্রথমে পাঁচ পয়সার মেনেছিলাম—গা-ই করল না। পরশু দিন দুর্গা বলে পাঁচ সিকে কবলাতে শালীটা এল—ভাবলাম যাক টালটা সামলে দিলে বুঝি। আবার কাণ্ড দেখুন—" মাস্টার মশাই চলিয়া গেলেন।

দিন দুই পরে ভোরবেলায় মাস্টার মশাইয়ের চীৎকারে আবার ঘুম ভাঙিল।

"ডাক্তারবাবু—এবার মশাই নির্ঘাত—"

বাহিরে আসিতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আগস্ট ডিস্টারবেন্সের ঢেউ এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দু দিকের লাইনই সাফ। পুলটা পর্যন্ত ভেঙেছে। দুটি মাস এখন কোথাও নড়বার চড়বার উপায় নেই। তারপর আমার চাটুজ্জে মশাই এসে যাবেন—"

বলিলাম, "যাক নিশ্চিন্ত হলেন আপনি—"

"কিন্তু নিস্তারিণীর ব্যবহারটা শুনবেন ? উইল ইউ বিলীভ, নগদ পাঁচটি টাকা সিন্নি মানতে হয়েছে। এ যে দারোগার বেহদ্দ হয়ে উঠল একেবারে—ছি—ছি—"

অভিজ্ঞতা

তখন সরকারি চাকরি করি। একটি বড় শহরে সদর হাসপাতালের ভার লইয়া আছি, একদিন পাশাপাশি দুইটি কটেজে দুইটি রোগী ভর্তি হইল। রোগী লইয়াই কারবার, বিব্রত হইবার কথা নয়, কিন্তু এ দুজনকে লইয়া বেশ একটু বিব্রত হইলাম। বিব্রত হইবার প্রধান কারণ রোগীরা নয়, রোগীর পিতারা। একজন ডাক্তার, আমার খুঁত ধরিবার জন্য সর্বদা উদ্যত-মনোযোগ। আর একজনের পেশা কী তাহা তখনও জানিতাম না। লোকটি নিতান্ত গোবেচারী ভালোমানুষ গোছের। প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক শেষে গীতা-পাঠ করেন। বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়, মাথার চুল সব পাকা, কিন্তু আমি গেলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়ান এবং যে দুই-চারিটি প্রশ্ন করেন, সসঙ্কোচে করেন। অতিশয় ভদ্রলোক। ইহাকে লইয়া বিব্রত হইবার কারণ ইহার অতি-নির্ভরশীলতা। ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছেন। আমার সমস্ত নির্দেশ নীরবে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া যাইতেছেন, কোনোরূপ ব্যস্ততা নাই। অথচ রোগীটি তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং রোগটি টাইফয়েড। দুইটিই টাইফয়েড, ডাক্তারবাবুর পুত্রটির চিকিৎসা ডাক্তারবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়াই করিতেছিলাম, তবু কিন্তু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না। তিনি অতি-আধুনিক একখানি বিলাতী গ্রন্থ খুলিয়া তদনুসারে চলিতে চাহিতেছিলেন। মফস্বলের হাসপাতালে অত সব বন্দোবস্ত ছিল না। তিনি ক্রমাগতই আফসোস করিতেছিলেন, আহা কলিকাতায় লইয়া গেলেই হইত। কলিকাতায় না গিয়াও কিন্তু কলিকাতার প্রায় সমস্ত সরঞ্জাম তিনি ডাকযোগে, তারযোগে, রেলযোগে, লোকযোগে যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পত্রযোগে, কলিকাতার দুই-চারিজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের উপদেশও আসিয়া পড়িয়াছিল। কর্মিৎকর্মা ভদ্রলোক মফস্বলীয় ত্রুটি সংশোধনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই।

পাশের কটেজে বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। কোনো অশোভন আড়ম্বর নাই, কোনো অহেতুক ব্যগ্রতা নাই। একাই নীরবে নিপুণহস্তে সেবা করিয়া চলিয়াছেন। যাহা বলিতেছি বিনা মন্তব্যে নিখুঁতভাবে তাহাই করিতেছেন।

ডাক্তারবাবুটির অতি-বৈজ্ঞানিকতা এবং বৃদ্ধটির অতি-নির্ভরশীলতা দুইই আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

ডাক্তারবাবুটি আমার পূর্বপরিচিত, নিকটবর্তী একটি শহরে প্র্যাক্‌টিস করেন। তাঁহার ছেলেটি এখানে হস্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়ে। হস্টেলেই জ্বর হইয়াছিল। বাড়াবাড়ি হওয়াতে এবং অন্যত্র লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক মনে হওয়াতে আমারই পরামর্শে তাহাকে হাসপাতালে আনা হইয়াছে। ডাক্তারবাবুও সপরিবারে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দিনে অন্তত দশবার গিয়া রোগী দেখিতে হইতেছে। একটু টেম্পারেচার বাড়িলে, একটু বেশীক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিলে, একটু অস্থির হইলে, একটু কাশিলে ডাকের উপর ডাক আসিতেছে। প্রতিবারই যাইতেছি এবং প্রতিবারই তাঁহার আফসোস শুনিতেছি—আহা, সময়মতো যদি কলকাতা নিয়ে যেতাম। তাঁহার স্ত্রীর আফসোস আরও বেশী। নীলরতন সরকার নাকি তাঁহার সইয়ের মায়ের বকুলফুলের কী একটা হন।

বৃদ্ধটি এ অঞ্চলে আগন্তুক। ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই। প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম তাঁহার এই পুত্রটির চাকুরিব্যপদেশে তাহাকে লইয়া তিনি এখানে আসিয়া ধর্মশালায় উঠিয়াছিলেন। ছেলেটি সেখানেই জ্বরে পড়ে। জ্বর বাড়াবাড়ি হওয়াতে তাহাকে লইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন।

উভয়ক্ষেত্রেই টাইফয়েড তাহার অপ্রতিহত প্রতাপে এবং অনিবার্য গতিতে চলিতেছিল।

দুই

একদিন গভীর রাত্রিতে ডাক আসিল।

"শিগগির চলুন একবার, শিগগির।"

ডাক্তারবাবু আলুথালুবেশে নিজেই আসিয়াছেন।

"হেমারেজ শুরু হয়েছে। চলুন, শিগগির—"

প্রায় ছুটিয়াই গেলাম। হেমারেজ নিবারণের সর্বপ্রকার উপায় অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও এই কাণ্ড। দারুণ হেমারেজ।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিটামিন সি অ্যামপুল আর আছে আপনার? আমার তো আর নেই, কোলকাতা থেকে যে কটা এসেছিল সব ফুরিয়ে গেছে।"

আমার ছিল না। বলিলাম।

"কংগো রেড ?" (Congo Red)

"না।"

"এখানকার কোনোও দোকানে নেই। খোঁজ করে দেখেছিলাম আজ বিকেলে। ভারি ভুল হয়েছে, কোলকাতা থেকে আনিয়ে রাখলেই হত।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ,—এমন একটা ব্যাক্‌ওয়ার্ড জায়গা!"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "একটা মর্ফিন দিলে কেমন হয় ?"

"মর্ফিন দিয়েছি, ক্যালসিয়াম দিয়েছি, সিরাম দিয়েছি, স্ট্রিপটিসিন্ দিয়েছি, তারপর আপনার কাছে গেছি..."

আর কিছু করিবার ছিল না। আইসব্যাগ পেটের উপর রাখাই ছিল। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, "কংগো রেড কোথাও পাওয়া যাবে না এখানে? ডাক্তার ভাদুড়ি তো খুব আপ-টু-ডেট, তাঁর কাছে পাওয়া যাবে না ?"

"বলতে পারি না।"

"দেখি চেষ্টা করে।"

তিনি একটা মোটর বাইকও যোগাড় করিয়াছিলেন। একটু পরেই সেটা গর্জন করিয়া উঠিল। ফট-ফট-ফট শব্দে নিশীথ অন্ধকারকে সচকিত করিয়া কংগো রেডের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

...মৃত্যুকালে পুত্রের সহিত দেখা হইল না।

ছেলেটির মা মাথার শিয়রে বসিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া মৃত্যুপথ-যাত্রীর কর্ণে একটি আশ্বাসবাক্যও বর্ষিত হইল না! যতক্ষণ বসিয়া ছিলেন কেবল হাহাকার করিতেছিলেন।

"এমন বেঘোরে তোর প্রাণটা যাবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি রে বাবা..."

একটু পরেই যে চিরকালের মতো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহার কানের কাছে একটানা এই আর্তনাদ।

তাহার পরদিন যখন তাহারা চলিয়া গেল, আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিয়া গেল না। আমিই যেন অপরাধী।

তিন

দিন দুই পরে হাসপাতালের নার্স আসিয়া আমাকে জানাইল যে, কটেজ ওয়ার্ডের দ্বিতীয় টাইফয়েড রোগীটির অবস্থাও ভালো নয়। নাড়ি বৈকালের দিকে আরও খারাপ হইয়াছে—গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও। সকালে একবার দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সমস্ত দিন আর কোনো খবর পাই নাই। নার্সের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি গেলাম।

গিয়া দেখি ছেলেটির মা আসিয়াছেন। মাথার শিয়রে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধ তারস্বরে গীতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। ছেলেটির শ্বাস উঠিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিলেন, "আসুন, ডাক্তারবাবু, আপনি অনেক করেছেন, এইবার শেষকৃত্য করুন। আপনার পায়ের ধুলো ওর মাথায় দিন··· আশীর্বাদ করুন ওর সব যন্ত্রণার যেন অবসান হয় এইবার···সব গ্লানি যেন মুছে যায়···"

আমি অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"আসুন···"

আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "ইতস্তত করছেন কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পদধূলিই তো দরকার এ সময়ে। নিন···জুতো খুলুন···দিন···বেশ ভালো করে মাখিয়ে দিন ওর সমস্ত মাথায়···আসুন—"

তাহার পর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাঁদবার সময় অনেক পাবে। এখন নাম শোনাও। ছেলে যাচ্ছে, ওর পাথেয় দিয়ে দাও···"

এতদিন বহু মুমূর্ষু রোগীর গায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া বহুরকমে তাহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সেদিন কিন্তু আর সে প্রবৃত্তি হইল না। হঠাৎ যেন দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না। হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলাম।

পরদিন বৃদ্ধ হাসপাতালে এক হাজার টাকা দান করিয়া চলিয়া গেলেন। চেকটা ভাঙাইতে গিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন।

ভক্তি-ভাজন

বড়লোকের নেকনজরে পড়িবার জন্য অনেক লোক যেমন ব্যাকুল, অনেক বড় লোকও তেমনি বহু লোককে নিজের নেকনজরাধীন করিবার জন্য ব্যগ্র! কেবল ধন-সম্পত্তি লইয়াই ধনীর তৃপ্তি হয় না। যশ, প্রতিপত্তি, বিশেষত একটি ভক্তের দল না থাকিলে অতুল ঐশ্বর্যও লবণ-বিহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ ঠেকে। অন্যান্য বিবিধ বিলাস-উপকরণের মতো একদল অনুগ্রহধন্য নর-নারীও বড়লোকদের প্রয়োজন। কিন্তু মনোমত বিলাস-উপকরণ সব সময়ে জোটে না। বাড়ি, গাড়ি, এমন কি মনোমত ছড়িটাও সব সময় পয়সা ফেলিলেই পাওয়া যায় না। কৃপাক্রীত ভক্ত আরও দুর্লভ। শ্রীযুক্ত জনার্দন সরকার বহুদিন হইতেই সন্ধানে ছিলেন, কিছুতেই মিলিতেছিল না। জীবনে বহু রকম অনুগ্রহ তিনি বহু ব্যক্তিকে নিজে কিম্বা অন্যকে দিয়া করাইয়াছেন, কিন্তু কই, কেহই ত আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকে নাই। সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে। মানে, দুনিয়াটাই বেইমান। এবম্বিধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সত্ত্বেও জনার্দন সন্ধানে ছিলেন। কিছুই বলা যায় না, দৈবাৎ কত রত্নই তো মিলিয়া যায়। যোগেন বসাক সেদিন আসল মুক্তাই একটা কুড়াইয়া পাইল। নীলাম্বর পোদ্দারের কল্যাণে জনার্দনের আধিভৌতিক কোনো অভাবই নাই। জমিজমা, গাড়ি-বাড়ি, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সমস্ত হইয়াছে। ওই একটি শখই অপূর্ণ আছে এখনও। শ্রদ্ধাগদগদ ভক্ত একটি চাই। না পাইলে জীবনই বিফল। কেউ পোঁছে না! বাঁচিয়া লাভ কি? জনার্দন সন্ধানে ছিলেন।...দৈবাৎ রামধনের নাগাল পাইয়া তিনি পুলকিত হইলেন। ডুমুরহাটিতে কষ্ট করিয়া আসা সার্থক মনে হইল। ডুমুরহাটিতে জনার্দনের পূর্ব-পুরুষের ভিটা ছিল। শৈশবে একবার মাত্র সেখানে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার সেখানে যাইবার প্রয়োজন এ যাবৎ ঘটে নাই। পূর্ব-পুরুষদের আবাস ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে স্বরাজ স্থাপন করিয়াছিল ঘেঁটু কচু প্রভৃতি আদিবাসিগণ। সব শুনিয়াও জনার্দন জ্রক্ষেপ করেন নাই। করিতে হইল, যখন তাঁহার জ্ঞাতিরা ঘেঁটু-কচু উচ্ছেদ করিয়া ইষ্টকস্তূপ সরাইয়া সেখানে বসবাসের

আয়োজন করিল। পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা বেদখল হইবে, এ অন্যায় জনার্দন বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি দুইটা চেঞ্জ এবং পাঁচ ক্রোশ গোরুর গাড়ির ধকল সহ্য করিয়া ডুমুরহাটিতে গিয়া হাজির হইলেন। নানাবিধ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রামধনকে পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জ্ঞাতিরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেও মোকর্দমা-অভিজ্ঞ জনার্দন শত্রুর আতিথ্য গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিলেন না। অথচ অজ পাড়াগাঁ জায়গা, হোটেল জাতীয় কোন কিছুই নাই। মাথা গোঁজা যায় কোথায়, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাই বা হয় কিরূপে। জনার্দন বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। কোথায় ওঠা যায়। স্টেশনটাও কাছে নয়। সহসা তাঁহার পিতৃগুরু ন্যায়রত্নের কথা মনে পড়িয়া গেল। ন্যায়রত্নকে তিনি বাল্যকালে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই একবার দেখাতেই তাঁহার মনে যে চিত্রটি আঁকা হইয়া গিয়াছিল, তাহা আজও মোছে নাই। অধ্যাপক রামভূষণ ন্যায়রত্নের তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণ, প্রশস্ত উন্নত ললাট, প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, শুচিসৌম্য মুখচ্ছবি বালক জনার্দনের চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এত কাল পরে প্রৌঢ় জনার্দনের চিত্তকেও আশ্বস্ত করিল। তাঁহার সহসা মনে হইল যে, গ্রামের মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সন্ধান করিতে গিয়া রামধনের দেখা মিলিল। ন্যায়রত্ন বহুদিন পূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রামশরণও নাই। বস্তুত ন্যায়রত্ন-পরিবারে এক রামধন ব্যতীত আর সকলেই গতায়ু হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রাম প্রায় উজাড় করিয়াছে।

রামধনেরও দুরবস্থা। শরীর শীর্ণ। পরিধানে ছিন্ন বসন। মলিন উপবীতগুচ্ছ এবং একটি সরু টিকি ছাড়া ব্রাহ্মণত্বের আর কোনো চিহ্ন তাহার মধ্যে নাই। অধ্যাপক রামভূষণ ন্যায়রত্নের পৌত্র—নিরক্ষর। সামান্য লেখাপড়া শিখিবার সুযোগও গ্রামে নাই। জমিদার ব্রহ্মোত্তরটুকু গ্রাস করিয়াছেন। বিঘা দুই মাত্র জমি অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই রামধনের গ্রাসাচ্ছাদন কোনোরূপে চলে। কুঁড়েঘরটি জীর্ণ। একটি বুড়ি গাই আছে। রামধন তাহারই সেবা করে। জনার্দন যখন গেলেন, রামধন তখন উঠানে বসিয়া খড় কাটিতেছিল। জনার্দনের আকস্মিক আবির্ভাবে সে বিস্মিত হইল। পরিচয় শুনিয়াও তাহার বিস্ময় ঘুচিল না। জনার্দনের নামই

সে কখনও শোনে নাই। জনার্দন তাহার ভগ্নকুটীরে আতিথ্যগ্রহণ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সসম্রমে বলিল—বেশ তো, আসুন।

কাঁঠাল-কাঠের পিড়েখানি তাড়াতাড়ি ঘরের দাওয়ায় পাতিয়া দিল।

দুই

জনার্দন ডুমুরহাটিতে দিন দুই ছিলেন।

এই দুই দিনে শুধু ভিটা-উদ্ধার নয়, রামধনকেও তিনি আবিষ্কার করিয়া গেলেন। এতদিন যে সন্ধানে তিনি ছিলেন রামধনের মধ্যে তাহার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি যখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া আসিলেন—"দেখি তোমার কী করতে পারি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র তুমি, তোমার জন্য যথাসাধ্য আমি করব"—তখন তাহার সরল চোখ দুটিতে যে আশাদীপ্ত উৎসুক দৃষ্টি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতে নিজেও তিনি কম আশ্বস্ত হন নাই। এতদিনের আকাঙ্ক্ষা এইবার পূর্ণ হইবে হয়তো। প্রভু নীলাম্বর পোদ্দার তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আর বাকি সকলে করে ঈর্ষা। পা-চাটা, খোশামুদে, সুদখোর, বেহায়া…কত কি কথা। লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। এতকাল এইভাবেই চলিয়াছে। এইবার হয়তো ভগবান জনার্দনের জীবনেও একটি ভক্ত জুটাইয়া দিলেন। বেশী নয়, শ-পাঁচেক টাকা খরচ করিলেই রামধনের হৃদয় জয় করা যায়। রামধনের শেষ সম্বল যে দুই বিঘা জমি, তাহাও পিতৃঋণে আবদ্ধ। এই বছরে শোধ না করিলে চৈতন্য চাকলাদার ওটুকু নিঃসন্দেহে গ্রাস করিবে। দলিল তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। পাঁচ শত টাকা দিলে জমিটা উদ্ধার হয়। পাঁচ শত টাকা তিনি যে না দিতে পারেন তাহা নয় কিন্তু হঠকারী লোক তিনি নন। ফট করিয়া কিছু একটা করিয়া বসা তাঁহার স্বভাব নয়। রহিয়া বুঝিয়া মাথা ঘামাইয়া কাজ করিতেই তিনি অভ্যস্ত। করকরে পাঁচ শ টাকা, সোজা তো নয়। জনার্দন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ছিলেন, এমন সময় ভগবান আবার দয়া করিলেন। দয়াময়ের দয়ার আর শেষ নাই, জনার্দনের মনে হইল। নীলাম্বরের বৃদ্ধা জননী মাথার শির ছিঁড়িয়া হঠাৎ মারা গেলেন। সুরাহা হইয়া গেল।

নীলাম্বর পোদ্দার নামজাদা লোক। ব্যবসায়ী মহলে তাঁহার যথেষ্ট খাতির। গভর্নমেণ্টের ঘরেও তদ্বির চলিতেছে, এবার অনেক টাকার 'ওয়ার বণ্ড' কিনিয়াছেন, শীঘ্রই রায়বাহাদুর হইবেন। কত লক্ষ টাকা যে তাঁহার আছে তাহা অনুমান করিয়া লোকে কূল পায় না। প্রিয় বয়স্য এবং ম্যানেজার জনার্দনের সহিত পরামর্শ করিয়া মহাসমারোহে তিনি মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মানীর মান রক্ষা যেন হয় এ ছাড়া জনার্দনেরও আর অন্য চিন্তা রহিল না। বিরাট আয়োজন। সমস্তভার জনার্দনের উপর। বহু লোক খাইবে, বহু রাঁধুনী চাই। জনার্দন লোক পাঠাইয়া দেশ হইতে রামধনকে আনাইয়া ফেলিলেন।

দরিদ্র রামধন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। এই ধুমধামের ব্যাপারে জনার্দনবাবু লোক পাঠাইয়া তাহাকে কেন আনাইয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। জনার্দন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—"রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধতে লেগে যাও। ডেলি পাঁচ টাকা করে পাইয়ে দেব তোমাকে।" রামধন অবাক হইয়া গেল। তাহাকে রাঁধুনী হিসাবে ডাকা হইয়াছে! মর্মাহত হইলেও চুপ করিয়া রহিল। সত্যই তো, রাঁধুনী হওয়া ছাড়া তাহার আর কি যোগ্যতা আছে। নিরক্ষর সে। তবু একটু আমতা-আমতা করিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল "আমি এর আগে কখনও রাঁধুনীগিরি করি নি। আমি কি পারব—"

জনার্দন ধমকাইয়া উঠিলেন—"খুব পারবে, খুব পারবে," পরমুহূর্তেই মুচকি হাসিয়া কোমলকণ্ঠে বলিলেন—"না পারবার কি আছে ওতে। এক্সপার্ট রাঁধুনী অনেক আসছে কোলকাতা থেকে। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। খুনতি-টুনতি নাড়গে যাও একটু বসে। রান্নাঘরে থাকা নিয়ে কথা। যাও—"

রামধন আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন করিয়া জনার্দন সসঙ্কোচে নীলাম্বরকে আর-একটি পরামর্শ দিলেন। এতই যখন করা হইয়াছে তখন আর একটু না করিলে অঙ্গহানি হইবে। এই উক্তি নীলাম্বরের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিল।

"বল না, আর কি করতে হবে?"

জনার্দন মনোভাব বিবৃত করিলেন। খাটবিছানা আসন বাসন গাই-বাছুর এ রকম দান রামাশ্যামা সকলেই করে! নীলাম্বরকে রামাশ্যামার সহিত এক পর্যায়ভুক্ত

করিতে জনার্দন কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন। তাঁহার মনে হয়, লক্ষপতি নীলাম্বরের যেরূপ খ্যাতি, তাহাতে মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার হাতি দান করা উচিত।

…কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া নীলাম্বর মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বেশ, হস্তীদানই তিনি করিবেন।

হাতি কেনা হইল।

নীলাম্বর হাসিয়া তখন জনার্দনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একটি সদ্‌ব্রাহ্মণ যোগাড় কর। ওই পেশাদার ব্যাটাদের দেব না আমি…"

নীলাম্বরের স্বতঃপ্রবৃত্ত এই উক্তিতে জনার্দনের সুবিধাই হইল। যে জন্য এত কাণ্ড, সেই কথাটি পাড়িবার সুযোগ পাইলেন। সত্যই দয়াময় ভগবানের দয়ার আর সত্যই শেষ নাই।

একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি নিজে থেকেই যখন কথাটা পাড়লেন, তখন একটি নাম আমি করতে পারি! যদি অভয় দেন বলি।" প্রিয়বয়স্ক জনার্দনের কথা নীলাম্বর প্রায়ই অগ্রাহ্য করেন না।

"বল না—"

জনার্দন স্মিতমুখে ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

"বলেই ফেল না—"

"ছেলেটি আমার নিজের গাঁয়ের লোক কি না, তাই মনে হচ্ছে—না থাক—এমনিতেই তো পাঁচ জন পাঁচ কথা বলে—"

নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইলেন।

"পাঁচ জনের কথায় কান দিয়ে কাজ কি? তোমার কথাটাই বল না শুনি—"

নীলাম্বর না শুনিয়া ছাড়িলেন না।

জনার্দনকে রামধনের পরিচয় দিতে হইল। পিতামহের গুণ-গরিমা, বংশের বিশুদ্ধ কৌলীন্য, তাহার বর্তমান দারিদ্র্য প্রভৃতির সুনিপুণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে জনার্দন বলিলেন,—"এ বেচারীকে যদি দেন, একটা সদ্‌ব্রাহ্মণের বংশ রক্ষা পায়। সব যেতে বসেছে। ভিটেটা পর্যন্ত—"

নীলাম্বর বলিলেন—"দিতে আর বাধা কি। দেবার জন্যেই তো কেনা হয়েছে। কিন্তু হাতি নিয়ে ও সামলাতে পারবে কি, যা অবস্থা বলছ—"

"হাতি বেচতে হবে ওকে। সে-ও এক ঝঞ্ঝাট বটে। খরিদ্দার যোগাড় করা কম হাঙ্গামা নয়। যত দিন যোগাড় না হয় তত দিন হাতির খোরাক জোটাতে হবে। হুজুর যা বলেছেন তা ঠিক, ওর পক্ষে সামলানো কঠিন—"

নীলাম্বরের কথার পিঠে এ ধরনের কথা না বলিয়া উপায় ছিল না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াও জনার্দন মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। কি জানি মোড় কোন্ দিকে ফিরিয়া যায়। কিন্তু দেখিলেন ছোঁড়ার অদৃষ্ট ভালো এবং দয়াময় ভগবানের সত্যই দয়ার শেষ নাই।

নীলাম্বরের বন্ধু জমিদার মুকুন্দ সিং পাশেই বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাকে যদি বেচে আমিই কিনতে পারি। আমাদের মাতঙ্গীটা বুড়ী হয়ে গেছে। আমাকে একটা হাতি কিনতেই হবে। সস্তায় দেয় যদি এটাকেই কিনতে পারি।

জনার্দন উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

"সস্তায় দেবে বই কি। আপনি পাঁচ শ টাকা দিন। ওর দাম হাজার টাকা। কালই কিনেছি আমরা। পাঁচ শ টাকা পেলেই বর্তে যাবে ও।"

গড়গড়ায় মৃদু টান দিয়া নীলাম্বর বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে অতটা ফাঁকি দিও না মুকুন্দ। সাড়ে সাত শ দাও তুমি। ঠকবে না, হাতিটা ভালো।"

মুকুন্দ রাজী হইয়া গেলেন।

জনার্দনের কল্পনা-নেত্রে কৃতজ্ঞতা-সিক্ত ভক্ত রামধনের বিহ্বল মুখচ্ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। সাপও মরিল, লাঠিও ভাঙিল না। যাক…এতদিনে বুঝি……।

তিন

"মানে?"

জনার্দন সরকারের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

কাঁচুমাচু রামধন আনতনয়নে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

"সোনারবেনের দান আমি নিতে পারব না সরকার মশাই, আমাকে মাপ করবেন। আমি গরিব, আমি মুখ্যু, সবই ঠিক কিন্তু বংশের নাম আমি ডুবিয়ে দিতে পারব না! আমাদের বংশে কেউ কখনও শূদ্রের দান নেয় নি"…

তাহার ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল।

কশাই

শালা হারামিকা বাচ্চা···

একটু চটলেই এই তার বুলি, কখনও স্বগত কখনও প্রকাশ্যত। ছোট নিষ্ঠুর চোখ দুটো, মুখময় ছোট বড় কতকগুলো আঁচিল, একটা ছোট আবও আছে ডান দিকের চোয়ালটার নীচে। ভ্রূ নেই বললেই হয়। দাড়ি আছে। কটা, কোঁকড়ানো, অবিন্যস্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা ওলের উপর কটা চুল গজিয়েছে কতকগুলো। তাকে কেউ বোঝে না, সে-ও কাউকে বুঝতে চায় না। তাই উদীয়মান কমিউনিস্ট লেখক কমরেড দুলাল দত্ত যখন গল্প লেখার রসদ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তার বাড়ি গিয়ে জিন্না-গান্ধী-সম্পর্কিত আলোচনা ক'রে মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং পাকিস্তান যে কতদূর ন্যায়সঙ্গত তা বিচার ক'রে তার প্রকৃত-মনোভাব জানবার চেষ্টা করছিল তখন যদিও সে তার হলদে শ্বা-দন্ত দুটো বার ক'রে "হাঁ বাবু, হাঁ বাবু" ব'লে সায় দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মনে মনে সে আওড়াচ্ছিল—"শালা হারামিকা বাচ্চা—"

সে জানে কপালে যে লেবেল সেঁটেই আসুক না কেন ফরসা কাপড়-জামা-পরা বাবু মাত্রেই শালা হারামিকা বাচ্চা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা হারামিকা বাচ্চাও সে অনেক দেখেছে কিন্তু তারা এমন স্বার্থপর ছদ্মবেশী নয়। এই 'বাবু'রাই "আসলি হারামজাদ্—"

কোট-প্যান্টপরা, আচকান-চাপকান-চড়ানো, খদ্দরধারী, মোল্লা-মৌলভী, ডাক্তার-উকিল, হাকিম-ডেপুটি অনেক দেখেছে রহিম কশাই। তার চক্ষে সব শালাই হারামিকা বাচ্চা। সব শালা···

বিশেষত ওই দুলালবাবুর বাপটা। শালা সুদখোর। চতুর্থপক্ষে বিয়ে করেছে হারামজাদা। তাগদের জন্যে কচি পাঁঠার ঝোল খায় রোজ। ছেলেও হয়েছে একটা। নধরকান্তি শিশুটা পাশের গলিতে এসে খেলা করে যখন রহিম কশাই চেয়ে চেয়ে দেখে মাঝে মাঝে। জোঁকের বাচ্চা! বড় হয়ে রক্ত চুষবে। দুলালবাবু আবার দরদ দেখাতে এসেছেন আমাদের জন্যে—উড়নি উড়িয়ে পাম্প-শু চড়িয়ে··· শালা হারামিকা বাচ্চা···!

ঘোলাটে চোখদুটোতে হিংস্রদীপ্তি ফুটে ওঠে। নড়ে ওঠে কটা কোঁকড়ানো দাড়িগুলো। ভারী ধারালো ছোরাটা চালাতে থাকে সে সজোরে···প্রকাণ্ড খাসির রাং টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

পুরোহিত যেমন নির্বিকারচিত্তে ফুল তোলে, লেখক যেমন অসঙ্কোচে সাদা কাগজে কালীর আঁচড় টানে, রাঁধুনী অবিচলিতচিত্তে যেমন জীবন্ত কই মাছগুলো ভাজে ফুটন্ত তেলে, রহিমও তেমনি ছাগল কুচো করে অকুণ্ঠিত দক্ষতা সহকারে। একটুও বিচলিত হয় না।

একটা খাসি, একটা পাঁঠা, গোটা দুই বক্‌রী প্রত্যহ জবাই করে সে। আধ সের পাঁঠার মাংস দুলালবাবুর বাপকে দিতে হয়। সুদস্বরূপ। কবে পাঁচশ টাকা ধার নিয়েছিল তা আর শোধই হচ্ছে না। ভিটেমাটি সব বাঁধা আছে। সুদের সুদ তার সুদ···হিসাবের মার-প্যাঁচে বিভ্রান্ত হয়ে শেষে এই সোজা হিসাবে রাজী হয়েছে সে। রোজ আধসের কচিপাঁঠার মাংস। চতুর্থপক্ষের অনুরোধে শালাও রাজী হয়েছে।

কিন্তু এ-ও আর পেরে উঠছে না রহিম। এই দুর্মূল্যের বাজারে রোজ কচি-পাঁঠা জোটানো কি সোজা কথা! এ অঞ্চলের যত কচি-পাঁঠা ছিল সব তো ওই শালার পেটে গেল। রোজ কচি-পাঁঠা পায় কোথা সে। অথচ শালাকে চটানো মুশকিল। এক নম্বর হারামি। হেলথ অফিসারটা পর্যন্ত ওর হাত-ধরা···ওর কথায় ওঠে বসে। একটু ইঙ্গিত পেলেই সর্বনাশ করে দেবে।···সেদিন সমস্ত দিন রোদে ঘুরে ঘুরে রহিম হতাশ হয়ে পড়ল। একটু ভয়ও হল তার। কচি-পাঁঠা কোথাও পাওয়া গেল না। কী হবে কে জানে!

হঠাৎ মাথায় খুন চড়ে গেল তার। চতুর্থপক্ষে বিয়ে করেছে শালা! কচি-পাঁঠার ঝোল খাবে রোজ। হারামির বাচ্চা।

চিবুকের কটা দাড়িগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল!

তারপরদিন বাবুর বাবুর্চি বললে এসে—"কাল তুই যে মাংস দিয়েছিলি একেবারে ফাস্‌ট কেলাস। খেয়ে বাবুর দিল তর হয়ে গেছে। চেটেপুটে খেয়েছে সব···"

রহিম নীরব।

কেবল দাড়ির গোটা কয়েক চুল নড়ে উঠল। বাবুর্চি বলতে লাগল—"খোকাটাকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই বাবুর মনে সুখ নেই, তা না হলে তোকে ডেকে বকশিশই দিত হয়তো। পাশের গলিতে খেলছিল—কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবু বলেছে, যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে পঁচিশ টাকা বকশিশ দেবে। একটু খোঁজ করিস, বুঝলি···কিরে কথা কইচিস না কেন···"

রহিম পচ্ করে একবার থুতু ফেলে নীরবে মাংস কুচোতে লাগল। তার চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছিল!

হার

সেদিন অষ্টম দিবস। মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ হরিহর সেন বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজটা উল্‌টাইতেছিলেন। এ কয়দিন ধরিয়া একটিমাত্র খবরই অবশ্য তাঁহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। সে খবরটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় নাই যদিও কিন্তু তাহার গুরুত্ব হরিহর সেনের নিকট মলটভের রাজনৈতিক উক্তি অপেক্ষা অধিকতর চাঞ্চল্যকর। স্ত্রী রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। বাপের বাড়ি অবশ্য কলিকাতাতেই, মোটরে মিনিট পনের-কুড়ির পথ। স্ত্রীর পিত্রালয়ের দূরত্ব অধিক না হইলেও স্ত্রীর মনের সহিত নিজের মনের দূরত্ব কত অধিক তাহা আবিষ্কার করিয়া ডাঃ হরিহর সেন প্রথমে যুগপৎ রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়া পরে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। অপুত্রক হরিহর সেনের স্ত্রীই সব। বিশেষত আজকাল। ওই মহিলাটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সংসার। রিটায়ার করিয়া কলিকাতায় বাড়ি কিনিয়াছেন স্ত্রীরই অনুরোধে। কলিকাতা শহরে স্ত্রী এবং স্ত্রীর পরিজনবর্গ ছাড়া আর কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয়ও নাই। যখন চাকুরি করিতেন তখন চাকুরি এবং রোগী লইয়া অধিকাংশ সময় কাটিত। এখন চাকুরি নাই, রোগীও নাই, আছে ব্যাঙ্কের টাকা এবং স্ত্রী। অথচ বিধাতার এমনই পরিহাস, এই অপরিহার্য ব্যক্তিটির সহিত মনের কিছুতেই মিল হয় না। ভয়ানক জেদী।

কলহের কারণ গহনা। লক্ষপতি হরিহর সেন যে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া স্ত্রীকে একটা হার কিনিয়া দিতে পারেন না তাহা নয়, কিন্তু 'অন্ প্রিন্সিপল' তিনি দিবেন না। অনেক দিয়াছেন, আর নয়। এই বয়সে এ কি কাণ্ড! এখন গলায় হার ঝুলাইয়া পুঁটুরানী কাহাকে মুগ্ধ করিতে চায়। তিনি তো এমনিতেই মুগ্ধ, হারের প্রয়োজন কি। ডাঃ সেন আদর্শবাদী লোক। তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছেন ভগবান যখন তাঁহাকে কোনও সন্তানাদি দিলেন না তখন তাঁহার সঞ্চিত অর্থ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া যাইবেন। এই আদর্শে প্রণোদিত হইয়া তিনি এখনও যথাসাধ্য ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া চলেন।

কিন্তু পুঁটুরানীর আদর্শ অন্যরূপ। যে সমাজে তিনি বিচরণ করেন, সে সমাজে তিনি লক্ষপতি ডাক্তার-গৃহিণীর মর্যাদা লইয়াই বিচরণ করিতে চান। তাঁহার স্বামী

একজন গণ্যমান্য লোক, রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন, তাঁহার কি ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া বেড়ানো সাজে? পরিবেনই বা কেন? কোন্ দুঃখে? বিবাহ-বাড়িতে, সিনেমার আসরে সকলে যখন গহনা-কাপড়ে ঝলমল করে তখন তিনি সেখানে সাদাসিধা পোশাকে মুখটি চুন করিয়া বসিয়া থাকিবেন? কেন? কিসের অভাব তাঁহার? কস্তুরবা গান্ধীর আদর্শ দেখাইয়াও হরিহর সেন তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। পুঁটুরানী বলিয়াছেন—"আগে তুমি মহাত্মা গান্ধী হও, তাঁর মতন জগৎ-জোড়া নাম কেন, তারপর আমি কস্তুরবা গান্ধী হব, তার আগে নয়···।" মোট কথা, পুঁটুরানী দমিবার লোক নন। তিনি যেখানে যাইবেন সেখানটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, দশ জনে চাহিয়া দেখিবে, এই তিনি চান। তাঁহার চেহারাখানাও অবশ্য দেখিবার মতো, যদিও বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। সাজিলে সত্যই এখনও রাজরানীর মতো দেখায়। রুচিও রাজকীয়; সুতরাং হরিহর সেনকে অহরহই বিপন্ন হইতে হয়। এই লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই খিটিমিটি বাধে এবং এ-সব ক্ষেত্রে প্রায়ই যাহা ঘটে, হরিহরবাবুকে তাহাতে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এবার—দমকা পাঁচ হাজার টাকার প্রস্তাবে হরিহর বাঁকিয়া বসিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে লক্ষ টাকা তিনি জমাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে পাঁচ হাজার টাকা বাহির করিয়া প্রৌঢ়া স্ত্রীর জন্য হার কিনিতে হইবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইয়াছে। বুকে বল সঞ্চয় করিয়া তিনি সোজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পুঁটুরানী যাইবার সময় শাসাইয়া গিয়াছেন—হার তিনি লইবেনই যেমন করিয়া পারেন। হরিহর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই দিবেন না।

সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে। পুঁটুরানী ফেরেন নাই। হরিহর সেনের প্রতিজ্ঞাও অটল আছে।

অষ্টম দিন প্রাতঃকালে খবরের কাগজ উলটাইতে উলটাইতে হরিহর সেন ভাবিতেছিলেন দিন কতকের জন্য কোথাও উধাও হইয়া গেলে মন্দ হয় না। তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু চন্দ্রনাথ কাশীতে একটি বাড়ি করিয়াছে, বার বার নিমন্ত্রণ করিতেছে। পুঁটুরানীকে কোনও খবর না দিয়া কিছুদিনের জন্য সেখানে গিয়া গা-ঢাকা দিলে হয়। মজাটা বুঝুক কিছুদিন। তাঁহার অন্তর্ধানে পুঁটুরানীর মনোভাবটা কিরূপ হইবে, তাহাই তিনি মানসপটে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

'আসতে পারি—?'

হরিহর সেন চাহিয়া দেখিলেন, দ্বারপ্রান্তে একটি হাস্যমুখী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। যুবতী এবং রূপসী।

'আসুন।'

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভভাবে আসিয়া হরিহরকে প্রণাম করিল। তাহার পর আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—'পুঁটুদি এই চিঠিটা দিয়েছেন।'

হরিহর সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া পত্রখানি লইলেন। ছোট এক টুকরা কাগজ। তাহাতে লেখা আছে—'মণি আমার ছোট মাসীর ছোট মেয়ে। এর এক ভাই অসুস্থ, সেইজন্যই তোমার কাছে যাচ্ছে, একটা ব্যবস্থা করে দিও।'

মণি হাসিয়া বলিল—'আপনি আমাকে দেখেন নি কখনও। আমরা বরাবর পাঞ্জাবে মানুষ হয়েছি।'

'ও! কী হয়েছে তোমার ভায়ের?'

'মাথার অসুখ। এদিকে বেশ স্বাভাবিক, খায়-দায় বেড়ায়। কিন্তু কেমন যেন মাথার ছিট হয়ে গেছে। সব কথা খুলে বলি তাহলে। হয়েছিল কি জানেন, একটা গয়নার দোকানে ও চাকরি করত। সেখান থেকে কী করে একটা হার চুরি যায়। দোকানের মালিকরা ওকেই সন্দেহ করে। পুলিস কেস হয়, ওর জেল পর্যন্ত হয়ে যায়। পরে অবশ্য অন্য জায়গা থেকে সে হার পাওয়া গেল, দোকানের মালিকেরা জেল থেকে ছাড়িয়ে আনলে ওকে, খেসারতও দিলে! কিন্তু তারপর থেকেই ওর মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। মুখে হার ছাড়া আর কথা নেই। হারটা কোথায় গেল, হারটা কোথায় গেল—এই বুলি কেবল। অপরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই বলবে, হারটা কি পছন্দ হল, দামটা কি এখনই দেবেন—এই সব। সব কথা ওই হার নিয়ে। অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কিছু হয় নি। আপনি তো নামজাদা পাগলের ডাক্তার, আপনি যদি দেখে একটা ব্যবস্থা করে দেন।'

'বেশ তো, কোথায় আছে সে?'

'এখানেই। বলেন তো নিয়ে আসি। এখন সময় হবে কি আপনার?'

'তা আনো।'

'দেখি তাহলে একটা ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে আসি—ট্রামে বাসে ওকে নিয়ে চলতে ভয় হয়।'

মেয়েটি চলিয়া গেল। বেশ চটুলা চটপটে তরুণীটি। হরিহরবাবুর মনের বিমর্ষ ভাবটা কাটিয়া গেল। এই সূত্র ধরিয়া গৃহিণীর সহিত যদি একটা মিটমাট হইয়া যায়। ক্ষণপরে তাঁহার মুখে একটি মৃদু হাস্যরেখাও ফুটিয়া উঠিল। শুধু মেয়েদের নয়, হার পুরুষকেও পাগল করে তাহা হইলে! খবরের কাগজ উলটাইতে উলটাইতে নূতন ধরনের একটি মানসিক ব্যাধি দেখিবার আশায় ডাক্তার হরিহর সেন উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে মেয়েটি ফিরিয়া আসিল।

'এখানে ট্যাক্সি তো পাচ্ছি না একটাও! আপনার "কারটা" পেতে পারি কি? বেশী দূর নয়, এই হরিশ মুখার্জি রোড—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়।'

শশব্যস্তে হরিহর উঠিয়া গেলেন এবং ড্রাইভারকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—'এঁকে নিয়ে যাও, ইনি যেখানে যেতে বলেন নিয়ে যাবে।'

আধঘণ্টা পরে গাড়ি ফিরিল।

মণি একা গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—'গাড়িতে ও বসে আছে। চিকিৎসার কথা শুনলে ও আসত না। ডাক্তারদের সম্বন্ধে ওর ভীতি হয়ে গেছে একটা। ওকে এই ব'লে ভুলিয়ে এনেছি যে, জামাইবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি উঠে গিয়ে ডাকুন ওকে। আচ্ছা জামাইবাবু, আপনাদের বাথরুমটা কোন্ দিকে?'

'ও, বাথরুম? এই যে ভিতরের দিকে। সোজা চলে গিয়ে বাঁ দিকেই।'

মণি বাথরুমের সন্ধানে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। হরিহরবাবু বারান্দায় বাহির হইয়া মোটরে উপবিষ্ট যুবকটিকে আহ্বান করিলেন—'এস, ভিতরে এস।'

নিরীহ ভদ্রগোছের যুবকটি সসঙ্কোচে আসিয়া সোফায় উপবেশন করিল। ডাক্তার সেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মনে হইল এসব রোগীকে আড়াল হইতে পর্যবেক্ষণ করাই উচিত।

'বস, আমি আসছি একটু ভিতরে থেকে।'

ঠিক পাশেই যে ঘরটি ছিল ডাক্তার সেন তাহাতেই প্রবেশ করিলেন। কপাট ভেজাইয়া দিয়া জানালার ঝিলমিলি ঈষৎ ফাঁক করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মিনিট দুই পরে একবার তাঁহার মনে হইল মণি তো কই বাথরুম হইতে এখনও ফিরিল না! কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলেন কোন মেয়ের যে বাথরুমে কতক্ষণ লাগিবে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব এবং নির্ণয় করিবার চেষ্টা করাটা অভদ্রতা। সুতরাং কৌতূহল দমন করিয়া তিনি এক মনে রোগী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর উশখুশ করিতে লাগিল। প্রায় মিনিট দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু গলা খাঁকারি দিল। তাহার পর ডাকিল—'ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার সেন বাহির হইয়া আসিলেন।

'কি। কিছু বলছ আমাকে?'

'হারটা পছন্দ হল কি?'

হার-প্রসঙ্গ লইয়াই যে কথা কহিবে তাহা পূর্বে জানা ছিল, সুতরাং হরিহর বিস্মিত হইলেন না।

'হচ্ছে হচ্ছে, ব্যস্ত কী। বস না।'

'আজ্ঞে না। ব্যস্ত কিছু নেই।'

সসঙ্কোচে পুনরায় উপবেশন করিল।

হরিহর খবরের কাগজটা উল্টাইতে লাগিলেন।

আরও মিনিট দুই কাটিল। যুবকটি আবার একটু উশখুশ করিয়া পুনরায় বলিল—'আমার দোকানে কাজ আছে, আমি পরে আসব না নয়, কিংবা আপনি ফোনেও বলে দিতে পারেন, আমাকে একটা রসিদ দিয়ে দিন এখন—'

এ কথায় হরিহর একটু বিস্মিত হইলেন।

'দোকান? রসিদ? মানে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, লক্ষ্মী জুয়েলারি থেকে গিন্নিমা যে হারটা এখনই আনলেন সেটা যদি—'

'গিন্নিমা আনলেন? হার? কখন?'

'এখনই যে মোটরে এলেন আমার সঙ্গে। নেকলেসটা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন। বললেন আপনারও যদি পছন্দ হয় রাখবেন ওটা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেই জন্যে—হারটা কি দেখেন নি এখনও?'

'কই না!'

উদ্‌ভ্রান্ত হরিহর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বাথরুম খোলা। অন্তঃপুর খালি। কেহ কোথাও নাই। হঠাৎ চোখে পড়িল টেবিলের উপর একটি পত্র রহিয়াছে।

শ্রীচরণেষু—

জামাইবাবু, হারটা দিদিকে পৌঁছে দেব। দামটা দিয়ে দেবেন। আপনারও আর একটা হার হল। ইতি—

মণি

গোবর্ধন-চরিত

যেমন বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা তেমনি পরিশ্রমী। কাঠ চেলাচ্ছে তো চেলাচ্ছেই—একটা গাছই কেটে সাফ করে দিলে। মাটি কোপাতে দাও, কুপিয়েই যাচ্ছে—শ্রান্তি, ক্লান্তি নেই। প্রথম যৌবনে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কার মাথায় যেন লাঠি মেরেছিল, লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। ভাগ্যে মরে নি, তাই দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ ক'রে গোবর্ধন ছাড়া পেয়ে গেল। জেলে যখন ছিল, তখন জেলার একবার নাকি তাকে হুকুম দিয়েছিল—বাগানটা সাফ করে দাও। গোবর্ধন অবাধ্য কোনো কালে নয়। বর্ণে বর্ণে আদেশ পালন করেছিল শুনতে পাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাগান একেবারে সাফ। আগাছা, পরগাছা, ফুলগাছ—সব সাফ। বদমায়েশি করে যে করেছিল তা নয়, ওই রকমই ওর বুদ্ধি। ঘোর-প্যাচ নেই। একবার এক জমিদার তার ছেলের বিয়েতে ওকে ব্যাগার ধরে নিয়ে যায়। ইঁদারা থেকে জল তুলতে হবে। জমিদার কার্পেট-পাতা বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে আলবোলায় তামাক টানছেন। বিরাট এক কলসী জল নিয়ে গোবর্ধন দ্বারদেশে হাজির।

"জল কোথায় রাখব বাবু?"

অর্বাচীনটার এই প্রশ্নে জমিদারবাবু একটু কৌতুক বোধ করলেন। আলবোলায় একটা টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—"আমার মাথায়।"

বিনা দ্বিধায় গোবর্ধন এগিয়ে গিয়ে বাধা দেবার পূর্বেই হুড়-হুড় করে সব জলটা ঢেলে দিলে তাঁর মাথায়। রসিকতার ধার ধারে না সে।

…এ হেন গোবর্ধন জুটল এসে শেষকালে আমার কাছে। আমার কিছু চাষ-বাস ছিল। গোবর্ধন একদিন সকালে দন্তবিকাশ করে এসে বললে—"আমাকে আপনি রাখেন, বাবু"

"তুই যে জগদীশবাবুর ওখানে ছিলি।"

"আজ্ঞে, ওনারা বড় খ্যাচ-খ্যাচ করে।"

"তার আগে শীতলবাবুর কামতেও তো ছিলি কিছুদিন?"

"আমার জেল হয়েছিল শুনে রাখলে না।"

গোবর্ধনের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে উঠল।

আমার লোকের দরকার ছিল, রাখলাম গোবর্ধনকে। দিন দুই পরেই বোঝা গেল, লোকে কেন ওকে রাখছে না। গৃহিণী বললেন, "হাতির খোরাক!" হাতির মতো কাজও করে। সুতরাং গৃহিণীর আপত্তি সত্ত্বেও গোবর্ধনকে রাখলাম। মাইনে কত নেবে, তা কিছু ঠিক হল না। তিনকুলে কেউ নেই, টাকার দরকারও ছিল না তার বিশেষ। দুবেলা পেট ভরে খেতে পেলেই গোবর্ধন সন্তুষ্ট।

বছরখানেক কাটল।

একদিন গোবর্ধন এসে ঘাড় চুলকে মাথা চুলকে বললে—"বাবু, তিন কুড়ি টাকা আমাকে দিতে হবে…"

আকাশ থেকে পড়লাম।

"তিনকুড়ি টাকা! কেনরে?"

"আজ্ঞে, বিয়ে করব।"

"অত লাগবে?"

"ওর কমে মেয়ে দিতে চায় না কেউ।"

ঘাড়টা একদিকে কাত করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার বিশাল বলিষ্ঠ বপুর দিকে চেয়ে আমি আর 'না' বলতে পারলাম না। এমন একটা সুস্থ সবল জোয়ান বিয়ে করবে না তো কে বিয়ে করবে! সেদিন একটা বিবাহ-সভায় গিয়েছিলাম। পাত্রের চেহারা দেখে হতাশ হয়ে পড়তে হল। রোগা লিকলিকে দেহ, কোটরগত চক্ষু, গালের হাড় দুটো উঁচু, মুখময় ব্রণ! মহাসমারোহে বিয়ে করছে ছোকরা বিলিতি ব্যাণ্ড বাজিয়ে। ওই অপদার্থটার যদি বিয়ে করবার দাবি থাকে, গোবর্ধনেরও নিশ্চয় আছে।

গৃহিণী বললেন—"আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। ও নিজে শোয় তো বারান্দায়, বউকে এনে রাখবে কোথা?"

গোবর্ধনকে প্রশ্ন করলাম—"হ্যাঁ রে, বউকে এনে রাখবি কোথা?"

"ঘর-টর বেঁধে লিব একটা ওই একটেরে।"

আমার বাড়ির সামনে জমি পড়ে ছিল খানিকটা, আঙুল দিয়ে তারই একটা কোণ দেখিয়ে দিলে গোবর্ধন।

"তাই আগে বাঁধ।"

বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আর পোয়াল গাদা থেকে খড় নিয়ে সেই দিনই কুঁড়ে তুলে ফেললে গোবর্ধন। চমৎকার ছোট্ট কুঁড়েটি। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এসে আমাকে বললে—"গ্যাখেন··"

এর পর আর কোনো আপত্তি টিকল না। বিয়ের জন্যে টাকা তাকে দিতেই হল। এক বছর কোনো মাইনেও তো নেয় নি! কালোকোলো নধর-কান্তি স্বাস্থ্যবতী বউ এল একটি কিছুদিন পরে।

বেশ কাটল কিছুদিন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে বেশ কাজকর্ম করত। বউটাও বেশ খাটিয়ে। একদণ্ড চুপ করে বসে থাকত না। হয় ডাল ভাঙছে, না হয় ঘুঁটে দিচ্ছে, না হয় কাপড় কাচছে। আর সমস্ত হাসিমুখে। বেশ চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হল। গোবর্ধনের কর্তৃত্ববোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ক্রমশ। পান থেকে চুন খসলেই সে বউকে শাসন করতে ছুটত—কখনও লাঠি নিয়ে, কখনও থান ইট নিয়ে। বউটা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিত আমার স্ত্রীর কাছে। গোবর্ধন দূর থেকে শাসাত—"আচ্ছা, দাঁড়া—মজা দ্যাখাচ্ছি তোকে।" তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। গোবর্ধনকে বকলে সে ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকত, তার পর গজগজ করত আপন মনে এবং তার দুদিন পরেই আবার তাড়া করত বউটাকে।

আসন্নপ্রসবা বউটা একদিন শুনলাম বাপের বাড়ি পালিয়েছে। গোবর্ধনকে প্রশ্ন করলাম—"পালাল কেন? হয়েছিল কী!"

"হবে আবার কী! দিয়েছিলুম একটা চাপড়।"

"গোঁয়ার-গোবিন্দ ভূত।"

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন আমার গৃহিণী। গোবর্ধন চুপ করে রইল। পনর দিন কাটল। গোবর্ধনের বউ আর ফেরে না। গোবর্ধন বিমর্ষমুখে ঘুরে বেড়ায়।

আমার দারোগা বন্ধু বললেন—"নালিশ কর তুই। আমি তোর বউ আনিয়ে দিচ্ছি।"

গোবর্ধন নীরব।

উকীল বন্ধু বললেন—"বউ যদি না-ও আসে ক্ষতিপূরণ পাবি।"

গোবর্ধন তবু কিছু বলে না।

আধুনিকমনা একজন মন্তব্য করলেন—"স্ত্রী হলেও সে তো মানুষ। তার সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার না করলে সে থাকবে কেন? গিয়ে মাপ চা।"

গোবর্ধন চুপ করে থাকে।

হঠাৎ খবর এল গোবর্ধনের ছেলে হয়েছে। পাঁচক্রোশ দূরে গোবর্ধনের শ্বশুরবাড়ি, কে একজন এসে খবর দিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে গোবর্ধন উধাও।

আমার আধুনিকমনা বন্ধুটি বললেন—"মাপ চাইতে গেছে বোধ হয়। মানুষ যতই মূর্খ হোক তার সুপ্ত মনুষ্যত্ব এক দিন না একদিন জাগরিত হবেই—"

অনেক রাত্রে গোবর্ধন ফিরল। হাতে ছোট্ট একটি ন্যাকড়ার পুঁটুলি।

আমার স্ত্রী বললেন—"কি রে ওটা কি?"

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে গোবর্ধন বললে—"বাছুরটাকে নিয়ে এলাম, গাই এবার আপনিই আসবে। আপনি একটু দুধের যোগাড় করেন দেখি—"

ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্যে দেখি গোবর্ধনের সদ্যোজাত শিশুটা!

অর্জুন মণ্ডল

কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বসলাম। শীতকালে এতরাত্রে কে এল আবার!

"কে—"

"আমি, আমি, কপাট খোলো।"

খুললাম। সুইচ টিপে আলোটা জাললাম। দেখি খর্বকায় একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলি-রেখা, সামনে গোটা দুই দাঁত নেই।

"আমার চিঠি পাও নি নিশ্চয়?"

"না।"

"চিতুয়া পোস্ট করে নি তাহলে। শালা ভালু। নিজে হাতে পোস্ট করলেই ঠিক হত……তাকে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল। ভুল, ভুল, এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল বীরেনবাবু।"

হঠাৎ অর্জুনকাকাকে চিনতে পারলাম আমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিলে তাঁকে। বহুদিনের যবনিকা সরে গেল যেন।

"অর্জুনকাকা! হঠাৎ এত রাত্রে কোথা থেকে?"

"তীর্থে যাচ্ছি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। শহরে জিনিসপত্রও কিনতে হবে কিছু। তোমাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম বোধ হয়। আমার ধারণা ছিল চিঠি পেয়েছ তুমি।"

"না, না, তার জন্যে কী হয়েছে"—

"হয় নি কিছু। তোমার কাছে খবর না দিয়ে আসবার জোরও আমার আছে। কিন্তু চিতুয়াটার কথাই ভাবছি। এই সব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝা যায় কি না—"

অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। 'বুঝা' 'দিব' নিয়ে আগে কত হাসাহাসি করেছি আমরা।

"ডাকের গোলমাল হয়েছে হয়তো।"

"না, ও কথা মানব না আমি।"

অর্জুনকাকা বারান্দা থেকে নেমে গেলেন এবং গাড়ি থেকে নিজেই নিজের জিনিসপত্র নামাতে উদ্যত হলেন।

"আপনি ছেড়ে দিন না, গাড়োয়ানই নামাবে এখন।"

"কেন ওকে বেশী পয়সা দিতে যাব মিছামিছি—"

'মিছামিছি'ও অর্জুনকাকার বিশেষত্ব!

"দাঁড়ান, আমার চাকরটাকে ডাকি তাহলে—"

"চাকরকেই বা ডাকবে কেন। আমার গায়ে জোর নাই না কি?"

অবলীলাক্রমে নামিয়ে ফেললেন সব। বিছানা, প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ, লোহার উনুনও একটা। চুক্তিমাফিক গাড়োয়ানকে পাই-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন—"কোন্ ঘরটায় শুব?"

বাইরের দিকে খালি ঘর ছিল একখানা। তাতে একটা চৌকিও ছিল। সেইটেই খুলে দিলাম। অর্জুনকাকা বললেন—"যাও, তুমি শুয়ে পড় এইবার। অনেক রাত হয়েছে। আমি এই চৌকির উপর নিজেই বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও।"

"আপনার খাওয়া-দাওয়া?"

"রাত্রে আমি কিছুই খাই না।"

"দু-চারখানা লুচিটুচি ভেজে দিক না, কী আর এমন রাত হয়েছে—"

বিছানা পাততে পাততে অর্জুনকাকা বললেন—"তোমার সঙ্গে কি আমি লৌকিকতা করছি?"

চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি, বুঝলে?"

"ও!"

"নিজেই ভুগবে শালা। আমার কী—"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"যাও, আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়ো"

"সত্যিই কিছু খাবেন না?"

"দেখ, বেশী যদি পীড়াপীড়ি কর বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে স্টেশন-প্লাটফর্মে চলে যাব তাহলে।"

বুঝলাম অর্জুনকাকা বদলান নি। আর দ্বিরুক্তি না করে শুতে চলে গেলাম। শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। অর্জুনকাকার কথাই ভাবতে লাগলাম। অর্জুন-কাকার কথা বাবার মুখে খানিকটা শুনেছি—নিজেও দেখেছি খানিকটা। আশ্চর্য জীবন লোকটার। স্বাধীন দেশে জন্মালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন। এ দেশে কিছু হল না। জাতে জেলে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। মাথায় করে মাছের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এসে হাটে বেচতেন আমাদেরই বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই হাট বসত। অর্জুনকাকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে।

হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চীৎকার চেঁচামেচি কলরব আর্তনাদে সমস্ত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কী যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে অর্জুনকাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুই মাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুনকাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

"আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তারবাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।"

বাবা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"কি কেড়ে নিচ্ছে? কারা?"

"জমিদারের সিপাহিরা। মাছ কেড়ে নিচ্ছে আমার। রোজই নেয় কিছু কিছু। আজ এই বড় রুইটা নিতে যাচ্ছিল। দেব না বললাম তো মারলে এক চড়। আমিও ঘুরিয়ে এক চড় মেরেছি শালাকে।"

গুরুতর ব্যাপার। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য জেলের এই বিদ্রোহ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়। বাবা একটু বিব্রত হলেন। সামান্য অবাধ্যতার জন্য এই জমিদার একজন গরিব প্রজার ঘর জালিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

"আচ্ছা তুমি চুপ করে বোসো এইখানে।"

বাবার পা ছেড়ে অর্জুনকাকা এককোণে বসলেন গিয়ে। সিপাহি দুজনও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা জিগ্যেস করলেন, "এর মাছ কেড়ে নিচ্ছিলে কেন তোমরা?"

"এইসেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উসকো দেনাই চাহিয়ে।"

"নেহি দেগা।"

কোণ থেকে গর্জন করে উঠলেন অর্জুনকাকা।

সিপাহিদের চক্ষু অগ্নি-বর্ষণ করতে লাগল।

ডাক্তার বলে' বাবাকে ইতর-ভদ্র সকলেই খাতির করত। তাই সিপাহিরা আত্মসংবরণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা সিপাহিদের বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যাও। তোমাদের মালিককে যা বলবার আমি বলব। ওকে তোমরা কিছু বোলো না এখন।"

সিপাহিরা চলে গেল।

জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাপ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্যে হামেশাই এরকম করে থাকেন। অর্জুন-কাকার কিন্তু তাক লেগে গেল। অত বড় দুর্ধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তারবাবুটির কাছে একবারে কেঁচো! উঃ, বিদ্যার কী প্রতাপ! কী হবে পয়সায়, কী হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস। বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে অর্জুনকাকা একদিন এসে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন—"আমার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু।"

"কী বল?"

"আমি কিছু লিখাপঢ়া করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

এইবার বাবার তাক লাগল।

"তুমি লেখাপড়া করবে! তোমার সংসার দেখবে কে?"

"আমার স্ত্রী। আমার জমিজমা কিছু আছে, আমার স্ত্রী ধান কুটে, ছাতু পিষে —চলে যাবে কোনো রকমে। আমিও রোজকার করব কিছু।"

"কটি ছেলেপিলে তোমার ?"

"সাতটি মেয়ে, ছেলে নাই।"

বাবার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুনকাকার চোখে জলন্ত আগ্রহ দেখে হাস্য সংবরণ করতে হল তাঁকে।

"পড়াশোনা করবে! সে তো ভালো কথাই। কিন্তু করবে কী করে? স্কুলে তো আর নেবে না তোমায়—"

"নেবে না ?"

"এ বয়সে কি আর স্কুলে নেয়!"

"তবু আমি পড়ব। আপনি যদি একটু দয়া করেন তাহলে হয়।"

"কী করব বল ?"

"আপনার চরণে যদি আশ্রয় দেন একটু। আপনার হাতায় আমি ছোট কুঁড়ে বেঁধে থাকব, আর আপনার ছেলেদের কাছেই পড়ব, তাদের পুরনো বই-টই নিয়ে..."

বাবা একটু চুপ করে রইলেন। অর্জুনকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি নিরস্ত করতেও পারছিলেন না, অথচ এরকম একটা অসম্ভব প্রস্তাবে সায় দিতেও কেমন যেন লাগছিল তাঁর। একটু চুপ করে থেকে দ্বিধাভরে শেষে বললেন, "বেশ, পার তো আমার আপত্তি কি—"

তার পরদিনই বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে অর্জুনকাকা এসে পড়লেন, দেখতে দেখতে ছোট কুঁড়ে ঘরটি বানিয়ে ফেললেন। আমরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, আর সেইদিন থেকে তিনি হলেন আমাদের অর্জুনকাকা। আমাদের যে মাস্টারমশাই পড়াতেন, তিনিই অর্জুনকাকার অক্ষর পরিচয় করিয়ে হাতেখড়ি দিয়ে দিলেন। আমাদেরই প্রথম ভাগ এবং ফার্স্ট বুক নিয়ে তাঁর পড়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।

অর্জুনকাকা খুব ভোরে উঠতেন। এত ভোরে যে আমরা টেরই পেতাম না। আমরা উঠে দেখতাম তিনি কাজে বেরিয়ে গেছেন। মজুরের কাজ করে বেড়াতেন দিনের বেলায়। যা পেতেন স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন। ফিরতেন বিকেলে। বিকেলে এসেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন। প্রায়ই রাঁধতেন না। দই চিঁড়ে কলা প্রিয় খাদ্য ছিল—ছাতুও খেতেন কখনও কখনও। খেয়ে উঠেই হাতের লেখা লিখতেন দিনের আলো থাকতে থাকতে। সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসতেন। রেড়ির

তেলের বেশ বড় একটা প্রদীপ ছিল তাঁর। ভোরে কাজে বেরোবার আগে তিনি যে পড়াটা পড়তেন তা আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যেভাবে পড়তেন তার থেকে তা আন্দাজ করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। শিরদাঁড়া একটুও বেঁকতে দেখি নি কখনও। টেবিল-চেয়ার ছিল না, আমাদের মতো চাপটালি খেয়েও বসতে পারতেন না তিনি। উবু হয়ে বসতেন। সামনে থাকত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার উপর খবরের কাগজ পাতা। তাতেই একটি ছোট ইটের উপর তিনি প্রদীপটি রাখতেন। সেই কেরোসিন কাঠের বাক্সটি একাধারে ছিল তাঁর টেবিল এবং শেলফ্। নীচের ফাঁকটায় তাঁর বই খাতা দোয়াত-কলম থাকত। কী সুন্দরভাবে যে গুছিয়ে রাখতেন সেগুলিকে। খাগের কলমটি, পেন্সিলটি নিখুঁতভাবে কাটা। আমাদের পেন্সিল-কলমও তিনিই বেড়ে দিতেন। পিতলের দোয়াতটি ঝকঝক করত। প্রত্যেক বইয়ে কী সুন্দর মলাট দিতেন!

কিছুক্ষণ পড়বার পরই কিন্তু ঘুম পেত তাঁর। কিন্তু ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবার লোক অর্জুনকাকা নন। উঠে চা করতেন ঘুঁটের উনুন জেলে। ঘুঁটের ধোঁয়ায় শুধু ঘুম নয়, মশাও পালাত। একটি ঘটি চা খেতেন তিনি, এক-আধ কাপ নয়। রাত্রে আর কিছু খেতেন না। চা খেয়ে আবার শুরু করতেন পড়া। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুল ধরত। চোখে সর্ষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাস-ঠাস করে নিজের গালে চড়ও মারতেন কখনও কখনও। আমরা হাসতাম। কারণ অর্জুনকাকার সাধনার ঠিক স্বরূপটি বোঝবার মতো বয়স হয় নি আমাদের তখনও। এখন বুঝতে পারি, পুরাকলে শিক্ষার্থী যেমন গুরু-গৃহে বাস করে' অধ্যয়ন করত, অর্জুনকাকাও তেমনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়তেন। অর্জুনকাকার গুরুস্থানীয় হবার মতো লোক অবশ্য কেউ ছিল না, তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল সেকালের বিদ্যার্থীদের মতো। ওরকম নিষ্ঠাও আর কখনও দেখি নি। মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য বাড়ি যেতেন অবশ্য, কিন্তু তা দু-একদিনের জন্যই। মাসের অধিকাংশ দিনই পড়াশোনা করতেন তাঁর কুঁড়েঘরে বসে। এইভাবে পড়ে বছর দেড়েকের মধ্যে বাংলায় সীতার বনবাস এবং ইংরাজিতে রয়াল রীডার নম্বর ফোর পড়ে ফেললেন তিনি, অঙ্কও শিখলেন কিছু কিছু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক বেশ কষতে পারতেন। তাঁর উৎসাহ দেখে স্কুলের মাস্টার পণ্ডিত সবাই সাহায্য করতেন তাঁকে। অর্জুন-

কাকা বিনামূল্যে কারও সাহায্য নেবার লোক নন। নানাভাবে প্রতিদানও দিতেন তিনি। দইটা মাছটা কলাটা মুলোটা তো দিতেনই, সেবাও করতেন। কারও পা টিপে দিতেন, কারও কাপড় কেচে দিতেন, কারও বাজার করে দিতেন, কিছুতেই আপত্তি ছিল না তাঁর।

এইভাবেই হয়তো আরও কিছুদিন চলত কিন্তু হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘ'টে সব ওলটপালট হয়ে গেল। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এক সাহেব সিভিল সার্জন এলেন একদিন। সকালে স্টেশনের কুলি তাঁর জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ফেরবার সময় জিনিস বইবার লোক পেলেন না সাহেব। হাসপাতালের চাকরটা অসুস্থ, আমাদের চাকরও বাড়ি গিয়েছিল। কাছে কুলি-জাতীয় কাউকে না পেয়ে সাহেব (এবং বাবাও) বিপন্ন বোধ করছিলেন। স্টেশন বেশ একটু দূরে, সাহেবের মালও নেহাত হালকা নয়। অর্জুনকাকা নিজে কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি বসে বসে দড়ি পাকাতেন এবং প্রতি হাটে তা বিক্রি করতেন। বাবা গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি সাহেবের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয় এগিয়ে এসে সাহেবকে সেলাম করে বললেন,—Yes, sir, I shall carry your things most gladly. অর্জুনকাকার মুখে সাহেব ইংরেজী শুনবেন প্রত্যাশা করেন নি, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বাবার মুখে অর্জুনকাকার ইতিহাস এবং অধ্যবসায়ের গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হলেন। স্টেশনে মালপত্র নামাতেই সাহেব তাঁকে একটি টাকা দিতে গেলেন। অর্জুনকাকা পুনরায় সেলাম করে বললেন,—Thank you sir, I am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you.

বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করলেন—Why?

"You are our Doctor Babu's honoured guest."

সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে গেলেন। অর্জুনকাকা জিনিসপত্র নামিয়ে চলে যাবার পর সাহেব বাবাকে বললেন, "ও যদি চায় আপনি ওকে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে ভরতি করে নিন। কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে পাকা ড্রেসার হোক। তারপর ওকে আমি কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ যোগাড় করে দেব।"

খবরটা শুনে অর্জুনকাকা অবাক হয়ে গেলেন। একটু দমেও গেলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি যে পথে সবেগে চলছিলেন হঠাৎ তাতে বাধা পেয়ে এবং সে বাধা

দুরতিক্রম্য অনুভব করে' (স্বয়ং ডাক্তারবাবু যখন তাঁকে ড্রেসার হতে বলছেন তখন তা দুরতিক্রম্য ছাড়া আর কী) অর্জুনকাকার এমন অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হল যা প্রায় অবর্ণনীয়। হতাশা, জেদ, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, ক্ষোভ এবং এই সবটার জন্য দায়ী যে অদৃশ্যশক্তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—সমস্তটা সমবেতভাবে ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

তাঁর মুখের এ রকম ভাবান্তর আরও কয়েকবার লক্ষ্য করেছিলাম আমি। অর্জুনকাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ঘরে একা থাকতেন আমি মাঝে মাঝে ফুটো দিয়ে (তাঁর দরমার ঝাঁপে অসংখ্য ফুটো ছিল) তাঁকে লক্ষ্য করতাম। তাঁর মুখে এরকম ভাবান্তর হতে অনেকবার দেখেছি। এর চেয়েও বেশী অস্থির হতেও দেখেছি। হঠাৎ তাঁর চোখ মুখ কেমন যেন হয়ে যেত, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন, মনে হত জিবটা যেন চিবুচ্ছেন। নাকটা খুব জোরে কুঁচকে খুব ঘনঘন চিবুতেন মনে হত। ছোট একটা হাত-আয়না ছিল তাঁর। চালে গোঁজা থাকত সেটা। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেইটে পেড়ে ভ্রূকুটি সহকারে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। অতীত জীবনে যে সব দুরতিক্রম্য বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি, অন্যায় ভাবে নিয়তির কাছে যতবার পরাভূত হয়েছেন, তার সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি তাঁকে মাঝে মাঝে পাগল করে তুলত বোধ হয়। আয়নার দিকে চেয়ে নিজেই নিজেকে ভ্যাংচাতেন। হয়তো কথঞ্চিৎ শান্তি পেতেন তাতে।

বাবার কথা শুনে বললেন, "কাল থেকে ঘা ধোয়াব! সে কী! তিন-তিন খানা ডিক্‌শনারি আনতে দিয়েছি আমি—"

"অত ডিক্‌শনারি কী হবে!"

"মুখস্থ করব।"

"মুখস্থ করবে? কি হবে ডিক্‌শনারি মুখস্থ করে? তা ছাড়া অত পড়েই বা তোমার লাভ কি, পরীক্ষা তো তোমায় দিতে দেবে না।"

"দেবে না? কেন!"

"এই নিয়ম। প্রাইভেটলি মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে। আর পারে শিক্ষকরা …তাও তিন বছর চাকরি করার পর।"

অর্জুনকাকা বললেন—"শুনেছি হাই স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়া যায়।"

"তা যায় বটে। কিন্তু তার পর আর পারবে না, কলেজে ভর্তি হতে হবে। আই. এ. পাস করতে করতে বুড়ো হয়ে যাবে। তাতে লাভটা হবে কী! তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়। কম্পাউণ্ডার হতে পার যদি কাজ হবে একটা।"

অর্জুনকাকা চুপ করে রইলেন।

পরদিন থেকেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের পদে বাহাল হয়ে গেলেন তিনি। ড্রেসার করিম মিঞার কাছে প্রথম পাঠ নিলেন ব্যাণ্ডেজ পাকাতে হয় কি করে। করিম মিঞার খুব সুবিধে হল। ছাঁ-পোষা লোক তিনি। মুরগী, ছাগল, গোটা দুই বিবি এবং গোটা বারো ছেলে-মেয়ে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে, হাসপাতালের কাজে মন দেবার অবসর পেতেন না তিনি। বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন। অর্জুনকাকাকে শাকরেদ্ পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। অর্জুন-কাকাই সমস্ত কাজ করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্যাণ্ডেজ পাকানো, ছুরি কাঁচি পরিষ্কার করা, খাতায় রুলটানা, টেবিল ঝাড়া—সমস্ত হয়ে যেত। হাসপাতালের চাকরটার আসতে দেরি হলে তার কাজও করে দিতেন। কম্পাউণ্ডার হারাধন বাবুও প্র্যাক্টিস করবার সময় পেলেন। স্টক মিকশ্চার, স্টক মলম অর্জুনকাকাই করতে শিখে গেলেন অল্পদিন পরে। সার্জিকাল যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, লেবেল ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার অক্ষরে লিখতেন সেগুলি, এমন কি বাবার হয়ে রিটার্নও করে' দিতেন প্রত্যহ। অর্জুনকাকা হাসপাতালের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলেন দেখতে দেখতে। হাসপাতালের চেহারাই বদলে গেল। অর্জুনকাকার দৈনন্দিন কার্যক্রমও বদলে গেল অবশ্য খানিকটা। মজুরি খাটবার জন্যে আর বেরুতেন না। অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে সিভিল সার্জন যে বেতন তাঁকে মঞ্জুর করেছিলেন যদিও তা সামান্যই কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। লেখাপড়া বন্ধ করেন নি, বরং বাড়িয়েছিলেন। বাঙলায় বসুমতী সংস্করণের বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক গ্রন্থাবলীই কিনে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজিতে রবিন্সন ক্রুশো, গ্যালিভার্স ট্রাভল্স, পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেস্ জাতীয় বই কিনে শেষ করতে লাগলেন একটার পর একটা। ডিক্‌শনারি মুখস্থ করবার উদ্যমটা নিয়োজিত করতে হল ড্রেসারি-বিষয়ক জ্ঞান-আহরণে। কোর্স ছিল অবশ্য ছোট একখানা চটি

বই। কিন্তু ওটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবার লোক অর্জুনকাকা নন। তিনি সেই বইটা আগাগোড়া মুখস্থ তো করলেনই, সে বিষয়ে আরও যে সব বই বাজারে ছিল তাও আনিয়ে পড়ে ফেললেন একে একে। এতে কিন্তু ফল শেষ পর্যন্ত ভালো হল না। কারণ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন অন্য একজন লোক।

তিনি এতবড় একজন দিগগজকে পরীক্ষার্থী রূপে পাবেন আশা করেন নি। কোনো কোনো বিষয়ে অর্জুনকাকার জ্ঞান তাঁর চেয়েও বেশী এটা বরদাস্ত করা শক্ত হল তাঁর পক্ষে। তিনি সহজ সরল উত্তর প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনকাকা অনেক বই পড়েছেন, একই প্রশ্নের নানা বিচিত্র উত্তর জানা ছিল তাঁর। প্রত্যেক ব্যাণ্ডেজের উদ্ভব, উপযোগিতা, ইতিহাস, সুবিধা-অসুবিধা তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন তিনি। বড় বেশী কথা বলছে দেখে পরীক্ষক ধমক দিলেন। অর্জুনকাকা ধমকে নিরস্ত হবার লোক নন। রাত জেগে অনেক বই পড়েছেন, সমানে তর্ক করতে লাগলেন। পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক করা ডাক্তারি লাইনে শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। ফেল হয়ে গেলেন তিনি। ফেল হয়ে অর্জুনকাকা যে দিন ফিরে এলেন সেদিনও ওইরকম মুখভাব দেখেছিলাম তাঁর। হতাশা জেদ ক্ষোভ এবং সমস্তটার জন্য দায়ী যে দুরতিক্রম্য নিয়তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—এই সবগুলো একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখভাবে, চোখের দৃষ্টিতে। সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরুলেন না। মাঝে মাঝে সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠেছে, চালে-গোঁজা আয়নাটা পেড়ে অতি কুৎসিত ভাবে ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে। অবশ্য ওই একদিন মাত্র; পরদিন থেকে আবার কাজে লেগে গেলেন পূর্ণ-উদ্যমে। যেন কিছুই হয় নি।

পরের বার পাস করলেন। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যে স্কলারশিপও পেলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হল। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্য কটক যেতে হবে। পরিবার রেখে যাবেন কার কাছে? দিনকয়েকের ছুটি নিলেন। ছুটির পর ফিরে এসে কিন্তু তিনি যে খবর দিলেন তা অভাবনীয়। পাশের গ্রামেই অর্জুনকাকার স্বজাতি বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল একঘর। বেশ ভালো অবস্থা, ছোটখাটো জমিদারি আছে।

তাঁর সাত ছেলে। তিনি না কি তাঁর সাত ছেলের সঙ্গে অর্জুনকাকার সাত মেয়ের বিয়ে দিতে চান। হাসপাতালে চাকরি হওয়াতে এবং আমাদের সম্পর্কে

আসাতে অর্জুনকাকার একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল নিজেদের সমাজে। এ প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়ার কথা, কিন্তু অর্জুনকাকা এতে বিপন্ন বোধ করলেন।

"এ এক মহা আফৎ হল"—

অর্জুনকাকা 'আপদ'-কে 'আফৎ' বলতেন।

বাবা বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছে ভালোই হল। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে চলে যাও তুমি। মেয়েরা তোমার সুখেই থাকবে। ওরা বড়লোক—"

"বড়লোক বলেই আমার আপত্তি। বড়লোক মানেই পাজি, বদমাশ, চোর লম্পট, লুচ্যা—"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অর্জুনকাকা।

"আপনি তো সবই জানেন ডাক্তারবাবু। এই জমিদার শালারাই দেশকে চুষে খেয়ে ফেললে। আমার কী হাল হয়েছিল আপনি তো সবই জানেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা—''

"সবাই খারাপ নয়। এরা লোক ভালো।

"আপনি বলছেন?"

অর্জুনকাকার মুখভাব আবার সেইরকম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। বড়লোকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু বাবা যখন এতে মত দিচ্ছেন তখন তা অমান্য করবার সাধ্যও নেই। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি!

বাবা বললেন, "তোমার মেয়েদের যদি বিয়ে না দাও তাহলে কার কাছে রেখে যাবে এদের? মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে।"

"তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না, আমার এক খুড়তুতো ভায়ের কাছে রেখে যাব ভেবেছিলাম। তাকে আনবার জন্যেই কসবায় গিয়েছিলাম ছুটি নিয়ে।"

"তোমার যা খুশি করতে পার। কিন্তু আমার মনে হয় মেয়েদের বিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো"—এই বলে বাবা উঠে গেলেন। অর্জুনকাকা চুপ করে বসে রইলেন। ক্রমশ তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হতে লাগল। চোখদুটো নিষ্পলক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পলক ফেলে জিবটা চিবুতে শুরু করলেন তিনি।

বিয়ের দিনও এক কাণ্ড ঘটল। অর্জুনকাকা তাঁর জমিদার বেয়াইকে জানিয়েছিলেন যে তিনি গরিব মানুষ, বেশী বরযাত্রীর হাঙ্গামা বরদাস্ত করবার শক্তি

নেই তাঁর, কুড়ি জনের বেশী বরযাত্রী যেন আনা না হয়। বিয়ের দিন দেখা গেল পঞ্চাশটা ঢোল, কুড়িটা রাম-শিঙে, পনরটা কাঁসি এবং দশটা শানাই সমভিব্যাহারে এক বিরাট জনতা চতুর্দিক সচকিত করে অর্জুনকাকার বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্জুনকাকা সোজা থানায় চলে গেলেন। দারোগাকে গিয়ে বললেন—হুজুর আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, বাঁচান আমাকে। দারোগা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন অকুস্থলে। ব্যাপারটা অবশ্য পরিহাসেই পর্যবসিত হ'ল শেষ পর্যন্ত। অর্জুনকাকার বেয়াই শুধু লোকজনই আনেন নি, তাদের বসবার, শোবার, খাবার সমস্ত আয়োজনই সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। অর্জুনকাকার বাড়ির সামনের মাঠে তাঁর প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছিল। অর্জুনকাকা কিন্তু এতে খুশী হলেন না। অপমানিত বোধ করলেন। ধনী-হস্তের এই অভিনব অস্ত্রে আহত হ'য়ে চুপ ক'রে রইলেন। কারণ এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে না। গুম হয়ে বসে রইলেন কেবল। হয়তো নির্জনে মুখ-ভঙ্গী করে নিজেই নিজেকে ভেংচেছিলেন, কিন্তু সে খবর আমরা জানি না।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। অর্জুনকাকা নিজের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কটক চলে গেলেন।

এর পর বছর দুই অর্জুনকাকার কোনো খবর পাই নি। মাইনার পাস ক'রে আমরা শহরের হাইস্কুলে গিয়ে ভরতি হলাম। অর্জুনকাকা কটকে কম্পাউণ্ডারি পড়ছেন এইটুকু শুধু জানতাম। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলাম অর্জুনকাকা সেখানেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বছর দুই পরে অর্জুনকাকা হঠাৎ এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে তাঁর সাত জামাই। তাদের স্কুলে ভরতি করে দিয়ে গেলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন আমরা যেন একটু দেখা-শোনা করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললেন, "বলছি বটে, কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বড় বিলাসী। আর আফৎ জুটেছে এক পিসী—"

মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ ক'রে। পরের ট্রেনেই চলে গেলেন।

আমরা বোর্ডিংয়ে থাকতাম। অর্জুনকাকার জামাইরা একটা বাসা ভাড়া ক'রে রইল। সঙ্গে এল এক পিসী। তিনিই হলেন গার্জেন। জমিদারি থেকে প্রচুর দুধ দই মাছ ঘি আম কাঁঠাল সরবরাহ হতে লাগল, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাদের

প্রাইভেট পড়াতে লাগলেন, স্থানীয় মনোহারী দোকানটার বিক্রি বেড়ে গেল, অর্জুনকাকার জামাইদের নিত্য নতুন সাজসজ্জায় আমরা ঈর্ষান্বিত হতে লাগলাম। কিন্তু অর্জুনকাকা যা বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই হল। অর্থাৎ জামাইদের কিচ্ছু হল না। জামাইরা প্রমোশন পেলে না। একদিন হঠাৎ আবার শুনলাম অর্জুনকাকা এসেছেন। শুধু এসেছেন নয়, এসে গো-বেড়েন করেছেন প্রত্যেকটি জামাইকে। বেচারাদের আর্তনাদে পাড়ায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে না কি! দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি বাইরের বারান্দায় ভাঙা আয়না, চিরুনি, স্নো, পাউডার, সিগারেটের বাক্স, কয়েকটা শৌখীন জামা, শাল প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বাইরের দিকে একটা জানালা ছিল। উঁকি দিয়ে দেখি অর্জুনকাকা! পিছনে দুহাত রেখে ক্রমাগত পায়চারি করছেন আর জিব চিবুচ্ছেন। মুখভাব ভয়াবহ। চুপিচুপি সরে পড়লাম। অর্জুনকাকা সেই দিনই চলে গেলেন। তার পর দিন জামাইরাও স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে চলে গেল। এ নিয়ে শুনেছি বেয়াইয়ের সঙ্গে ঘোরতর মনোমালিন্য হয়েছিল অর্জুনকাকার, কিন্তু বাবা মাঝে পড়ে' মিটিয়ে দিয়েছিলেন সব।

আমি ক্রমশ ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে কলেজে ভরতি হলাম। তারপর আই. এসসি. পাস ক'রে গেলাম মেডিকেল কলেজে। অর্জুনকাকার খবর অনেক দিন পাই নি। এইটুকু শুধু শুনেছিলাম যে তিনি কম্পাউণ্ডারি পাস ক'রে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নানা হাসপাতালে চাকরি ক'রে বেড়াচ্ছেন। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে দেখলাম অর্জুনকাকা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমার জন্যেই বিশেষ ক'রে ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। কেন এসেছেন শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ করতে চান!

"তুমি তো পড়ছ এ সব, আমাকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দাও।"

বলা বাহুল্য, বিপন্ন হলাম। কিন্তু অর্জুনকাকাকে নিরস্ত করার সাধ্য আমার ছিল না। একবার শুধু ইতস্তত করে বললাম, "এখন আর কি করবেন এসব পড়ে!"

তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার কথা শুনে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, যেন আমি হাস্যকর অদ্ভুত কিছু বলেছি একটা।

"কি করব! বাঃ"

একটু থেমে তারপর বললেন, "শিখব। শিখতে দোষ কি আছে! তা ছাড়া চাকরি করার আর ইচ্ছা নাই। সব শালা চোর! প্র্যাকটিস করব ঠিক করেছি। আমাকে ডাক্তারিটা ভালো করে শিখিয়ে দাও তুমি!"

যতদিন বাড়িতে ছিলাম অর্জুনকাকার সঙ্গে পড়তে হত। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা হত আমার! ওই বৃদ্ধের উৎসাহের সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারতাম না। প্রত্যহ রাত্রে এগারোটায় শুয়ে ভোর চারটের সময় ওঠবার শক্তি ছিল না আমার। কিন্তু অর্জুনকাকা নাছোড়। রোজ ডাকাডাকি ক'রে ঠিক তুলতেন আমাকে। কেবল দুপুরটা ছুটি পেতাম। অর্জুনকাকা সেই সময় আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিতেন। খিল দিতেন ভিতর থেকে। আমি মনে করতাম ঘুমোন বোধ হয়। একদিন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি পিছনে দুহাত রেখে পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। জিব চিবুচ্ছেন। ক্ষোভ দুঃখ ঘৃণা ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখে। হাতে ছোট আয়নাখানা। মাঝে মাঝে সেটা তুলে ধরছেন মুখের সামনে আর ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে।

ছুটি ফুরোতে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু অর্জুনকাকার বড় বড় স্পষ্টাক্ষরে লেখা চিঠি পেলাম একখানা—"অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকা বিষয়ক বাংলা ভাষায় এবং সহজ-বোধ্য ইংরাজি ভাষায় লেখা যত বহি সংগ্রহ করিতে পার অবিলম্বে আমার নামে ভি. পি. যোগে পাঠাইয়া দিও।" যা পেলাম পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম অর্জুনকাকা সত্যিই চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। তারও কিছুদিন পরে আমার 'মেসে' এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে ছ-সাত বছরের একটি ছেলে। বললেন—"এটি আমার নাতি। আমার মেয়ের ছেলে। একে একটা ভালো স্কুলে ভরতি করব বলে এনেছি। ওখানে কিছু হবে না। তুমি একটা ভালো স্কুল বেছে দাও। শুনেছি মর্টন স্কুলে খুব কড়া শাসন, সেখানে দিলে কেমন হয়?"

"কি হবে অত কড়া শাসনে রেখে?"

"তুমি বুঝ না, কড়া শাসনই দরকার। তা না হলে এসব ছেলের কিছু হবে না।"

তারপর একটু হেসে কবি হেমচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে বললেন, "হেঁ হেঁ এসব দৈত্য নহে তেমন—"

চকিতের মধ্যে মুখের পেশীগুলো কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল জিবটাও যেন নড়ে উঠল মুখের মধ্যে একবার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী নাম তোমার" ?

"চিতুয়া।"

অর্জুনকাকা ধমক দিয়ে উঠলেন।

"চিত্তরঞ্জন বলতে পার না ?"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"এমন অসভ্য এরা, ভালো একটা নাম রাখলাম চিত্তরঞ্জন, সে নামকে করে ফেললে চিতুয়া। সবাই ডাকছে চিতুয়া, চিতুয়া। চিত্তরঞ্জন শব্দ মুখ দিয়ে বেরই হয় না, কি করবে বেচারারা—"

অর্জুনকাকার ওপরের ঠোঁটটা একটু কেঁপে থেমে গেল।

চিত্তরঞ্জনকে মিত্র ইন্‌ষ্টিট্যুশনে ভরতি করে দিলাম।

মর্টনের উপরই অর্জুনকাকার ঝোঁক বেশী ছিল, কিন্তু আমি মানা করতে আমার কথাটা রাখলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন—"টাকার কোনো অভাব হবে না, এর বাবা না দেয় আমি টাকা দিব, কিন্তু পড়াশোনার ভালো ব্যবস্থা হওয়া চাই। বিলাসিতা না করে সেইটি দেখো—"

আমি যতদিন কোলকাতায় ছিলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম চিতুয়া যাতে চিত্তরঞ্জন নামের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন প্রতিকূলতা করতে লাগল। চুম্বক যেমন লৌহকণা আকর্ষণ করে, চিতুয়া তেমনি নানা কুসঙ্গী জোটাতে লাগল তার চারিদিকে। ক্লাস-প্রমোশন অবশ্য পেলে কিন্তু তা নিজের জোরে নয়, আমার তদ্বিরে।

এর পর অর্জুনকাকার যে স্মৃতিটা আমার মনে পড়ছে তা আমার বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের ঘটনা। ভালো ডাক্তার হতে হলে এখানকার ডিগ্রিই যে পর্যাপ্ত নয় এ ধারণা তখন আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এখন যদিও ধারণাটা বদলেছে, তখন কিন্তু নামের পিছনে একটা বিলিতি ডিগ্রি লাগাবার জন্যে লোলুপ হ'য়ে উঠেছিলাম। বাবাকে বললাম। তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু। ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাকে সোজা 'না'-ও বলতে, পারলেন না। ছেলে পড়তে চাইছে, অর্থাভাবে তার পড়া হবে না, ব্যাপারটা কষ্টদায়ক হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন

সময় আমাদের এক আত্মীয় এসে খবর দিলেন যে একজন বড়লোক আমার বিলেত যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করতে প্রস্তুত আছেন, আমি যদি বিলেত যাওয়ার পূর্বে তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করি। আমরা চিরকাল পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে এসেছি, সুতরাং এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। এই সব নিয়ে বাড়িতে আলাপ-আলোচনা চলছে, হঠাৎ অর্জুনকাকা এসে উপস্থিত হলেন। আমি বাড়ি এসেছি, খবর পেলেই তিনি আসতেন এবং ডাক্তারির নানা তথ্য আহরণ করতেন আমার কাছ থেকে। তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন সব। শুনে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। সবাই চলে গেলে আমাকে বললেন, "বিয়ে করে বিলেত যাও না, ভালোই তো। শ্বশুরের টাকা নিতে তোমার আপত্তি কেন?"

"ওর মধ্যে বড়লোকের দম্ভ প্রচ্ছন্ন আছে একটা, তা আমি সহ্য করতে পারব না।"

"বাঃ—"

অর্জুনকাকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, "বিলেত যেতে কত টাকা লাগে?"

"পাঁচ-ছ হাজার।"

"মোটে? আমি দিব তোমাকে টাকা।"

"আপনি?"

"হাঁ—ছ হাজার টাকা পোস্টাপিসে আছে আমার। কালই বের করে আনতে পারি। তুমিই নাও টাকাটা। তোমাদের জন্যই তো আমার সব। আমার তো কিছুই ছিল না।"

চুপ করে রইলাম।

"কাল তাহলে টাকাটা বের করি?"

"না, থাক!"

"কেন, আপত্তি করছ কেন?"

"থাক না আপনার টাকা। আপনার নাতিরা মানুষ হয় নি এখনও।"

"হবেও না। সব শালা গুণ্ডা হচ্ছে। তা ছাড়া ওদের টাকার অভাব কী। ওদের আমি দিব না কিছু। তুমিই নাও, ভালো কাজে খরচ হলে তৃপ্তি হবে

আমার। কি বল, বের করি?" অর্জুনকাকার চোখে আগ্রহ ফুটে বেরুতে লাগল যেন।

"না, থাক।"

"কেন, আমাকে পর ভাবছ?"

একটু মুচকি হেসে আমি উঠে গেলাম। অর্জুনকাকা একা বসে রইলেন। ফিরে এসে দেখি তিনি পায়চারি শুরু করেছেন। উত্তর দিকের বারান্দাটায় ক্রমাগত চক্কোর দিচ্ছেন। পিছনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা অবর্ণনীয়। আমাকে দেখতে পেলেন না, আমিও স'রে গেলাম সেখান থেকে।

কিছুদিন পরে একটা জাহাজের চাকরি নিয়ে আমি বিলেত চলে যাই। অর্জুনকাকার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। দেখা হল বিলেত থেকে ফেরবার পর। হঠাৎ সেদিন রাত্রে এসে হাজির। কিন্তু সকালে উঠে দেখি অর্জুনকাকা নেই। তাঁর উনুনটি বাইরের বারান্দার নীচে ধোঁয়াচ্ছে। চাকরটা বললে, বুড়োবাবু আমার কাছ থেকে কিছু কয়লা আর ঘুঁটে নিয়ে নিজের হাতে উনুনে আঁচ দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, তাঁর অপেক্ষাতেই বসে রইলাম। বিলিতি ডিগ্রি সত্ত্বেও চাকরি পাইনি, প্র্যাকটিসও জমাতে পারি নি। কোটিপতি হবার আশায় কোলকাতা শহরে গিয়ে বসেছিলাম কিছুকাল। কিছু হয়নি। এখন এই মফঃস্বল শহরে এসে বসেছি। কোটিপতি হবার সম্ভাবনা না থাকলেও গ্রাসাচ্ছাদন জুটবে বলে মনে হচ্ছে। দশটার সময় এক জায়গায় যেতে হবে, তার আগে হাতে কোনো কাজ নেই। অর্জুনকাকার অপেক্ষায় বসে রইলাম। একটু পরেই অর্জুনকাকা শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে এলেন। শুধু গা, শুধু পা। এক হাতে একঘটি জল, অন্য হাতে ভিজে কাপড়, গামছা।

"অর্জুনকাকা, এত ভোরে কষ্ট করে গঙ্গা নাইতে গেলেন কেন? চাকরটাকে বললেই সে বাথরুম দেখিয়ে দিত—"

"কষ্টটা আর কি। এতেই অভ্যস্ত আমি।"

ভিজে কাপড় গামছা জানালায় গরাদেতে বেঁধে শুকুতে দিলেন। তারপর এক হাতে জ্বলন্ত উনুনটা তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়।

"বারান্দায় উনুন রাখতে তোমার আপত্তি নাই তো?"

"না। উনুন দিয়ে কী করবেন?"

"দেখ না"—বলেই জলের ঘটিটা বসিয়ে দিলেন তাতে। তারপর উনুনের ধারে ছোট মোড়াখানা টেনে এনে তার উপর বসে গা হাত পা সেঁকতে লাগলেন।

"তুমিও সরে এসে বস না। সোয়েটারই পরো আর শালই গায়ে দাও, এর কাছে কিছু নয়।"

অর্জুনকাকা হাত গরম ক'রে ক'রে দুই গালে দিতে লাগলেন। দু পা ফাঁক করে উনুনটাকে দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দাঁড়ালেন দু-একবার। চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। অর্জুনকাকার সঙ্গে যে আমার কি সম্পর্ক তা স্ত্রীকে সবিস্তারে বলেছিলাম। ট্রের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম, সম্মানিত অতিথির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে সে।

অর্জুনকাকা সবিস্ময়ে বললেন—"এ সব কি!"

"একটু চা খান।"

"আমার কথা সব ভুলে গিয়েছ দেখছি।"

"চা তো আপনি খেতেন।"

"চা তো খাবই, ওই তো জল হচ্ছে। চা দুধ চিনি আনতে বল—আমার বাক্সে সব আছে—কিন্তু তোমার এখানে এসেছি, তোমারটাই খাব আজ। শৌখিন পেয়ালায় এক-আধ চুমুক খেয়ে কিছু হবে না আমার—"

"বেশ তো, বেশী করেই খান না।"

"আমি নিজের হাতে করব—নিজে খাব, তোমাকেও খাওয়াব।"

"খাবার-টাবারগুলো?"

"আমি তো সকালে কিছু খাই না, তুমি জান। আগে দই-চিঁড়া খেতাম, এখন তা-ও ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল একবার খাই, শুধু দুপুরে, তা-ও নিরামিষ।"

"এত খাবার কি হবে তাহলে, আপনার জন্যে এনেছে—"

"বেশ, আমিই তোমাদের দিচ্ছি। তুমি খাও, তোমার ছেলে-মেয়েদের ডাক। ছেলে-পিলে কটি তোমার?"

"একটিও হয় নি এখনও।"

"কেন?"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অর্জুনকাকা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক যুক্তি অনুসারে আমি যে জন্ম-নিরোধ ব্যাপারে লিপ্ত আছি তা আর তাঁকে বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অর্জুনকাকা চাকরটাকে বললেন, "তুমি এসব নিয়ে যাও। মাকে বলো কিছু চা, চিনি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে, তোমার বাবুর জন্যে একটা কাপ রেখে যাও খালি।

চাকর নিয়ে এল সব। অর্জুনকাকা চায়ের পাতা শুঁকে বললেন—"এ চা ভালো নয় তোমার। ঠকিয়েছে তোমাকে।"

একটু লজ্জিত হলাম। সত্যি কথাই বলেছেন অর্জুনকাকা। ঠকায় নি—অর্থাভাবে সস্তা দামের চা-ই ব্যবহার করি। শহরে অধিকাংশ বাড়িতেই পেয়ালারই চাকচিক্য, চা খেলো!

অর্জুনকাকার ঘটির জল ফুটে উঠল। তোরঙ্গ থেকে তিনি কুচকুচে কালো পাথরের বেশ বড় একটি গ্লাস বার করলেন। একটি পিতলের ছাঁকনিও। চা তৈরি করলেন, আমাকে এক কাপ দিলেন, নিজে এক গ্লাস নিলেন। চা খেতে খেতে নিজের কথা বলতে লাগলেন। মূর্খ জামাইদেরসঙ্গে বনিবনাও হয় নি তাঁর। নাতিও মনের মতো হয় নি। স্ত্রী মারা গেছেন। প্র্যাকটিস করতেও আর ভালো লাগে না। দুনিয়ার কারও সঙ্গেই বনল না। বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই ঠিক করেছেন শেষকালে।

"তোমার প্র্যাক্টিস হচ্ছে কেমন ?"

"চলে যাচ্ছে।"

"হবে, তোমার ঠিক হবে। আমগাছে আমই ফলবে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

"আচ্ছা, তুমি বস। আমি বাজারটা ঘুরে আসি।"

অর্জুনকাকা চলে গেলেন।

আমিও রোগী দেখতে বেরুলাম।

যখন ফিরলাম তখন বেলা বারোটা। ফিরে দেখি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় অর্জুনকাকা বসে আছেন।

"খুব অদ্ভুত জিনিস দেখলাম একটা।"

"কি ?"

"দেখবে ? চল না, কাছেই।"

"বলুন না কি ?"

"না দেখলে সে ঠিক বুঝবে না। পাঁচ মিনিটের পথ, চলো না"—

যেতেই হল। অর্জুনকাকা আমাকে নিয়ে গেলেন এক লোহার দোকানে।

"ওই দেখ !"

"কি ?"

বিস্ময়কর কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হচ্ছিলাম।

"লোহার চাদরটা দেখছ না ! হাত দিয়ে দেখ কত মোট"—

কোট-প্যাণ্ট পরা ছিল, ঝুঁকতে একটু কষ্ট হল, তবু অর্জুনকাকার আগ্রহাতিশয্যে ঝুঁকে লোহার চাদরের ঘনত্ব অনুভব করলাম।

"ভালো নয় ?"

"হাঁ, বেশ পুরু মনে হচ্ছে।"

"পুরুই দরকার।"

"কি করবেন এ নিয়ে ?"

"উনুন। চমৎকার উনুন হবে এতে। তোমার জন্যও একটা করতে দি, কি বল ?"

"দিন।"

উনুনের দরকার ছিল না, কিন্তু অর্জুনকাকাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলাম না। অর্জুনকাকা সোৎসাহে আরও খানিকটা লোহার চাদর, শিক, আংটা প্রভৃতি কিনে নিজেই সেগুলি কামারের ওখানে বয়ে নিয়ে গেলেন। কুলি করতে দিলেন না। কামারকে বললেন—"আর একটা উনুনও করতে হবে। বেশ ভালো মজবুত ক'রে কোরো, বুঝলে ?"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাজারে যে-সব তৈরী তোলা উনুন পাওয়া যায়, সে-সব বড় অমজবুত। এ দেখো কি রকম হবে—"

ফিরবার পথে বললেন, "এখানে কাঠও বেশ পাওয়া যায়। কাঁঠাল কাঠের দর করে এসেছি, একটা সিন্দুকও করিয়ে নেব ভাবছি।"

তার পরদিন শুধু কাঁঠাল কাঠ নয়—ইস্ক্রুপ, কবজা, কাঁটি, লোহার পাত এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক ছুতোর মিস্ত্রিও এসে হাজির হল। অর্জুনকাকা সোৎসাহে সিন্দুক করাতে লেগে গেলেন।

আমাকে বললেন, "সিন্দুকটা এমন ভাবে করাব যাতে আমার সব কুলিয়ে যায় ওতে। বিছানা-পত্তর, খাওয়া-দাওয়ার জিনিস, উনুনটা, বাসন দু-একখানা, বই-টই—পাঁচটা পুঁটুলি ক'রে আর কী হবে। আমার কটা জিনিসই বা আছে! একটু বড় করেই করাব, রাত্রে যাতে ওর উপর শুতেও পারি···কি বল?"

"বেশ তো।"

উঠে-পড়ে লাগলেন তিনি। সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিটার সঙ্গে ধস্তা-ধস্তি চলত।

"ভালো ক'রে র‍্যাঁদা দাও না, ওর নাম কি র‍্যাঁদা দেওয়া! বার্নিশ হবে! ও কি করছ তুমি?"

"একটু ভালো ক'রে খেটে-খুটে করো বাবা, মজুরি ছাড়া বখশিশও দেব তোমাকে। ফাঁকি দিও না—"

"হাঁ, ঠিক ক'রে মেপে নাও—থামো থামো, আমি ধরছি—"

"আরে বাবা কতবার বলব তোমাকে, ভিতরে বড় বড় চারটে খোপ হবে, হাঁ চারটে—"

"হাঁ হাঁ হাঁ প্যাচ কোষো না এখন, দাঁড়াও দেখি—"

এই জাতীয় নানা উক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। অর্জুনকাকা মেতে উঠলেন সিন্দুক নিয়ে। একেবারে শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন। জলের মতো খরচ হতে লাগল। পিতলের বড় বড় ডুমো ডুমো পেরেক কিনে আনলেন সিন্দুকের শোভাবৃদ্ধির জন্য। কোণে কোণে লোহার পাত দিলেন মজবুত করবার জন্য। মিলটন কাপড় কিনে সিন্দুকের ভিতর অস্তর দিলেন। যত খরচই হোক, জিনিসটা মনোমত করতে হবে। জীবনে কোনো জিনিসই মনোমত হয় নি; এটাকে নিখুঁত করতেই হবে—আমার মনে হল এই ধরনের একটা জেদ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। অন্তত একটা কাজেও তিনি যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন, এই সান্ত্বনাটুকু আঁকড়ে তিনি তীর্থবাস করতে চান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, আগ্রহ যেন সিন্দুকটার উপর প্রয়োগ করছেন তাই।

অর্জুনকাকা বললেন—"এর উপর উঠে লাফাও তুমি—"

"কেন?"

"দেখ, কত মজবুত।"

"মজবুত হয়েছে বই কি।

"আহা, উঠে দাঁড়াও না তুমি—"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিন্দুকটার উপর উঠে দাঁড়াতে হল।

"পা ঠুক।"

পা ঠুকলাম দু-একবার।

"খুব মজবুত হয়েছে।"

অর্জুনকাকার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

উনুন এসে গেল। অর্জুনকাকা তোরঙ্গটাও আমাকে উপহার দিলেন। তোরঙ্গের জিনিসপত্র সিন্দুকে পুরলেন। আরও নানারকম জিনিস কিনে ভরতে লাগলেন সিন্দুকে। গোটা দুই তালা কিনলেন ভালো দেখে।

ক্রমশ যাবার দিন ঘনিয়ে এল। অর্জুনকাকা প্রথমে যাবেন প্রয়াগ, মাঘ মাসটা সেখানে কাটাবেন, তারপর থাকবেন কাশীতে এসে।

অর্জুনকাকাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম। একটা কুলি সিন্দুকটা তুলতে পারলে না। দুজন লাগল।

ট্রেন এল। কুলি দুজন প্রাণপণে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে গাড়িতে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই ঢুকল না। সুটকেস নিয়ে কত লোক উঠল-নামল কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুনকাকা উঠতে পারলেন না। ট্রেন ছেড়ে গেল।

...অর্জুনকাকার দিকে চেয়ে দেখলাম—তাঁর সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, ঘনঘন জিব চিবুচ্ছেন তিনি।

অদৃশ্যলোকে

১

একমুখ-গোঁফ-দাড়িওয়ালা লোক—মাথায় বাবরি চুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—চোখ দুটোতে অস্বাভাবিক রকম প্রখর দীপ্তি। হঠাৎ দেখলে কাপালিক ব'লে সন্দেহ হয়। সাইকেল চ'ড়ে রোজ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যায়—মাড়োয়ারীর তেলকলের কেরানী।

২

শ্মশানে একদিন দেখেছি তাকে। মড়া পোড়াতে গিয়েছিলাম, দেখি লোকটি দূরে দূরে, অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। আমাদের দেখে সরে গেল।

৩

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। 'লু' বইছে। পাশের যোগেনবাবুর বাড়ির বাইরের ঘর থেকে নারী কণ্ঠের চাপা কান্না কানে এল। গিয়ে দেখি, যোগেনবাবুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এক মলিনবসনা বধূ। রূপ নেই—স্বাস্থ্য নেই—অশ্রু ছাড়া আর কিছু নেই!

যোগেনবাবু দয়ালু লোক।

মেয়েটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন—আচ্ছা, শিবুকে আমি ধমকে দেব। রাতদুপুরে শ্মশানে যায় কেন!

শুনলাম শিবু সেই লোকটির নাম—সেই তেলকলের কেরানী।

৪

তন্ত্রের একটা বই হাতে এল।

পড়ে দেখলাম, সাধনা করলে নাকি অদৃশ্যলোক থেকে ভামরী ঝামরী ডামরী নানা দেবদেবী ডাকিনী-যোগিনী দেখা দেন অদৃশ্যলোকের অপরূপ ঐশ্বর্য নিয়ে। সিদ্ধি হয় সাধনার অনুরূপ। যে, যে কামনা নিয়ে সাধনা করে, সে, সেই সেই রূপে নাকি পায়। প্রিয়া-রূপেও নাকি পাওয়া যায়—যদি সাধনার জোর থাকে।

৫

যদি জেরা করেন সদুত্তর দিতে পারব না।

মনে কিন্তু গল্প জাগে।

দিনের আলোয় দৃশ্যমান জগতে শিবু তেলকলের সামান্য কেরানী, কুৎসিত হাড়পাঁজরা-বার-করা স্ত্রীর স্বামী, একপাল রুগ্ন ছেলেমেয়ের পিতা, অধিকাংশ লোকেই গ্রাহ্য করে না তাকে, গাল দেয় অনেকে। দিনের আলোয় সে নগণ্য। শ্মশান-সাধনায় কিন্তু সে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাতের অন্ধকারে তার কাছে অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসে পদ্মিনী, গলায় পরিয়ে দেয় বরমাল্য।

রাত দুপুরে

রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নালোকিত নীল আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, শুভ্র একখণ্ড লঘু মেঘ ছায়াপথের পাশ দিয়ে অলস মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে রেবতী নক্ষত্রের দিকে। ঝাউবনের মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সহসা মনে হল—সে আসে নি। আসতে পারত কিন্তু আসে নি।

উঠে বসলাম বিছানায়। দূর চক্রবালরেখালগ্ন পর্বতশ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠেছে স্বপ্নপুরীর মোহ-মহিমায়—অব্যক্তের ইঙ্গিত যেন উঁকি দিচ্ছে দৃষ্টিসীমানার ওপার থেকে।

ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এ কি!

দিনের বেলা যে তালগাছ দুটোকে প্রান্তরের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—তারা কাছাকাছি সরে এসেছে—একজন আর-একজনের কানে কী যেন বলছে চুপিচুপি।

সহসা তারা যেন টের পেয়ে গেল আমি দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে স'রে গেল তারা প্রান্তরের দুই প্রান্তে, দুষ্টু ছেলের মতো। ডেকে উঠল একটা নাম-না-জানা পাখি—যেন হেসে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে।

অবর্তমান

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ কার্য করেন নি, তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো ব্যাপারটা ঠিক কী জাতীয়। ধু ধু করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউ-গাছের ঝোপ, একধার দিয়ে শীতের শীর্ণ গঙ্গা বইছে। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু-হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চ'লে এসেছি তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ধরে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার। ভ্রমণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখি পাওয়া যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে আমি মাংস খাবার লোভেই পাখি মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলুভাতে-ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম তখন হতাশ হয়ে পড়তে হল আমাকে। কোথায় পাখি! ধু ধু করছে বালির চড়া—আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু-একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখি কোথায়! বন্দুক কাঁধে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয়, চখার ডাকটা ঠিক সে রকম নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলুম চখা আছে কোথাও কাছেপিঠে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে—কিন্তু আশ্চর্য হয়ে

গেলাম মাত্র একটি দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম দম্পতির একটিকে কোনো শিকারী আগেই শেষ করে গেছেন। এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়! দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বেশ খানিকটা দূরে আমি আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব আর অমনি কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে ধৈর্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। আমিও বসলাম। উপর্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম, কিন্তু উলটো দিকে। পাখিটা মনে করুক যে আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ওধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছু দূর ঘুরতে হল—প্রায় মাইল খানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ করে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব আর অমনি—

কাঁআঁ—

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধ'রে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি, কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোখ চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখিটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়ল না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় বসে রইল। মনে হল অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল, যার কাছে-পিঠে কোনো আড়াল-আবডাল নেই—চতুর্দিকে ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হল। এবার গিয়ে বেশ ভাল জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে ঝোপে যা দু-একটা ছোট পাখি ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু করে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

আমি বসেছিলুম একটা বালির ঢিপির উপর, মুশকিল হ'ল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না, বালির স্তর দিয়ে কোনো রকম স্পন্দনই গিয়ে পৌছল তার কাছে তা বলতে পারি না। উঠে দাঁড়ালাম। রোখ আরও চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখিটা ওপারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিই নি—ও-ও আমাকে দেয় নি। এখন দুজনে দু-পারে। চুপ করে বসে রইলাম।

সূর্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত জলন্ত লাল দেখাচ্ছিল, ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দিক। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ি ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানি না।

ঘুরে বেড়াচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্যগগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়ি নি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ-সত্তা অধিকার করে বসল। আমি মুগ্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম। মুগ্ধ হ'য়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে হ'ল কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়ে নি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়ে নি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হল আজীবন সব দিক দিয়েই আমি

বঞ্চিত। জীবনের কোনো সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি শখ ছিল—ভ্রমণ, সঙ্গীত, শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেনে স্টীমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি, কিন্তু তাকে ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্তপ্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, হিমশীতল মেরু-প্রদেশের ভাসমান তুষারপর্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম তাহলে আর কি হল! সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে; কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকালই এড়িয়ে গেছে আমাকে! সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে!

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়ছিল; কিন্তু সেই স্বরটি ফুটল না যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর লোকের নির্জন-রোদনের অবাঙ্ময় বেদনা মূর্ত হয়। শিকারই বা কি এমন করেছি জীবনে? সিংহ হাতি বাঘ গণ্ডার কিছুই মারি নি। মেরেছি পাখি আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপর চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা সাধারণতঃ রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনোরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

আরও খানিকটা নেমে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার করে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখিটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম ভেসে যাচ্ছে।

যাক। জীবনে যা বরাবর হয়েছে এবারও তাই হল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনও কিছু পাই নি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ করে বসে ছিলাম।

চতুর্দিকে ধু ধু করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে,

জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোনো কিছু কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজুদেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গ মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখনই ব নদীতে নামলেন, কিছুই দেখতে পাই নি!

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কে?"

লোকটি এতক্ষণ লক্ষ্যই করেন নি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন—"আমি এখানেই থাকি। আপনি আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।"

পরিচয় দিলাম।

"ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।"

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূরে গিয়েই দেখি একটি ছোট্ট কুটির। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়ে নি আমার। ছোট্ট কুটিরটি যেন ছবির মতন—সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ—চতুর্দিকে রজনীগন্ধার গাছ—অজস্র ফুল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধার ঊর্ধ্বমুখী বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভিতর ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্জি গোছের কী একটা পাততে লাগলেন।

"বসুন।"

বসে দেখলাম শতরঞ্জি নয়—গালিচা। খুব দামী নরম গালিচা। তিনিও একপ্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য আমার কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। তবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম, তিনিও চুপ করে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা কইতে হল।

"সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরছি কিন্তু আপনার দেখা পাই নি কেন ভেবে আশ্চর্য লাগছে।"

"সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায় ?"

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হ'ল—চোখ দুটো জ্বলছে···মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

"একটা গল্প শুনুন তাহলে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনেছেন ?"

"না।"

"শোনবার কথাও নয়। দুজন রামপ্রতাপ ছিল—দুজনেই জমিদার—একজন সুদ-খোর আর একজন সুর-খোর।"

"সুর-খোর ?"

"হ্যাঁ—ওরকম সুর-পাগল লোক ও অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়িতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গানবাজনা শিখেছিলুম। বাংলাদেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয় নি তাঁর কাছে—গাড়িতে একজনের মুখে কথায় কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিগ্যেস করি তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু তা না করে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর একজনকে জিগ্যেস করলুম—রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন। তিনি বলে দিলেন সুদ-খোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি স্টেশনে নেমে দশ ক্রোশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশে। ডানকুনি স্টেশনে যখন নামলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও পূর্ণিমা। স্টেশনে নেমে আর-একজনকে জিগ্যেস করলাম। সুদ-খোর রামপ্রতাপ ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিগ্যেস করলুম সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে সোজা চলে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলেছিলাম তা ঠিক বলতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি—চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ—আর কোথাও কিচ্ছু নেই। মনে হল যেন শেষ নেই।

"কিছুদূরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড রাজবাড়িটা দেখা গেল, যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল—সাদা ধবধব করছে, মনে হল যেন মর্মর পাথর দিয়ে তৈরি। মিনার,

মিনারেট, গম্বুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের দুপাশে দেখি দুজন বিরাটকায় দারোয়ান বসে আছে—দুজনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে ব'সে। ভিতরে ঢুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোনো উত্তরই দিলে না, গোঁফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্তত করে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলে না। ভিতরে ঢুকে দেখি—বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ি জমজম করছে ; প্রকাণ্ড কাছারি বাড়িতে বসে আছে সারি সারি গোমস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুনছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে ব'সে আছে—সবারই গম্ভীর মুখ। সামনে চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি! সবাই কিন্তু চুপ-চাপ, কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে ক'রে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হল না কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে। আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছে রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু—হঠাৎ দেখতে পেলাম কিছু-দূরে ছোট্ট একটা বাগান রয়েছে—বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধবধবে সাদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। গড়গড়ায় কুণ্ডলী-পাকানো নলের জরিগুলো জ্যোৎস্নায় চকমক করছে। বাগানে ছোট একটা গেট, গেটের দুধারে উর্দি-চাপরাশ-পরা দুজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে--ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কেমন করে জানি না, আমার দৃঢ় ধারণা হল ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দুজন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিল না। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

"তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আস্তে আস্তে বললাম—হুজুরকে গান শোনাব বলে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

"তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারী কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধ'রে যে সে-আলাপ চলেছে তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁশ হ'ল তখন দেখি, এক ছড়া মুক্তোর মালা তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন?" কুটিরের ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন এক ছড়া মুক্তোর

মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখি নি কখনও।

"তারপর?"

"আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি রাজবাড়ি, কাছারি, চৌতারা, লোকজন—কোথাও কিছু নেই—ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি।

"একা? কি রকম?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদখোর ব্যাটা। তার বাড়ির পথই সবাই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বকশিশ দিয়ে গেলেন।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গান শুনবেন?"

"যদি আপনার অসুবিধে না হয়—"

"অসুবিধে আবার কি। সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জনবাস করছি—"

আবার উঠে গেলেন। কুটিরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বার করে বললেন—"বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।"

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনও শুনি নি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারি নি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা-ও জানি না, ঘুম ভাঙল যখন, তখন দেখি আমি সেই ধু ধু বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চরে বেড়াচ্ছে, মরে নি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলাম।

শিকার উপলক্ষ্যেই আমরা এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলোয় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্পটি আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর ?"

"তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—"

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দিকে দেখিলাম,—কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাশিকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথাকার লোক। চাপরাশি উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোনো লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড় একটা আসিতে চায় না—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

শেষ-কিস্তি

সেই সবে ডাক্তারি পাস করেছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং নিজের নৈপুণ্যে তখন অগাধ বিশ্বাস। রোগী একটা পেলেই হয়। সাজ-সজ্জা ক'রে রাস্তার ধারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। বুড়ো দীনু ডাক্তারেরই যত 'কল'—অথচ লোকটা যতদূর সেকেলে হতে হয়—অতি-আধুনিক আবিষ্কারের ধার ধারেন না কোনো। নাড়ী টিপে, জিব দেখে, পেট টিপে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর পদ্ধতিতেই বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ আমরা—যাক সে কথা। ওই দীনু ডাক্তারই আমাকে ডাকলেন একদিন তাঁর একটা 'কেসে'। সে 'কেসে' দুজন নামজাদা ডাক্তার এসেছিলেন। আমাকে ডাকা হয়েছিল রাত জাগবার জন্যে। রোগীর কাছে সর্বদা একজন কৃতবিদ্য ডাক্তারের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন সবাই। রাত্রির ভারটা আমার উপর দিয়েছিলেন দীনুবাবু। সম্ভবত আমার দাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল ব'লে।

গিয়ে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড। আশপাশের যত নামকরা ডাক্তার সবাই সমবেত হয়েছেন। কোলকাতা থেকে শুধু দুজন ডাক্তারই নয়, নার্সও এসেছেন। আমিও গিয়ে হাজির হলাম। অথচ ছেলেটির হয়েছে ম্যালেরিয়া—ম্যালিগনান্ট টাইপের অবশ্য—কিন্তু তবু ম্যালেরিয়ার জন্য এত ধুমধাম কেন বুঝলাম না। গ্রেন কয়েক কুইননিন দিলেই তো চুকে যেত।

সাড়ম্বর অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রে মোটা মোটা ফি নিয়ে বড় বড় ডাক্তাররা বিদায় নিলেন। ঠিক হ'ল একজন নার্স শয্যা-পার্শ্বে মোতায়েন থাকবেন, আমি থাকব পাশের ঘরে, দরকার বুঝলে আমাকে ডাকা হবে, তা ছাড়া দু-ঘণ্টা অন্তর নাড়ীও পরীক্ষা করতে হবে ঘড়ি ধ'রে—শ্বাস-প্রশ্বাসও গুনতে হবে। যাবার আগে দীনু ডাক্তার বলে গেলেন—"তুমি এখানে আসবার আগে, আমার সঙ্গে দেখা কোরো একবার···"

"আচ্ছা।"

রাত্রে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে নানারকম ইনজেক্শনের সরঞ্জাম ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লাম। দীনু ডাক্তার বাইরের ঘরে একা বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

"এস, বোসো। একটা কথা বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। পাল্‌স রেস্‌পিরেশন গোনা ছাড়া আর যেন কিছু করতে যেও না তুমি। কোনো ইন্‌জেক্‌শন-ফিন্‌জেক্‌শন দিও না যেন—"

"পাল্‌স্‌টা যদি খারাপ হয়, একটা স্ট্রিক্‌নিন্‌ বা ক্যামফার ইন্‌ ইথার দিলে ক্ষতি কি?"

"কিছু কোরো না—বদনাম হয়ে যাবে—"

মিনিটখানেক গড়গড়া টেনে বললেন—"ও ছেলে বাঁচবে না—"

"ম্যালেরিয়া হয়েছে, কুইনিন পড়ে গেছে, না বাঁচবার কোনো কারণ দেখছি না তো—"

"কিছুতেই বাঁচবে না। এর আগে ছ'টা মরেছে! ওর ছেলে বাঁচে না—"

"ছ'টা মরেছে!"

"হ্যাঁ। এক-একটা ছেলে জন্মায়, সাত-আট বছর বেঁচে থাকে, তারপর একটা কিছু হয় আর পট ক'রে ম'রে যায়। কোনোবারই চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি। মরে যাবার বছরখানেক পরেই আবার একটা ছেলে জন্মায়—বছর কয়েক বাঁচে—তারপর অসুখ হয় আর ম'রে যায়। আমার হাতেই ছ'জন গেছে—এটাও যাবে। খরচ করাতে আসে খালি—"

বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে তামাক টানতে লাগলেন।

আমার মনে হল বুড়োর বোধ হয় ভীমরতি হয়েছে। ছ'জন মরেছে বলে সপ্তমকেও যে মরতে হবে—একি একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি হল! আর কিছু যদি নাই করতে হয়, তাহলে শুধু শুধু আমাকে একশ' টাকা দেবার মানে কি? আমার মনে যাই হোক বাইরে চুপ করে রইলাম। বুড়োর সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি।

দুই

গভীর রাত্রে নার্স এসে ডাকলে।

গিয়ে দেখি খোকার বাবা—এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী বৃদ্ধ জগৎ সেন—বিছানার একধারে চুপ ক'রে ব'সে আছেন। তাঁর দিকে কটমট করে চেয়ে খোকা ব'লে চলেছে—"ডাক্তারের একশ টাকা আর নার্সের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও না, আমি

চলে যাই! কেন আর আটকে রেখেছ আমাকে, দিয়ে দাও শিগগির, আমি আর থাকতে পারছি না—শিগগির দিয়ে দাও—শিগগির দিয়ে দাও—"

বিছানা ছেড়ে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। দুজনে মিলে চেপে ধরতে হ'ল তাকে।

"শিগগির দাও—শিগগির দিয়ে দাও—"

যেন আট বছরের ছেলের কণ্ঠস্বর নয়—একজন প্রবীণ বুড়ো যেন খনখন ক'রে কথা বলছে। এ অবস্থায় হায়োসিন হাইড্রোবোম দেওয়া উচিত না মরফিন্ দেওয়া উচিত ভাবছি—এমন-সময় জগৎবাবু এক কাণ্ড করে বসলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বলে উঠলেন—"নবীনবাবু দয়া করুন আমাকে—আমি সুদ-সমেত পাই পয়সা সব শোধ করে দিচ্ছি—আপনি যাবেন না, থাকুন, দয়া করুন আমাকে—"

"না, জোচ্চোরের বাড়ি আমি থাকি না—"

"ওরে খোকা, বাবা আমার—"

আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন জগৎবাবু।

খোকা আবার ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল।

"শিগগির ফিস দিয়ে দাও এঁদের—"

"দিচ্ছি দিচ্ছি—"

আলুথালু বেশে উঠে পড়লেন জগৎবাবু। তাড়াতাড়ি 'সেফ' খুলে টাকা বার করে আমাকে আর নার্সকে দিলেন।

খোকা যেন তৃপ্ত হয়ে চোখ বুজল।

সে চোখ আর খুলল না।

মালা-বদল

গভীর রাত্রি। আকাশে জ্যোৎস্নার পাথার। একরাশি ছোট ছোট সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে একধারে। একরাশি শুভ্র চন্দ্রমল্লিকা যেন।

দ্বিতলের বাতায়নে বন্দনা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একা। আজ তার জীবনের পরম রাত্রি। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে। ঠিক প্রথম নয়, তবু প্রথম। বাসরঘরের ভিড়, ফুলশয্যার অস্বাভাবিকতা, সমাজের কলরব সমস্ত চুকে গেছে। আজই প্রথম প্রকৃত মিলন-রাত্রি।

নিরালা জ্যেৎস্না-যামিনী নিবিড় হ'য়ে আসছে।

চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—

ধাপে ধাপে স্বর চড়িয়ে ডেকে উঠল পাখিটা। জ্যোৎস্নায় শিহরণ লাগল। খোঁপা থেকে বেলফুল প'ড়ে গেল একটা। ফুলটা হাসছে।

আকাশের ছোট ছোট মেঘগুলি রূপান্তরিত হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকার রাশি নেই, এক জোড়া রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে পাশাপাশি। স্বপ্নলোক যেন।

স্বপ্নলোকই তো। বন্দনার স্বপ্ন সফল হয়েছে, অমন রূপবান গুণবান স্বামী তাকেই পছন্দ করেছেন। বাংলাদেশে মেয়ের অভাব ছিল না। কত রূপসী, কত বিদুষী, কত ধনীর দুলালী এসেছিল ভিড় করে। কিন্তু তার সুরের কাছে পরাভব মানতে হয়েছিল সবাইকে।

একটা সূক্ষ্ম গর্ব গোলাপী নেশার মতো সঞ্চারিত হতে লাগল তার মনে। হবে না? মনে পড়ল কী কৃচ্ছ্রসাধনই না সে করেছে। সেতার, এস্রাজ, বীণ। দিবারাত্রি গলা সাধা। তানপুরার সঙ্গে বড় বড় রাগরাগিণীর আলাপ। জীবনে আর তো কিছুই সে করে নি। গত ষোল বৎসর সুরের সাধনাই করেছে কেবল একাগ্রচিত্তে। সুরের ঝরনাতলায় দেখা হল স্বামীর সঙ্গে। স্বামীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি ফুটে উঠতে লাগল মানস-পটে ধীরে ধীরে। আজ রাত্রে বাগেশ্রী আলাপ ক'রে শোনাবে সে। সেতারটা পাশের ঘরে এনে রেখেছে।

ঝন করে শব্দ হল একটা। সেতারের তারটা ছিঁড়ে গেল নাকি? ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল বন্দনা। পাশের ঘরের দরজায় একটি তন্বী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ রূপসী।

"আমি চললুম।"

"কে আপনি ?"

"তোমার গানের সুর। এতদিন আমাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলে তাই কাছে ছিলাম। এখন তুমি আর একজনের গলায় মালা দিয়ে তারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ। আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি চললুম।"

বন্দনাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল যেন। বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল বন্দনা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চোখ পড়ল। হংসমিথুন নেই। স্বচ্ছ-বসনা একটি পরী উড়ে চলেছে যেন অজানার উদ্দেশে। ওড়নাটা উড়ছে আকাশ জুড়ে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। পিছনের দিক থেকে চোখ দুটো টিপে ধরছে কে! নিঃশব্দচরণে স্বামী কখন এসে প্রবেশ করেছেন সে টের পায় নি।

দুই ভিক্ষুক

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে অন্ধ ভিখারীটি ব'সে থাকে। পোড়া-পোড়া কালো চেহারা। যেন ঝলসানো। অল্প কয়েকদিন হ'ল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এমন কি অন্যান্য ভিখারীরাও তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। রাস্তার একধারে ছেঁড়া কাপড়টি পেতে সসঙ্কোচে বসে থাকে শুধু নীরবে। তবু ভিক্ষা মেলে। কাশীতে পুণ্যার্থীর ভিড়, পুণ্যসংগ্রহের জন্যেই লোকে আসে এখানে, ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে না। নীরব ভিখারীটির ছেঁড়া কাপড়ও ভরে ওঠে রোজ নানাজনের নানা দাক্ষিণ্যে। আধলা, পয়সা, ডবল পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি এমন কি আধুলিও পড়ে মাঝে মাঝে। গোটা টাকাও পড়েছিল একদিন একটা। খাবারও জমে নানারকম। ভিখারী কিন্তু বসে থাকে নীরবে। অন্ধ চোখের দৃষ্টি নির্বিকার। গভীর রাত্রে রাস্তাঘাট নির্জন হলে ধীরে ধীরে ওঠে। কাপড়ের উপর সঞ্চিত সমস্ত জিনিস পুঁটুলি করে বেঁধে লাঠি ঠুকঠুক করে গঙ্গার ঘাটে যায়—তারপর গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিয়ে আসে সব। সে যা চায় তা পায় নি। কাপড়টি বিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন ব'সে থাকতে হবে কে জানে!

দুই

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ। পথ জনবিরল হ'য়ে এসেছে। আর-একটি ভিখারীর আবির্ভাব হল সেই পথে। ন্যুব্জদেহ স্থবির। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। মাথায় জট প'ড়ে গেছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ভিখারিটি এসে প্রথম ভিখারীর কাছে দাঁড়াল এবং নিজের ভিক্ষার থলিটি তার কাপড়ে উজাড় ক'রে ঢেলে দিলে। ঢেলে দিয়ে দাঁড়াল না। সহসা প্রথম ভিখারী পুলকিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল তার। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা হয়ে গেল…মাথার চুল সোনালী। চেহারাই বদলে গেল একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার করে উঠল—"আমায় ক্ষমা করে যাও মহারাজ, চলে যেও না। আমি ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি—"

ন্যুব্জদেহ ভিখারী ঘুরে দাঁড়াল।

সাহেব বলতে লাগল—"ক্ষমা করো আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় বসে আছি! অভিশপ্ত-জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে, ভারতবর্ষে ভিখারী-জীবন যাপন কর গিয়ে; যদি কোনোদিন তার হাতে ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে তাহলেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা করো মহারাজ…"

ন্যুব্জদেহ ভিখারীর মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তাহলে।

"মিস্টার হেস্টিংস? তোমাকে আমিও তো খুঁজছি জন্মজন্মান্তর ধ'রে। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি তা তোমাকে না জানানো পর্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই!"

"ক্ষমা করেছ?"

"নিশ্চয়!"

দেখতে দেখতে ন্যুব্জদেহ স্থবির ভিখারী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হল। ওয়ারেন হেস্টিংস আর মহারাজ নন্দকুমার পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রমাণ

ভদ্রলোক কোথা থেকে এসেছিলেন কেউ জানত না! বাইরের কোনো ভড়ং ছিল না। জটা, গেরুয়া, প্রাণায়াম, বক্তৃতা কিছু না। তিনি যে আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক তা কেউ সন্দেহও হয়তো করত না যদি না তিনি শহর ছেড়ে গঙ্গার ধারের পোড়ো বাড়িটাতে আশ্রয় নিতেন। প্রথম প্রথম লোকে অন্য রকমও ভেবেছিল। কেউ ভেবেছিল ফেরারি আসামী, কেউ ভেবেছিল গোয়েন্দা। উর্বর মস্তিষ্কের অভাব নেই। নানাবিধ কল্পনা করেছিল লোকে। কিন্তু অনেকদিন কেটে যাবার পরও যখন চমকপ্রদ কিছু ঘটল না, তখন সবাই মানতে বাধ্য হ'ল লোকটা ভালোই সম্ভবত—সাধু-সন্ন্যাসী-গোছ কিছু একটা হবে। কিন্তু লোকেদের এ ধারণাকেও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। কেউ হাত দেখাতে এলে বলতেন—আমি কিছু জানি না। দৈব ঔষধ চাইতে এলে বলতেন—জানি না। ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বলতেন—জানি না। উদ্ধতভাবে বলতেন না। অত্যন্ত সসঙ্কোচে মৃদুকণ্ঠে বলতেন। কৌতূহলী জনতা বার বার তাঁর কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে নিরস্ত হয়েছিল শেষটা।

নিরস্ত হন নি কেবল হারাধনবাবু। তিনি ফাঁক পেলেই যেতেন। এই অনাড়ম্বর নির্জনতাপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট লোকটিকে বড় ভালো লাগত তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন। তাঁর কেবলই মনে হ'ত লোকটির মধ্যে ঐশ্বর্য আছে কোনো। কি ঐশ্বর্য আছে জানবার চেষ্টা করেন নি কোনো দিন। কাছে গিয়ে বসলেই সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠত। কথাবার্তা অল্পই হ'ত। যা হ'ত তাও অতি সাধারণ। যুদ্ধের কথা, দুর্ভিক্ষের কথা—এই সব। ভগবদ্-প্রসঙ্গ একদিন উত্থাপন করেছিলেন হারাধনবাবু।

"আচ্ছা, ভগবানের সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার—"

"কি বলব—"

একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

"আপনি কখনও কিছু দেখেন নি?"

"আমি? আপনি যা দেখছেন আমিও তাই দেখেছি। আকাশ-সমুদ্র-নদী-প্রান্তর-ফল-ফুল-সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রময় বিরাট বিচিত্র চেতনা—এর বেশী আর তো কিছু দেখি না।"

"এই তাহলে ভগবান ?"

"কি জানি।"

সসঙ্কোচে চুপ ক'রে রইলেন।

কিছুক্ষণ ব'সে থেকে হারাধনবাবু উঠে এলেন।

ফিরবার পথে নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। নরেনবাবু বিদ্বান লোক।

"কোথা গেছলেন হারাধনবাবু ?"

"গঙ্গার ধারের সেই সাধুটির কাছে।"

"কে সাধু ? সেই পোড়ো বাড়িটাতে থাকে যে লোকটা ?"

"হ্যাঁ।"

"সে সাধু কে বললে আপনাকে ! আস্ত ইডিয়ট একটা। পাছে বিদ্যে ফাঁস হয়ে যায় ব'লে পারতপক্ষে কথা বলে না। বোগাস্ !"

হারাধনবাবু মৃদু হাসলেন একটু। নরেনবাবুর সঙ্গে তর্ক করবার সামর্থ্য নেই তাঁর।

নরেনবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তাঁর সাধুত্বের প্রমাণ পেয়েছেন কোনো ?"

"না।"

"তবে ?"

হারাধনবাবু চুপ করেই রইলেন।

এই ভাবেই কাটছিল। হারাধনবাবু তবু সময় পেলেই যেতেন তাঁর কাছে। আর সকলের কৌতূহল ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, হারাধনবাবুরই হয় নি।

কিন্তু কিছুদিন পরে হারাধনবাবুও যাওয়া বন্ধ করলেন। অন্য কোনো কারণে নয়, তাঁর একমাত্র ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল ব'লে। তারই চিকিৎসা ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে অন্য কোনো দিকে মন দেবার অবসরই পান নি তিনি। ছেলের অসুখ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে লাগল। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করেন নি তিনি। সাধ্যের অতীত হ'লেও শহরের সমস্ত নামজাদা চিকিৎসকদের একত্রিত ক'রে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলছিলেন। অসুখ কিন্তু বেড়েই চলল। দিন কাটে তো রাত কাটে না। একদিন বিকেলে ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেলেন। আশা নেই, রাত কাটবে কিনা সন্দেহ। বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হারাধন পুত্রের মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসে চতুর্দিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই

দেখতে পেলেন না। হঠাৎ সেই সাধুটির কথা মনে পড়ল। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রাত তখন অনেক হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মেঘের স্তর ভেদ করে সবে উঠেছে। গঙ্গার জল কূলে কূলে ভরা। হাওয়া উঠেছে একটা। কল-কল ধ্বনিতে গঙ্গাতীর মুখরিত। হন্তদন্ত হারাধন পোড়ো বাড়িটাতে এসে হাজির হলেন। দেখলেন সাধুটি জেগেই আছেন। গঙ্গার ধারটিতে চুপ করে বসে আছেন তন্ময় হয়ে।

"আমার ছেলেকে বাঁচান আপনি—"

তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন হারাধনবাবু।

"কে, হারাধনবাবু! ও কি—উঠুন—উঠুন—কি হয়েছে—কি ?"

সব শুনলেন। শুনে বললেন—"আমি কি করব বলুন—আমার কি ক্ষমতা আছে—"

হারাধনবাবু অবুঝের মতো কাঁদতে লাগলেন।

"দয়া করুন, দয়া করুন, আমার একমাত্র ছেলে—"

সাধু চুপ করে রইলেন।

"বাঁচবার কোনো উপায় নেই ? কোনো আশাই নেই ?"

"তার আয়ু যদি নিঃশেষ হয়ে থাকে—" এই পর্যন্ত ব'লে আবার নীরব হলেন তিনি।

হারাধনবাবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

"আমার একমাত্র ছেলে। কিছু একটা করুন আপনি। ইচ্ছে করলেই আপনি পারেন। সত্যি কোনো উপায় নেই—নিশ্চয় আছে কিছু—দয়া করুন আপনি—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধু বললেন—"শুনেছি অপরে কেউ যদি নিজের আয়ু দান করে তাহলে নাকি আয়ুহীন লোক বাঁচতে পারে কিছুদিন। কিন্তু তা কি করে সম্ভব ?"

"আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন—দয়া করুন।"

সাধুর পায়ে ধ'রে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন হারাধনবাবু।

বিব্রত সাধু নিজের পা সরিয়ে নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "ভগবানকে ডাকুন, তিনি যদি দয়া করেন সব হতে পারে। তিনিই একমাত্র ভরসা, তাঁকেই ডাকুন। আমরা কে—"

অনেক ক'রে বুঝিয়ে হারাধনবাবুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

হারাধনবাবু বাড়ি ফিরে দেখলেন ছেলের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখে বিস্মিত হলেন—নাড়ির অবস্থা ফিরেছে, আর ভয় নেই। ক্রমশ ভালোর দিকে যেতে লাগল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ যখন কাটতে শুরু করে তখন যেমন দেখতে দেখতে সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়, হারাধনবাবুর ছেলের অবস্থা তেমনি দেখতে দেখতে ভালো হ'য়ে উঠল। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তারেরা বললেন—"আর ভয় নেই, টালটা সামলে গেছে। এ যাত্রা বেঁচে যাবে বলেই মনে হচ্ছে।"

উল্লসিত হারাধনবাবু সাধুটিকে খবর দিতে ছুটলেন। সেখানে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেলেন না। ডাকলেন—সাড়া পেলেন না। ভিতরে ঢুকে দেখলেন আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আবার ডাকলেন, উত্তর পেলেন না। ঠেললেন—তবু সাড়া নেই। গায়ের চাদরটা সরিয়ে চমকে উঠলেন। প্রাণহীন মৃত-দেহটা পড়ে আছে শুধু—মুখে অদ্ভুত একটা প্রশান্ত হাসি।

অধরা

অন্ধকারে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাঠে। সে-ও সঙ্গে ছিল। তার অঙ্গসৌরভ, বলয়-নিক্কণ, নিশ্বাসের মৃদু শব্দ সমস্তই অনুভব করছিলাম। পাশাপাশি ছিল, অতিশয় কাছাকাছি। মুখে কথা ছিল না। আমারও না, তারও না। আলাপ বন্ধ ছিল না তবু। দুজনেই কথা কইছিলাম। কিন্তু নীরবে। তার সমস্ত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল আমার কল্পনায়। তাই যখন নীরব ভাষায় সে আমাকে প্রশ্ন করলে—"আমাকে তুমি তো কখনও দেখ নি, তবু চাইছ কেন এত করে?"

তখন আমি অসঙ্কোচে উত্তর দিলাম—"তোমাকে আমি জানি।"

"কি ক'রে জানলে?"

"কি ক'রে তা জানি না, কিন্তু জানি।"

নিবিড়তর হয়ে উঠল অন্ধকার।

পাশাপাশি হাঁটলাম অনেকক্ষণ…কতক্ষণ মনে নেই। মনে হচ্ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।…সহসা তার একটা নীরব প্রশ্ন সঞ্চারিত হল আমার মনে।

"এত ক'রে চাইছ যদি নিচ্ছ না কেন?"

"ধরা দিলে কই?"

মদিরতর হয়ে উঠল তার অঙ্গ-সৌরভ।

মনে হ'ল তার চকিত দৃষ্টির চাহনি বিদ্যুতের মতো চিরে চ'লে গেল অন্ধকারকে। চতুর্দিক বিদ্যুতায়িত হ'য়ে উঠল ক্ষণকালের জন্য।

"সর্বদা ধ'রে রেখেছ, তবু বলছ ধরা দিই নি!"

"আমি যেখানে চাই সেখানে দাও নি।"

"কোথায় চাও?"

"ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে।"

দ্রুততর হ'য়ে উঠল তার নিশ্বাস। স্পন্দিত হ'য়ে উঠল অন্ধকার…মনে হল খুব

কাছে স'রে এসেছে···তার চোখের জল গালে পড়ল আমার···এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল···বরফের মতো ঠাণ্ডা···

সহসা সচেতন হলাম, বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির দিকে ফিরলাম। সে-ও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি···সে-ও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে। সহসা অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন···তার ভিজে শাড়ির স্পর্শ পেলাম মনে হ'ল।···পাশাপাশি ছুটে চলেছি। নির্জন পথ উর্ধ্বশ্বাসে পার হলাম নীরবে।—তারপর সুদীর্ঘ গলিটা। নীরন্ধ্র অন্ধকার। গলির শেষে আমার প্রকাণ্ড নির্জন বাড়িটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনই গ্রাস করবে আমাকে। দ্রুতপদে বারান্দায় উঠলাম। সে-ও উঠল। ঘুরে ঢুকলাম, সে-ও ঢুকল। সুইচ টিপলাম তাড়াতাড়ি—তীব্র আলোয় ভ'রে উঠল চতুর্দিক। দেখি, কেউ নেই।

প্রজাপতি

নীল-শেড-দেওয়া ইলেকট্রিক বাতিটার উপর কয়েকদিন থেকে একটি প্রজাপতি এসে বসছে। যতক্ষণ আমি টেবিলে ব'সে লেখা-পড়া করি ও শেডটির উপরে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। আশা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে ওই আমার সন্ধ্যাবেলার সঙ্গী হয়েছে।

বন্ধু সোমেশ্বর এসে প্রবেশ করলে। ইদানীং প্রায় আসছে। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। ওর বোন বেলার সম্বন্ধে আজকাল যে একটু দুর্বলতা পোষণ করছি সেটা ও টের পেয়ে গেছে। বেকায়দায় প'ড়ে গেছি। সোমেশ্বর এসেই কাজের কথা পাড়লে একেবারে।

"বেলার সম্বন্ধে কি ঠিক করলে ?"

চুপ ক'রে রইলাম।

"যা হোক একটা ঠিক করে ফেল ভাই"—তারপর একটু থেমে বললে—"শেষ পর্যন্ত বিয়ে তো করবেই, সবাই করে, বেলাকে যদি কর আমি নিশ্চিন্ত হই। বেলা তোমাকে ভালোও বাসে—"

সবই ঠিক—তবু চুপ করে রইলাম। আশা যখন বেঁচে ছিল তখন তাকে বলেছিলাম যে আর কখনও বিয়ে করব না—এখন বুঝতে পারছি বিয়ে করতে হবে—বেলাকেই করতে হবে—কিন্তু দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না কিছুতেই।

"চুপ ক'রে আছ কেন? তোমার সত্যি যদি মত না থাকে আমি জোর করতে চাই না। খুলে বলো সেটা। তাহলে দ্বিজেনের সঙ্গে চেষ্টা করি। তুমি রাজী হ'লে অবশ্য আর কোথাও যাব না আমি। দ্বিজেনের ভাবভঙ্গী থেকে মনে হয় সে আপত্তি করবে না, তবে..."

ওই খোঁচা-গোঁফ-ওলা দ্বিজেন বেলাকে বিয়ে করবে !

ওর সে মতলব আছে না কি ?

বললাম—"দ্বিজেনের কাছে যাবার দরকার নেই। আমিই বিয়ে করব। তবে কিছুদিন সময় দাও ভাই।"

"তুমি কথা দিলে অপেক্ষা করতে পারি।"

চুপ করে রইলাম।

"কথা দিচ্ছ তো?"

"দিচ্ছি।"

"বেশ। বেলাকে সুখবরটা দিয়ে আসি তাহলে।"

সোমেশ্বর চলে গেল।

এরপর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য।

হঠাৎ আশার কণ্ঠস্বরে কে যেন ব'লে উঠল, "তাহলে আমার দায়িত্বও ফুরোল—আমিও চললাম।"

প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

একই ব্যক্তি

বাক্স খুলে তাঁর এই চিঠিখানা পেলাম।

শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবী

প্রাণাধিকাসু,

দেখ তো, মিছিমিছি আমায় এত ভাবিয়েছিলে। কত রকম 'হয়তো' যে এসে আমায় চিন্তিত করে তুলেছিল তার ঠিক নেই। বড় চিঠি না লিখলে উত্তর দেবে না? কত বড়? ক-হাত লম্বা ক-হাত চওড়া চিঠি চাও? শেলী, রবীন্দ্রনাথই তো তোমার প্রিয় কবি জানতাম, হঠাৎ 'মিলটনী' ফরমাশ করে বসছ কেন, বুঝতে পারছি না। যাক—চেষ্টা করব তবু।

রাগ করেছি কি না? তুমি এ অবস্থায় কী করতে! রাগের চেয়ে আমার ভয়ই বেশী হয়েছিল কিন্তু। আশার গা ঘেঁষে আশঙ্কাও থাকে যে। আমি কয়েকদিন থেকে রোজই তোমার চিঠি আশা করছি। দু-একদিন পোস্টাফিস পর্যন্ত গেছি। চিঠি না আসাতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল।

আচ্ছা, তোমার কাশি এখনও সারছে না কেন বল তো? কাশি একেবারে না সারা পর্যন্ত গান গেয়ো না। সেরে গেলেই গাইতে হবে কিন্তু। তুমি লিখেছ, "ভগবান বোধ হয় দয়া করে বিয়ের সময়টুকু পর্যন্ত গানের গলাটা একেবারে নষ্ট করে দেয় নি। ভগবানের অসীম দয়া। আজকাল ভাবছেন এখন আর গান দিয়ে কী দরকার......"

তোমার অসীম দয়াময় ভগবানকে বলো—প্রভু যা যা করবার তা তো করেইছ, এখন দয়া ক'রে তোমার দয়াটুকু ফেরত নাও, আমি একটু গান গেয়ে বাঁচি। না হয় তোমায় কিছু 'সিন্নি' দেব! তোমার এই করুণাময় ভগবানটির সঙ্গে আমার যে আলাপ নেই—থাকলে আমিই আমার সিমুর জন্যে অনুরোধ করতাম একটু। সেতার বাজানোটা ছেড়ে দিলে সত্যি সত্যি? টাকার জন্যে ভাবছ কেন? তোমার টিউটারের মাইনে আমি যেমন করে হোক পাঠাব। লিখেছ—পরে শিখব। কিন্তু আমার নিজের জীবনে দেখেছি যেটা পরে শিখব বলে ফেলে রেখেছি তা আর শেখা হয় নি। টাকার জন্যে ভেবো না তুমি, অত সঙ্কোচেরও দরকার নেই, অবিলম্বে আরম্ভ করো সেতার।

এখন রাত্রি অনেক। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। বারোটা বেজে গেছে বোধ হয়। বোধ হয় বলছি তার কারণ আমার প্রৌঢ় 'টাইম পীস'টি কেন জানি না হঠাৎ সাতটা এগারো মিনিটে থেমে গেছে। কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। পথ-চলতি পথিক যেন হঠাৎ কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে, কিংবা হঠাৎ কোনো স্মৃতি এসে মনের গতি-রোধ করে দিয়েছে ওর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, এই ঘড়ি যখন দোকানদারের গ্লাস-কেসে বন্ধ ছিল তখন হয়তো কোনো একটি সুন্দর সোনার হাতঘড়ি এর পাশে থাকত। দুজনের ভাবও হয়েছিল হয়তো। হয়তো ভেবেছিল কোনোদিন ছাড়াছাড়ি হবে না। সুন্দর স্বচ্ছ কাচের ঘরটিতে পাশাপাশি দিনের পর দিন কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন খরিদ্দার এসে হাজির। গরিব খরিদ্দার আমি কিনে নিলাম 'টাইম পীস্'টিকে। সোনার হাত-ঘড়ি গিয়ে অলঙ্কৃত করল কোনো ধনীর মণি-বন্ধ। আজ চাঁদনী রাত, আমার 'টাইম পীস্' হয়তো তার সঙ্গিনীর কথা ভেবে ৭টা ১১ মিনিটের ঘরে থেমে আছে—খেয়ালই নেই যে সময় বয়ে চলছে। থাক, একে আজ দম দিয়ে চালাব না। সোনার হাতঘড়িটিও কি এর কথা ভাবছে আজ?…অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। আমার কিন্তু জ্যোৎস্নার চেয়ে ঘনঘোর বর্ষা বেশি ভালো লাগে। "আজু মধু চাঁদনী প্রাণ উন্মাদনী"—সত্যি কথা, কিন্তু এর চেয়েও—

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া

এই অবস্থাটা আরও বেশি ভালো লাগে আমার। অনেক কবি চাঁদের সঙ্গে প্রিয়ার মুখের তুলনা করেছেন। আমার এতকাল প্রিয়া ছিল না, জিনিসটা পড়েই এসেছি, মন্দও লাগে নি। এখন কিন্তু সিমুর মুখের সঙ্গে চাঁদের কোনো রকম সাদৃশ্য আছে ভাবলেও রাগ হয়। একটুও নেই, থাকতেই পারে না। প্রথমত, চাঁদের আলো ধার-করা, সিমুর আলো সিমুরই। দ্বিতীয়ত, চাঁদ তার এই ধার-করা রূপ নিয়ে আকাশে সমস্ত রাত 'ধরনা' দিয়ে পড়ে আছে, খেয়ালী-হাওয়ায় ভেসে-আসা যে কোনো চলতি মেঘ তাকে জড়িয়ে ধরে যতক্ষণ খুশি থাকছে রূপালী নেশায় বিভোর হ'য়ে। চাঁদের এতটুকু লজ্জা-সরম নেই। এ যেন কোনো পথচারিণী অভিসারিকা

পাউডার-পমেড মেখে রূপের বেসাতি করতে বেরিয়েছে। এর সঙ্গে কি আম সিমুর লজ্জামাখা সুন্দর মুখখানির তুলনা সম্ভব? আমি চোখের সামনে মুখখা দেখতে পাচ্ছি যে। লজ্জা হ'লে আবার চোখে হাত দেওয়া হয়। আমার চোখে চোখে চেয়ে কতদিন কথা বল নি মনে আছে? এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়েছি তোমার। শুভদৃষ্টি পর্যন্ত কর নি—কম দুষ্টু নাকি তুমি। তোমার সঙ্গে চাঁদের তুলনা চলতেই পারে না। হ্যাঁ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটি কবি চাঁদে সম্বন্ধে বড় খাঁটি কথা বলেছেন। ভারতচন্দ্র। লোকটা সত্যিই প্রিয়াকে ভালোবাসত

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা
পদ-নখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥"

...আজ অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে।...কত কথা। এই গভীর রাত চারিদিকে জ্যোৎস্না, একা ঘর, বেচারী ঘড়িটি পর্যন্ত চুপ করে চেয়ে আছে, তা মৌন ব্যথিত দৃষ্টিতে যেন আমার মনের কথাটি ফুটে রয়েছে।

ঠিক এই মুহূর্তে তুমি আমার মনের কত নিকটে আছ...অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে...অথচ দুজনের দেহের মধ্যে প্রায় ৪০০ মাইল ব্যবধান। ব্যবধান সত্ত্বে কিন্তু মনে তোমাকে পেয়েছি, এসেছ তুমি আমার কাছে। দেখতে পাচ্ছি তুমি শুয়ে ঘুমচ্ছ...এলোমেলো কয়েকটা চুল কাঁপছে কপালের উপর...কান দুটি চুল দিয়ে ঢাকা...চোখ বুজে আমারই বালিশে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছ...

কুড়িবছর আগেকার চিঠি।

একি শুধু কথাই? মনের কথা নয়? কি জানি আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। বিয়ের পূর্বে এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, বিয়ে ক'রে দেখলাম ঠিক সে-রকমটি নন তিনি। কেমন যেন ভালোমানুষ গোছের। সর্বদাই আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর করবার জন্যে ব্যস্ত। তারপর ক্রমশ কতদিন কাটল। ক্রমশ কেমন বদলে গেলেন যেন। এখন মনে হচ্ছে ওঁকে চিনতে পারি নি। অথচ একসঙ্গে কুড়ি বচ্ছর একাদিক্রমে এক ঘরে বাস করেছি। এক বিছানায় শুয়েছি। এঁরই সাতটি সন্তানের জননী আমি। পাড়া-পড়শী আত্মীয়স্বজন সকলের চক্ষেই আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম। কিন্তু একথা আজ স্বীকার করছি, আমাদের মনের মিল হয় নি। উনি যে জগতের লোক ছিলেন, সে জগতে আমি অস্বস্তি বোধ

করতাম। চিঠিতে ওঁর যে কান্ত-কোমল রূপ ফুটে উঠেছে, আসলে কিন্তু সেরকম লোক ছিলেন না উনি। অত্যন্ত রাশভারি কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। পান থেকে চুন খসবার উপায় ছিল না। দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন এবং নির্জনে থাকতে ভালোবাসতেন। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললেও বিরক্ত হতেন। বকতেন, এমন কি মারধোরও করতেন। ছেলেমেয়েরা এর জন্যে কত বকুনি খেয়েছে, ঝি-চাকর কতবার লাঞ্ছিত হয়েছে। অসুস্থ হলে পশুরা যেমন নির্জন স্থান খুঁজে আশ্রয় নেয়, কারও সান্নিধ্য পছন্দ করে না, ওঁরও অবস্থা অনেকটা তেমনি ছিল। এক-আধ দিন নয়, সারাজীবনই উনি এমনিভাবে কাটিয়েছেন। অথচ শরীর ওর বেশ সুস্থই ছিল। কেন যে এমন করতেন জানি না। মোট কথা, আমি বুঝতে পারি নি ওঁকে। একটা জিনিস কিন্তু বলব—খুব কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে কখনও কোনো অকর্তব্য করেন নি। আমাদের আধিভৌতিক কোনো অসুবিধা ঘটতে দেন নি। যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমাদের কোনো কষ্ট ছিল না। মৃত্যুর পরও কোনো কষ্ট নেই। ছেলেদের মানুষ ক'রে গেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন, শহরে পাকা বাড়ি ক'রে গেছেন, লাইফ ইন্‌সিওরেন্স ক'রে গেছেন। সেদিক দিয়ে আমার কোনো কষ্ট নেই। তবে এতদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে একটা অভাব বোধ করছি বই কি। আর-একটা কথা। তিনি মুখে যদিও বলেন নি কিছু কখনও (চিঠিতে অত কথা লিখতেন, মুখে কিন্তু বলতেন না কিছু) তবু এটা আমি অনুভব করতাম যে তিনি আমাকে ভালোবাসেন। মৃত্যুদিনের সে ঘটনাটা ভুলব না কখনও।

ডাক্তারবাবু আসতেই বললেন, "চিকিৎসার জন্যে নয়—দেখা করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। চললুম—"

"কোথায় ?"

"কোথায় আবার। হুকুম এসেছে,—"

"ওসব কথা বলছেন কেন ? কোনো কষ্ট হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ, বুকের কাছে একটু। ওসব কিছু নয়, সিমু তুমি একটা গান গাও—"

"কোন্‌টা গাইব।"

"যেটা খুশি।"

ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন—"হ্যা, গান না।"

ধরলাম—"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে…"

গান শুনতে শুনতেই মারা গেলেন তিনি।

আজ নীলিমা আসবে। অত্যন্ত অধীর-চিত্তে তার প্রতীক্ষা করছি। নীলিমার অদ্ভুত ক্ষমতা, তার শরীরে নাকি প্রেতাত্মা ভর করে। যে-কোনো লোকের প্রেতাত্মা সে নাকি আনতে পারে। সেদিন বকুলমাসীকে আনিয়েছিল নাকি। বকুলমাসীর গলার স্বর নাকি অবিকল শুনতে পেয়েছিল তার ছেলেরা।

নীলিমার চোখমুখ হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে গেল যেন।

একি, এ যে ঠিক তাঁরই দৃষ্টি। নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে।

"আমাকে ডেকেছ কেন?"

অবিকল তাঁরই গলার স্বর।

একটু ইতস্তত করে বললাম, "আমাকে চিনতে পারছ না?"

"না।"

"একবারেই চিনতে পারছ না?"

"না।"

"আমাদের মনে পড়ে না তোমার?"

"না।"

"একটুও না?"

"না।"

তাজমহল

প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেন তখনও আগ্রা স্টেশনে পৌছায় নি। একজন সহযাত্রী বলে উঠলেন—ওই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

ওই যে—

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দ'মে গেলাম। চুনকাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো! ওই তাজমহল? তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল। শা-জাহানের তাজমহল।......অবসন্ন অপরাহ্নে বন্দী শা-জাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল।......আলমগীর নির্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি...মহাসমারোহে মিছিল চলেছে...সম্রাট্ শা-জাহান চলেছেন প্রিয়া-সন্নিধানে!...আর বিচ্ছেদ সইল না...শবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে... ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল...হয়তো এখনও আছে...ওই তাজমহলেরই পাশে। দারা সেকোর...

চুনকাম-করা সাধারণ মসজিদের মতো তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠে নি। জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউ-বীথি থেকে নয়—মনে হল যেন সুদূর অতীত থেকে, মর্মর-ধ্বনি নয়, যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মতো স্তূপীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ। শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল—সমস্ত মূর্ত হয়ে উঠল যেন সহসা-বিস্মিত চেতনাপটে। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ

চেকে রাজ-রাজেশ্বরী শাজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেক দিন কেটেছে।

কোন্ কনট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জন করে, কোন্ হোটেল-ওলা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওয়ালাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট পাইপ বিক্রি করে কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টোঙাগুলো কী ভীষণ ভীষণ ভাড়া নেয়—এ সব খবরও পুরানো হয়ে গেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, উষায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে আর চোখে লাগে না। চোখে পড়েই না। পাশ দিয়ে গেলেও নয়। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হ'য়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু—গোড়া থেকে শুনুন তাহলে।

সেদিন 'আউট-ডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃদ্ধ মুসলমান গেট দিয়ে ঢুকল। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে বেচারীর। ভাবলাম কেনো মেওয়া-ওলা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম ঝুড়ির ভেতর, মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে আছে একটি। বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা দাড়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম ক'রে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে—নিজের বেগমকে পিঠে ক'রে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে ব'লে। নিতান্ত গরিব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি ক'রে—

কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল। ক্যাংক্রাম্ অরিস! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। দূর থেকে পিঠে ক'রে ব'য়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার ইনডোরেও জায়গা নেই তখন। অগত্যা

হাসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম। বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ! অন্যান্য রোগীরা আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার এমন কি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজী হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্রি সেবা ক'রে চলেছে। সকলের আপত্তি দেখে সরাতে হ'ল বারান্দা থেকে। হাসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম। তাই থাকতে লাগল। হাসপাতাল থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইনজেক্‌শন দিয়ে আসতাম। এভাবেই চলছিল।

একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি 'কল' থেকে ফিরছি, হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। চাদরের তলায় রয়েছে বেগম সাহেব। নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠকঠক ক'রে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম—হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চলো আপাতত। বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে—এর বাঁচবার কি কোনোও আশা আছে হুজুর?

সত্যি কথাই বলতে হল—না।

বুড়ো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম। পরদিন দেখি গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে—সেদিনও কল থেকে ফিরছি—একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে বসে বসে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে নাকি? এগিয়ে গেলাম। কতকগুলো ভাঙা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।

"কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব—"

বৃদ্ধ স-সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

"বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।"

"কবর?"

"হাঁ হুজুর।"

চুপ করে বসে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি থাক কোথায়?"

"আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব-পরবর।"

"দেখি নি তো কখনও তোমাকে। কী নাম তোমার?"

"ফকির শা-জাহান।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হিসাব

দুই আর দুই যোগ করে যতক্ষণ চার হয় ততক্ষণ কোনো গোল থাকে না। কিন্তু যদি কোনো কারণে তা না হয় তাহলেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। পদির ব্যাপারে তেমনি বিভ্রান্ত হয়ে আছি।

ভালো নাম পদ্মাবতী, ডাক নাম পদি।

অত্যন্ত গরিবের মেয়ে। উপযুক্ত সহৃদয় আত্মীয়স্বজন এমন কেউ নেই যে 'ভার' নেয়। গরিবের মেয়ে হলেই বাধ্য হ'য়ে গৃহকর্মনিপুণা হ'তে হয়। তা না হ'লে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, রান্না করা, উঠোন ঝাড়-দেওয়া, ঘর-নিকানো, গোয়াল-পরিষ্কার-করা কে করবে। পদি নিজের ঘরের কাজ তো সব করতই, পাড়াপড়শীর ফরমাশও শুনত। কারো বড়ি দিয়ে দিচ্ছে, কারো সেলাই করে দিচ্ছে, কারো ছেলে আগলাচ্ছে। মামাদের অবস্থা একটু ভালো। কিন্তু তাঁরাও এমন লক্ষী মেয়ের 'ভার' নিতে চান না। পাত্র কোথায়? তা ছাড়া চারদিকেই লকলক করছে আগুন—ঘৃত-কুম্ভের ভার নেবে কে?

দুই আর দুই যোগ করে ঠিক চার হয়ে যাচ্ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

পদির নামে একটা কলঙ্ক রটল, পাড়ায় দু-একটা ছোঁড়া তাকে ইশারাও করল। —চলছিল। হিসেবে ভুল হয় নি।

আমরা জানতাম পদির বিয়ে হবে না এবং শেষ পর্যন্ত—সম্ভাব্য পরিণতি-গুলোকে স্পষ্টরূপে আর ভাববার চেষ্টা করতাম না। তবুও সেগুলো বিভ্রান্ত করে নি আমাদের, কারণ সেগুলো সব দুই আর দুইয়ে চারের পর্যায় হিসেবের মধ্যেই।

হঠাৎ একদিন কিন্তু আচমকা এমন একটা কাণ্ড ঘটল যার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

গ্রামেরই ছেলে রামচরণ ছুটিতে একদিন গ্রামে ফিরে এল। রামচরণ নামটা যেমন ঘষা-পয়সার মতো, লোকটা তেমন নয়। বেশ জাঁদরেল লোক। রাজ-সরকারে হাজারখানেক না হাজার দেড়েক টাকা মাইনে পায়। ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া চড়ে না। প্রত্যেক ছেলের জন্য একজন ক'রে আয়া আছে। চার ছেলে, চার মেয়ে। হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হবার পর এই রামচরণ একদিন দেশে ফিরে এল এবং শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—ওই পদিকে বিয়ে ক'রে বসল।

আমরা চমকে গেলাম বটে কিন্তু অঙ্ক ক'ষে দেখলাম হিসেবে ঠিক মিলেছে। পদ্মাবতী রূপসী ছিল। অবিশ্বাসী মন অবশ্য বাজে তর্ক তুলেছিল দু-একটা। পদ্মার চেয়ে বেশী রূপসী আর-একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল তার, নিখুঁত সুন্দরী সে, বংশও ঢের ভালো, ধ'রেও ছিল তারা খুব—তবু রামচরণ পদ্মাকেই পছন্দ করলে কেন? পছন্দ-অপছন্দর নিগূঢ় হেতুটা কি? মনের এসব বাজে কৌতূহলকে অবশ্য প্রশ্রয় দিই নি। পছন্দ হয়েছে বিয়ে করেছে—দুই আর দুইয়ে চার-এর আবার 'কেন' কি!

পদিকে বিয়ে করাতে রামচরণ দেব-পদ-বাচ্য হয়ে উঠল প্রায়। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পদি খুব খুশী। এক-গা গয়না, দামী কাপড়, জামা, মাথায় চওড়া সিঁদুর, একমুখ হাসি, তার আলাদা রূপই খুলে গেল একটা।

যাবার দিনে স্টেশনে গেলাম সবাই। রিজার্ভ ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি—ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটাকে। রামচরণ উঠে বসল। ছেলেমেয়েরা পাশের কামরায় ছিল। পদি উঠেই এক কাণ্ড ক'রে বসল। উঠেই উপরের দিকে চেয়ে 'আঃ' বলে চীৎকার ক'রে উঠল সে। তারপরই অজ্ঞান। সমস্ত দেহ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। মুখের সমস্ত হাসি মিলিয়ে গেল—ফুটে উঠল আতঙ্ক। উপরের দিকে হাত জোড় ক'রে বলতে লাগল,—আমার কোনো দোষ নেই, আমাকে জোর ক'রে বিয়ে করেছে, আমি কিছু বলি নি—কিছু কোরো না, তোমার পায়ে পড়ি···।

সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল সে।

ভূত?

আজকাল ভূত বিশ্বাস করে না কি কেউ!

বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা পদির অবচেতন মন বিশ্লেষণ ক'রে যখন দুই আর দুইয়ে চার করবার চেষ্টায় ছিলেন, তখন আর-এক কাণ্ড ঘটল।

ছোট্ট একটা মাদুলি প'রে পদি সেরে গেল হঠাৎ।

নিমগাছ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।

কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই···

কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক···দাঁত ভালো থাকে।

কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশী হন।

বলেন—"নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।"

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ—সে আর-এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল,—"বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি···কী রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার···একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে বাঃ—"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চ'লে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

এপার ওপার

মেয়েটি কালো। যৌবনসীমা পার হয়েছে। তবু সুন্দরী। চোখে মুখে শ্রী আছে। দৃষ্টিতে ভাষা আছে। আমরা যখন গেলাম তখন সে ডিম ভাজবার আয়োজন করছিল আমাদেরই সংবর্ধনার জন্য। কাছেই হার্মোনিয়ামটা রয়েছে। তার পাশেই রয়েছে ফুটফুটে ছোট্ট একটি ছেলে। তার ছেলে নয়, পাশের বাড়ির ছেলে। আমরা গিয়ে বসলাম। মেয়েটি আমাদের দিকে একনজর চেয়ে ছেলেটির সঙ্গেই কথাবার্তা কইতে লাগল।

"ডিম খাবি একটু ?"

"না।"

"খা না, খেলে জাত যাবে না।"

"খাব না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে গান শুনিয়ে দে এঁদের।"

রাজী হ'ল না। অনেক সাধ্যসাধনা করলে সে—কিছুতেই হ'ল না।

"কাল যে তোকে অত ক'রে শেখালাম গানটা, ভুলে গেলি এর মধ্যে ?"

ছেলেটি উশখুশ করতে লাগল। দ্বারের দিকে চাইলে একবার।

মেয়েটি আমাদের দিকে চেয়ে বললে—"আপনারা এসেছেন ব'লে লজ্জা পাচ্ছে। তা না হ'লে আমার কথা ও খুব শোনে"

ঝি-জাতীয় কে একজন উঁকি দিলে দ্বারপ্রান্তে।

"আমাদের বাড়ির খোকন এখানে এসেছে? ও মা, এই যে! আমরা চারিদিকে খুঁজে অস্থির। এখানে আসা কেন এমন সময়ে—চল।"

"আমিই ডেকে এনেছিলাম। যাও, বাড়ি যাও।"

উঠে চলে গেল। মেয়েটির মুখখানা কেমন যেন একটু বিমর্ষ দেখাল। আমাদের দিকে ফিরে বললে—"ও আমাকে খুব ভালোবাসে, জানেন।"

ডিম ভাজতে লাগল।

নীরবে কাটল কিছুক্ষণ।

কাপ্তেন একটি ছোট বোতল, কিছু মাংস এবং পাউরুটি নিয়ে প্রবেশ করলে। এসে বললে—"ঘুগনি ক'রে রেখেছ তো?"

"হ্যাঁ"

খাওয়া শুরু হ'ল। ঘুগনি খুব চমৎকার হয়েছিল। প্রশংসা করলাম।

একজন বললেন—"ও খুব ভালো রাঁধতে পারে। সেবার—"

রান্নার গল্প শুরু হয়ে গেল। বিরিয়ানী-কাবাব-কোপ্তার নয়, মধ্যবিত্ত রান্নার। চচ্চড়ি, স্থকতো, মোচার ডালনা, মাছের ঝাল, বেগুনের টক, খিচুড়ির গল্প আর শেষ হয় না। অথচ আমরা শুনতে গেছি গজল।

...গজল অবশ্য হ'ল দু-একখানা।

তারপর কথায় কথায় উঠে পড়ল তার বাড়ির কথা। উঠে পড়তেই সে হার্মোনিয়াম ছেড়ে বাড়ির গল্প শুরু ক'রে দিলে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি তার। বাড়িতে বিধবা মা আছে, বৌদি আছে, খোকন আছে, বুধী গাই আছে। কত গল্প। একটা পল্লীকে মূর্ত করে তুললে যেন চোখের সামনে।

"পাড়ার লোক আমায় খুব ভালবাসে, জানেন। একবার আমার অসুখ করেছিল, পাড়ার সকলের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। নায়েবমশাই কাছারি থেকে উঠে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন, পুরুতমশাই রোজ শিবের মাথায় বেলপাতা দিতেন, ডাক্তারের তো কথাই নেই—রোজ তিনবার চারবার আসতেন। কত রকম ওষুধ, ইনজেক্শন। আমার মায়ের একটু শুচিবাই আছে, জানেন। বিলিতি ওষুধ ছুঁতেন না কিছুতে। বৌদি পাটের কাপড় পরে ওষুধ খাওয়াতেন আমাকে—"

"ও সব বাজে কথা ছেড়ে তুমি সেই গজলটা ধর দিকি।"

আদেশ করলেন কাপ্তেন।

মুখের হাসি যেন নিবে গেল তার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। নামজাদা বাইজি অলকা। অলক দুলিয়ে মুচকি হেসে আবার শুরু ক'রে দিলে—"তেরি নজরিয়া—"

বিয়েবাড়ি।

বাড়ির বড়বউ স্থষমার একমুহূর্ত অবসর নেই। রান্নার সমস্ত ভার তার উপর। আধময়লা কাপড়ে হলুদের ছোপ লেগেছে, চুলগুলোও বাঁধা হয় নি ভালো ক'রে। উহুন কামাই যাচ্ছে—দ্রুতবেগে তরকারি কুটছে সে। কোলের ছেলেটা কোল

পায় নি সমস্ত দিন, কাছে বসে ঘ্যান-ঘ্যান করছে। মাছও কোটা হয় নি এখনও।

"ও ঝি, মাছগুলো কুটে দে না মা—কখন যে কি হবে—"

সুষমার দশ বছরের মেয়ে পুঁটি ছুটে এল উর্দ্ধশ্বাসে। উদ্ভাসিত মুখ তার।

"ও মা—মোটর এসে গেছে। আমাদের শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। দেখবে? এস না!"

সুষমা তরকারি ফেলে রেখে ছুটল।

তার শোবার ঘরে অনেকেই এসে জুটেছে। যমুনা, মিনু, পদি, রুবি—আরও অনেকে। জানালা দিয়ে আসরটা বেশ দেখা যায়। আসর লোকে লোকারণ্য। ওই যে নামছে মোটর থেকে। বাঃ কি সুন্দর! রং কালো কিন্তু কী অপূর্ব মুখশ্রী। শাড়িটা কি চমৎকার, কি মানিয়েছে! ওমা, শ্বশুর নিজে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করছেন। ভটচাজ্জিমশায় নমস্কার করলেন হাত তুলে সসম্ভ্রমে! করবে না? কত গুণ ওর। আসরের অনেকেই উঠে দাঁড়াল। কেউ ত্রস্ত, কেউ মুগ্ধ। মহিমার দ্যুতি বিকিরণ করে অলকা দেবী আসরে প্রবেশ করলেন।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুষমা।

যমুনা বললে—"আমরাও ওরই মতো মেয়েমানুষ, কিন্তু কত তফাত দেখ দিকি। দাসীবৃত্তি করতে করতেই জীবন কাটল আমাদের।"

"পোড়া কপাল আর কি!"—রুবি বললে।

সুষমার মনে পড়ছিল নিজের কৈশোর জীবনের কথা। তার বাবাও ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছিলেন তাকে। খুব ভালো গান শিখেছিল সে। কত প্রশংসা করত সবাই তার গানের।…সভায় সমিতিতে সর্বত্র গান গেয়ে বেড়িয়েছে সে বিয়ের আগে। বাজনাও শিখেছিল কত রকমের। সেতার, এস্রাজ, বেহালা, ব্যাঞ্জো…জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাজনা শুনে মেডেল দিয়েছিলেন একবার। ফুলের মতো ফুটে ফুলেরই মতোই ঝ'রে গেল জীবনের সে দিনগুলো।…কোথায় গেল?…

হঠাৎ সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ জাগল যেন তার। অলকা দেবী গান ধরেছেন। ঠাকুরপোর বিয়েতে একে এনে খুব ভালো হয়েছে। কি চমৎকার গলা। স্বপ্নলোকে উড়ে গেল সে যেন সহসা।…

"ও বৌমা, উহুনের আঁচ যে ব'য়ে গেল। কি করছ তুমি এখানে?"
শাশুড়ী প্রবেশ করলেন।

"এই যে যাই।"

স্বগৃহিণী সুষমা মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

কেন

ছেলে হয় আর মরে।

ডাক্তার কবিরাজ সবাই হার মানলেন।

চতুর্থ শিশুর মৃত্যুর পর বাপ-মা লক্ষ্য করলেন যে প্রত্যেকের চেহারা প্রায় একরকম। একটি শিশুই যেন বার বার আসছে আর চলে যাচ্ছে।

কেন? কি চায় ও? যত্ন হচ্ছে না?

পঞ্চম শিশু যখন হ'ল আঁতুড়ঘরেই শৌখিন জামা, নূতন বিছানা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হ'ল তাকে।

বাঁচল না।

অনেকে বললেন ব্রাহ্মণভোজন করালে ফল হবে।

ষষ্ঠ শিশুর জন্মদিনে ধুমধাম করে ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হ'ল। এমন কি রোশনচৌকি পর্যন্ত বাজল।

বাঁচল না।

অজ্ঞাত কোনো পাপ আছে না কি সঞ্চিত?

সপ্তম শিশুর জন্মের পর প্রায়শ্চিত্ত করানো হ'ল যথাবিধি।

তবু বাঁচল না।

ঠিক একই রকম চেহারার শিশু কখনও ছেলে হ'য়ে কখনও মেয়ে হ'য়ে আসছে আর চলে যাচ্ছে।

মায়ের চোখের জল শুকোয় না।

বাপ যাকে পায় প্রশ্ন করে—কেন?

অষ্টম সন্তান হ'য়ে গেল, বাপ বললে—ওকে এবার শাস্তি দিয়ে দেব, আর যেন না আসে। আর পারি না আমরা—

মরা শিশুর হাতের এবং পায়ের সব আঙুলগুলো মুড়িয়ে কেটে দিলেন। নবম শিশু গর্ভে এল তবু। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠও হ'ল। একটি কন্যা। মুখ অবয়ব সেই একরকম, কিন্তু হাতে পায়ে একটিও আঙুল নেই। এ ম'ল না।

এখনও বেঁচে আছে।

কেন?

সহধর্মিণী

বীরেন্দ্রবাবু বিখ্যাত শিকারী।

তাঁহার বন্দুকের গুলিতে কত প্রাণী যে নিহত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তিনি যে সত্যই শিকারে সিদ্ধহস্ত তাহা বহু পাখি, শুয়ার, সাপ, ব্যাঙ, ভালুক, শিয়াল, সজারু, খরগোশ, হরিণ, কুমির, হনুমান প্রাণ দিয়া প্রমাণ করিয়াছে। সকলেই তারিফ করিত। শুধু ঝোঁক নয়—বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে সুযোগও পাইয়াছিলেন তিনি প্রচুর। শিকার-দক্ষতা লাভ করিতে হইলে শুধু ঝোঁক থাকিলেই হয় না—অর্থ এবং অবসর চাই। ধনীর দুলাল বীরেন্দ্রনাথের তাহা ছিল। এসব ছাড়া তাঁহার যোগ্যতাও ছিল। বীরেন্দ্র শুধু যে সাহসী ছিলেন তাহা নয়—সমর্থও ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সুগঠিত দেহে অসুরের মতো শক্তি ছিল।

বীরেন্দ্রবাবু কিছুকাল পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতামাতা বহু পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করাতে বীরেন্দ্রবাবুকে নিজেই সব করিতে হইয়াছিল। শতাধিক পাত্রী দেখার পর বীরেন্দ্রবাবু মিনতিকেই পছন্দ করিলেন। কেন করিলেন তাহা বলা শক্ত। প্রথমত মিনতি গরিবের মেয়ে—দ্বিতীয়ত অতিশয় রোগা এবং তৃতীয়ত অত্যন্ত ভীরু। ভয়চকিত চঞ্চল চক্ষু দুইটি সম্ভবত তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

বিবাহের পর তিন মাস কাটিয়াছে।

সাঁওতাল পরগনার এক পাহাড়ী জঙ্গলে বীরেন্দ্রবাবুরই জমিদারি। প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলের প্রান্ত দেশে সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়িটি নির্মাণ করাইয়াছেন—শিকারের সুবিধার জন্যই। শিকারের জন্য প্রায়ই তাঁহাকে এখানে আসিতে হয়। নানারকম শিকার পাওয়া যায় এই জঙ্গলে। বিবাহের কিছুদিন পূর্বে তিনি এই জঙ্গলে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ মারিয়াছিলেন।

গভীর রাত্রি নয়—সন্ধ্যার একটু পরেই।

ইতিমধ্যেই কিন্তু চতুর্দিক ঝিল্লী-ধ্বনিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। বাড়ির ঠিক পিছনেই বড় একটা তেঁতুলগাছ। তাহাতে অসংখ্য বকের বাসা। তাহাদের

কলরব ও পক্ষবিধুনন বন্য অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। চতুর্দিকে কেমন যেন থমথমে ভাব।

দূরে একটা ফেউ ডাকিয়া উঠিল।

মিনতির কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল।

শিকারীর-বেশে-সজ্জিত বীরেন্দ্রকে সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—ওগো, তুমি যেও না—আমার বড় ভয়-ভয় করছে!

কোমরের বেল্ট্‌টা ভালো করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সহাস্যমুখে বীরেন্দ্র বলিলেন—পাগল না কি! মাচান বাঁধা হয়ে গেছে, 'কিল' হয়ে গেছে—না গেলে কি চলে?

—'কিল' কি?

—'কিল' মানে একটা মোষের বাচ্চাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল—কাল রাত্রে বাঘে সেটাকে মেরেছে। তারই কাছাকাছি একটা উঁচু মাচা তৈরি করিয়েছি—বাঘটা আজও ঠিক আসবে সেখানে।

বেল্টটাকে ভালো করিয়া কষিয়া লইয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া আবার বলিলেন—যদি আসে ফিরে যেতে হবে না বাছাধনকে আজ!

—আমার বড্ড ভয় করছে।

—ভয় কি? ফাগুয়া তো রইল!

—লক্ষ্মীটি, তুমি যেও না!

—পাগল নাকি!

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

মিনতি বলিল—আচ্ছা, আজ বিকেলে গোরুর গাড়ি করে কি একটা পার্শেল এল। আমাকে দেখতে দিলে না কেন? লুকিয়ে রেখেছ কেন বল না?

হাসি চাপিয়া বীরেন্দ্র বলিলেন—রাত্রে নয়—কাল সকালে দেখো।

বীরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন।

মিনতি একা বিছানায় শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। তাহার চোখে ঘুম নাই। একটু তন্দ্রার মতো আসিয়াছিল—একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে। কী ভীষণ স্বপ্ন!—একটা বাঘ দুই থাবা দিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্তপান করিতেছে যেন!...অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া মিনতি শেষে উঠিয়া

বসিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ কী যেন শুনিল! ও কি বকের শব্দ? কক্‌খনো নয়! ভারী মোটা গলায় কে যেন গাছের উপর বসিয়া কথা বলিতেছে। উঃ, এই দারুণ রাত্রি কতক্ষণে প্রভাত হইবে। সহসা তাহার মনে হইল আজ বিকালে কি পার্শেলটা আসিয়াছে দেখা যাক। তবু খানিকটা সময় কাটিবে। পার্শেলটা উপরের ঘরে আছে। লণ্ঠনটা লইয়া ধীরে ধীরে পদসঞ্চারে মিনতি বাহির হইয়া গেল।

বীরেন্দ্র যখন বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সবে ভোর হইয়াছে।

দেখিলেন চাকরদের ঘরে ফাগুয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে, গোলমালে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল।

—মাইজি রাত্রে ভয়-টয় পায় নি তো রে?

ফাগুয়া বলিল যে বাবু চলিয়া যাইবার পরই মাইজি সেই যে ঘরে খিল দিয়াছিলেন আর খোলেন নাই।

বীরেন্দ্র আগাইয়া গিয়া বদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিলেন।

কোনো শব্দ নাই।

আরও কয়েকবার করিলেন।

এ-বারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অধীর হইয়া শেষে তিনি দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

তথাপি দ্বার খুলিল না।

শেষে কপাট ভাঙিতে হইল।

ভিতরে ঢুকিয়াই প্রথমেই বীরেন্দ্রের চোখে পড়িল খানিকটা রক্ত গড়াইয়া আসিয়া দ্বারের কাছে জমিয়া রহিয়াছে।

কিসের রক্ত? মিনতি কোথায়?

বেশী খুঁজিতে হইল না—সিঁড়ির নীচেই তাহার মৃতদেহটা পড়িয়াছিল। একটু ঝুঁকিয়া বীরেন্দ্র দেখিল—মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া সমস্ত মেঝেটা ভিজিয়া গিয়াছে। চাপ-চাপ রক্ত! সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া বীরেন্দ্র দেখিলেন কলিকাতা হইতে আগত stuffed ময়াল সাপটা কোণে কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে। মিনতিকে সকালে ভয় খাওয়াইয়া মজা দেখিবেন বলিয়া কথাটা তাহার কাছে বীরেন্দ্র গোপন রাখিয়াছিলেন।

কে বলিবে সাপটা জীবন্ত নয় ; উহার ভিতরে খড় আর তুলা-ভরা আছে তাহা বলিয়া না দিলে বোঝা অসম্ভব। কাল রাত্রে এই সাপটাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া মিনতি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিবে সে কল্পনাও করে নাই। বীরেন্দ্র ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাপটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার নকল চক্ষু দুইটি হইতে একটা হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে যেন! কিছু দিন পূর্বে এই সাপটাকেই তিনি জঙ্গলে মারিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রের শিকার অভিযান ব্যর্থ হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরেই বীরেন্দ্রের অনুচরবর্গ হিংস্র শ্বাপদটার মৃতদেহ গোরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া লইয়া আসিল।

প্রকাণ্ড একটা বাঘিনী।

বীরেন্দ্রের অব্যর্থ লক্ষ্য তাহার মস্তক বিচূর্ণিত করিয়াছে। বীরেন্দ্রের সহসা মনে হইল বাঘটা কোথায়!

ছাত্র

কাঠফাটা রোদ, চতুর্দিকে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। আমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার সমস্যা দেড় শত অঙ্ক এবং এক শত পৃষ্ঠা হাতের লেখা। গ্রীষ্মাবকাশের হোম-টাস্ক। থার্ড মাস্টারের রুদ্রমূর্তি, রুদ্রতর ভাষণ এবং রুদ্রতম বেত্রাঘাতের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার অবসর নাই। আমি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া আরও বেশি ভাবনা। সুতরাং নিদারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া গৌরীশঙ্কর খুলিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া থার্ড মাস্টারই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম, একটু ভয়ও হইল। শুষ্ক মুখ, মাথার রুক্ষ চুলগুলা খাড়া হইয়া আছে, কোটরগত চক্ষু দুইটি জলন্ত অঙ্গারের মতো রক্তবর্ণ। ভাবিলাম, কুঁজো হইয়া বসিয়াছি বলিয়া হয়তো ধমক দিবেন। তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু সেসব কিছু না করিয়া তিনি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস বাবা?"

ঘরের কোণে কুঁজায় জল ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক গ্লাস আনিয়া দিলাম। ঢকঢক করিয়া নিমেষে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

"আর-এক গ্লাস।"

দিলাম।

তাহাও নিমেষে শেষ হইয়া গেল।

"আর-এক গ্লাস চাই। আঃ, বাঁচালি বাবা, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পাবার উপায় নেই কোথাও—।"

ঘুম ভাঙিয়া গেল।

স্বপ্ন।

বাস্তব কিন্তু আরও নিদারুণ।

পরদিন প্রখর রৌদ্র ও গেঁটে বাতকে উপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ় আমি উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গা অভিমুখে চলিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্কুলে

যে থার্ড মাস্টারের নিকট পড়িয়াছিলাম, যিনি আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন—কাল সহসা তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিয়া আমি—আপনারা যাহা বলিবেন তাহা আমি জানি, ফ্রয়েড চার্বাক আমিও পড়িয়াছি—নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত হইতেছি, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই—ঘাড়ে ধরিয়া কে যেন আমাকে লইয়া যাইতেছে।

তর্পণ আমাকে করিতেই হইবে।

রূপকথা

শিল্পীর স্বপ্ন ভাঙিয়াছে।

জীবনের প্রতি মুহূর্তের সাধনা—এই মর্মর মূর্তি! কত দিবসের, কত নিশীথের আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত স্বপ্ন—সহসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। হতবাক্ শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে—যে মর্মর-প্রতিমাটি এত যত্নে সে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সহসা পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়াছে! প্রতিমা অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহা পড়িয়া আছে—তাহা পাষাণ! হঠাৎ ভাঙিয়া গেল!

কেন এমন হইল? কে বলিবে? শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর স্বপ্ন কখন্ কোন্ মন্ত্রবলে নিঃশেষ হইয়া যায় কে তাহার সন্ধান দিবে?

দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যেই তাহার স্বপ্ন মূর্তি-পরিগ্রহ করিল, কঠিন পাষাণ যে মুহূর্তে তাহার মানসীতে রূপান্তরিত হইল—যে মুহূর্তে সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"যাক, এতদিনে পরিশ্রম সার্থক হইল"—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ! মানসীর মৃত্যু! ইহাকে কি সে আর ফিরিয়া পাইবে?

প্রতিমা ফাটিয়া গেল—যাহা রহিল তাহা বিদীর্ণ শিলাখণ্ড! মুহ্যমান শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

অনুজা ও অভিজিৎ আসিয়া দেখে, শিল্পী তেমনি-ভাবেই বসিয়া আছে। অনুজা শিল্পীর বিধবা দিদি। এই পাগল ভাইটিকে সে জননী-স্নেহে লালন করিয়াছে। সে খাইতে দিলে শিল্পীর খাওয়া হয়—তাহারই অনুরোধে যেন সে বাঁচিয়া আছে।

অভিজিৎ শিল্পীর প্রতিবেশী ও অনুজার প্রণয়ী। তাহাদের দেখিয়া অসহায়ের মতো শিল্পী বলিয়া উঠিল—

"দেখ দিদি—দেখ অভিজিৎ—এ কী হয়েছে।"

অনুজা কিছু বলিল না।

অভিজিৎ বলিল—"তোমার মুক্তি হয়েছে। রাজশিল্পী তুমি, রাজসভায় যাও।"

…শিল্পী ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেল।

তাহার মানসীর স্মৃতি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল—রাজসভায় নয়, শ্মশানে!

মহাশ্মশান…

কাছে, দূরে চিতা জলিতেছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়—চিতা—কেবল চিতা! নর-নারীর, দেশের, জাতির, হৃদয়ের! কাহারও অনলশিখা গগনস্পর্শী—কেহ নির্বাপিতপ্রায়—কেহ নিবিয়া গিয়াছে। চিতাভস্ম লইয়া বাতাস উন্মাদ!

…অন্ধকারে মৃদু কলকলধ্বনি!…বৈতরণীর। সেই প্রায়ান্ধকার শ্মশানে শিল্পী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মহাশ্মশানে তাহার মানসীর সন্ধান মিলিবে কি? মানসী কি মরিয়াছে…তাহাই বা কে বলিয়া দিবে! মানসী কি মরে? মরিলেও কি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? অন্ধকার উত্তর দেয় না। শ্মশানের চিতা জলে ও নেবে! সহসা শ্মশানভূমি অট্টহাসে শিহরিয়া উঠিল। সচকিত শিল্পী চিতার আলোকে দেখিল, হাসিতে হাসিতে একটি মূর্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মুখাবয়ব জটা-শ্মশ্রু-মণ্ডিত—চক্ষু-দুইটি জলন্ত অঙ্গারের ন্যায়—মুখে বিকট হাস্য! কণ্ঠে পুষ্পমাল্য—পুষ্পমাল্যকে বেষ্টন করিয়া এক বিষধর সর্প পিচ্ছিল সঞ্চরণে সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত করিতেছে। তাহার এক হস্তে খর্পর—অন্য হস্তে বাঁশরী! উলঙ্গ। শিল্পীর নিকটে আসিবামাত্র সে অট্টহাস্যে চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া উন্মাদ-নৃত্য জুড়িয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত গান—

দুটো গোরুর চারটে পা রে
তিনটে পা তার খোঁড়া,
টিয়ে পাখির ডিমের মাঝে
ছিল টাট্টু ঘোড়া
আকাশ থেকে চাঁদকে পেড়ে
ভাতে দিলাম সেদিন,
নামিয়ে দেখি শুয়ারমুখো
গিরগিটি দু' জোড়া!
শুঁয়োপোকার সঙ্গে যেদিন
বিয়ে হ'ল রানীর,
তাই না দেখে মাকড়শাটার
পৃষ্ঠে হ'ল ফোড়া—
হা-হা-হা-হা—

শিল্পী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে ?"

"আমি ! দেখ দিকি ভালো করে ?—চিনতে পারছ না ?"

"না।"

"হা হা হা হা"—উন্মাদের হাসি।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিল্পী শুনিল—সে বলিতেছে—

"আমি যে তুমি। তোমারই আর-একটা রূপ আমি।

"বুঝতে পারলাম না।"

"হা—হা—হা—হা"

হাসি থামাইয়া হঠাৎ সে আবার বলিল—"তিনের পিঠে একটু কিছু দিলে একটা সংখ্যা হয় আর ঘোড়ার পিঠে একটা কিছু দিলে জিন্ হয় ! কেমন মজা! তোমার নাম কি বন্ধু ?—যদিও আমি জানি,—তবু তোমার মুখে একবার শুনতে ইচ্ছে করছে —

"আমার নাম চিত্রকারু ! আমি শিল্পী—"

"আর বলতে হবে না। তুমি শিল্পী ? আমি যদি বলি, তুমি স্বপ্ন !—মিছে কথা হয় তাহলে ?—হা হা হা হা"—শিল্পী অভিভূত হইয়া দেখিতে লাগিল, আবার সে নৃত্য জুড়িয়াছে ! বাঁশরীর আঘাতে হাতের খর্পরটা যেন হাসিতেছে। তাহার কণ্ঠের বিষধর সর্পের চক্ষে কুসুমের কোমলতা ফুটিয়া উঠিল—পুষ্পমাল্যের এক-একটি ফুল যেন স্ফুলিঙ্গ !

হঠাৎ সে আবার নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া দিল।

শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ফুটবল খেলেছিস কখনও ? আকাশে গিয়ে ? সূর্যচন্দ্রকে ফুটবল ক'রে ? আচ্ছা আর একটু বড় হ—তারপর খেলবি।"

অপরিসীম করুণায় সে শিল্পীর গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চক্ষু-দুইটি হইতে স্নেহ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে ?" "আপনার নাম কি ?"

"আমার নাম 'যা ইচ্ছে'—"

"যা-ইচ্ছে ?"

"হ্যাঁ—সকলের সঙ্গেই তো আমার আলাপ ! তোর কাছে তো জন্মাবধি আছি। তোর মানসীর চোখের মাঝখানে এতদিন বসে ছিলাম, তুই তো বাটালির ঘায়ে আমাকেই অস্থির করে দিয়েছিস রোজ—এই দেখ—হা-হা-হা।"

শিল্পীর ভাষা হারাইয়া গিয়াছে। শিল্পী দেখিল, সত্যই তো ইহার সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন! কে এ?

"আমার মানসীর চোখের ভিতর আপনি ছিলেন?"

আবার পাগল নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গান—

ভাবের যখন হয় রে অভাব
ভাষা তখন আসর জমায়
নফর যখন হয় রে নবাব
উজীরের সে মাইনে কমায়।
কান এবং নাকে মিলে
কান্নাকে যে জন্ম দিলে
চমকে গেল হায়রে পিলে
চোখের জ্যোতি বাড়ল অমায়।
উজীরের সে মাইনে কমায়—

সে থামিলে শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার কথা শুনুন। আপনি কি আমার মানসীকে চেনেন?"

পাগল হাসিয়া বলিল—"আমি তোমাকে চিনি। তুমি এখানে এসেছ কেন বল তো! যদিও আমি জানি, তবু তোমার মুখে শুনতে বেশ লাগে—হা-হা-হা—"

"আমার মানসীর স্মৃতি আমাকে এখানে টেনে এনেছে।"

"হা-হা-হা—মানসীর স্মৃতি! শ্যামা-নাপতিনীর নাতনী মারা গেছে—রামময়ের ভাই মরে গেল—চিতা নেবে নি এখনও। তাদের স্মৃতি বুঝি তোমায় আকুল করছে, না? কেবল মানসীর স্মৃতি নিয়ে তুমি ব্যস্ত! কেন বাছাধন?"

"তাকে যে আমি ভালোবাসতাম—"

"আর এদের বাসতে না কেন? আর, আঙুর, আচার, মাংস এবং আরো অনেক কিছু তো তুমি ভালোবাস একসঙ্গে। মানসীকে ভালোবাসবে আর রামময়ের ভাইকে বাসবে না কেন?"

বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে আবার গান ধরিয়া দিল—

জলের মাঝে পড়লে চিনি
গলেই জেনো যাবে দাদা,

গরম দুধে পাঁউরুটি সে
নিমেষ মাঝে হ'বে কাদা।
ডাগর চোখে সাগর আছে,
চাউনিতে তার ডাইনি নাচে ;
ভূত থাকে রে শ্যাওড়া গাছে
পরনে তার কাপড় সাদা—
গরম দুধে পাঁউরুটি সে
নিমেষ মাঝে হয় যে কাদা।

হঠাৎ সে থামিয়া গেল। বলিল, "এইবার আমাকে স'রে পড়তে হবে। আমার গানের মানে ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে!"

শিল্পী কহিল—"না না, আপনি বলে যান—আমার মানসী কোথায়? আপনি তো চেনেন তাকে? সে কোথায়?" পাগল বলিল—"তাকে তুমিই তো মেরে ফেললে! দিন রাত উঠে-পড়ে লেগে শেষ করে দিলে। অমনি সে মরে গেল।"

"আর পাব না তাকে?"

"আবার পাবে বই কি! আনন্দের দেশে যাও।"

"কোথায় সে দেশ?"

"খুঁজে বার কর। তাহার পর কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা এই মালাটা গলায় পর। আনন্দের দেশের আভাস একটা পাবে। এ মালা কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না—একটু পরে পাখি হয়ে যাবে। তার পরে হাওয়া—"

মালাটি শিল্পীর গলায় পরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে সেই অদ্ভুত মূর্তি শ্মশানের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল!

শ্মশান-দেতার বরমাল্য গলায় পরিয়া শিল্পী আনন্দের দেশের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তন্ময় হইয়া গেল। কি অদ্ভুত দেশ!

"ওই দেশে যেতে হলে জ্ঞানরাজ্যে যাও আগে—"

চমকিয়া শিল্পী দেখিল গলার মালা পাখি হইয়া গিয়াছে। উড়িয়া উড়িয়া বলিতেছে—"এস আমার সঙ্গে—"

অনুজা চলিয়াছে।

চলিয়াছে তাহার ভা'য়ের সন্ধানে। পাগলের মতো কোথায় চলিয়া গেল সে? তাহার সেই অসহায় ভাই! না খাইতে দিলে সময়মতো খায় না, বিছানা করিয়া না দিলে যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে! পরিষ্কার পরিচ্ছদ জোর করিয়া হাতে তুলিয়া না দিলে সে বেশ-বাস বদলায় না! এখনও শিশু। সন্তানহারা জননীর আকুলতায় অনুজা পথের শ্রান্তি ভুলিয়াছে।

...সহযাত্রী অভিজিৎ। অভিজিৎ খুঁজিতেছে শিল্পীকে নয়, অনুজাকে। অনুজা তাহার পথ-চলার সঙ্গিনী। পাশাপাশি চলিয়াছে—অথচ আজও সে অনুজার সন্ধান পায় নাই।

দিন যায়—রাত্রি আসে। কত ফুল ফুটিল, ঝরিল। কত চন্দ্র-সূর্য উঠিল, ডুবিল। পথের শেষ নাই—দুই জনে পাশাপাশি চলিয়াছে।

জ্ঞান-রাজ্য বহুদূর।

শিল্পী জ্ঞান-রাজ্যে আসিয়াছে।

অসীম এই দেশ। যতদূর দেখা যায় সীমা-রেখা চোখে পড়ে না। এই দেশে কোথাও অভ্রভেদী পর্বতমালা—আকাশের সঙ্গে মিতালি করিতেছে। কোথাও মরীচিকাময় মরুভূমি—কোথাও উর্মিসমাকীর্ণ মহাসমুদ্র—কোথাও আবার মনোহর পুষ্করিণী, পদ্মফুলে ভরা। এই দেশের কোথাও কণ্টকময়, কোথাও পুষ্পাকীর্ণ, কোথাও ঊষর, কোথাও শ্যামল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, ভিড় নাই। একটি বৃক্ষতলে শিল্পী একরাশি জটিল সুতার বাণ্ডিল লইয়া তাহার জট ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না—তাহার হস্তপদ সেই সুতার জালে যেন জড়ীভূত হইয়া যাইতেছে—বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু শিল্পীর চেষ্টার বিরাম নাই। চতুর্দিক প্রখর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু এই সূর্যালোক শিল্পীকে মুগ্ধ করিতেছে না। শিল্পী সূত্র-সমস্যায় মগ্ন।...দূরে সিদ্ধান্তশেখর প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন মহাজ্ঞানী। আপনার মনে সুতার জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে আসিতেছেন—তাঁহার গাত্রে, হস্তে মস্তকে নানা বর্ণের সুতার জাল। তিনি সুতার জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে শিল্পীর সমীপবর্তী হইলেন। শিল্পী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সিদ্ধান্তশেখর স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কে? কতদিন এ দেশে এসেছেন? ইতিপূর্বে আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!—"

শিল্পী বলিলেন—"আমি আনন্দের দেশের সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। শুনেছি আনন্দের দেশের সন্ধান জ্ঞানরাজ্যে পাওয়া যায়। এখানে এসে আমি আচার্য উদ্দীপনের উপদেশ প্রার্থনা করি। তিনি আমায় বললেন, এই যে রাশি রাশি জটিল সূত্র—এদের সমস্যা—এদের জটিলতা যে সমাধান করতে পারবে, সে-ই আনন্দের দেশে যেতে পারবে। আমি তাই তাঁর উপদেশ অনুসারে এই জট ছাড়াবার চেষ্টা করছি। কত দিন লাগবে বলতে পারেন?"

সিদ্ধান্তশেখরের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"তার কি ঠিক আছে? সে ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আমার তো বহুবৎসর অতীত হয়ে গেছে—এখনও তো সব বাকি। অধীর হয়ো না। ওই সাদা সুতার জট খুলতেই তুমি অধীর হয়ে পড়েছ—এর পর লাল, কালো, নীল, সবুজ, হলুদ—রক্ত-বর্ণের জটিল সমস্যা আছে। একে একে সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে, তবে না আনন্দের দেশের সন্ধান পাবে!"

এই বলিয়া সিদ্ধান্তশেখর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

নিকটে দূরে সিদ্ধান্তশেখরের মতো আরও দুই-এক জনকে দেখা গেল। সকলেই সূত্র-সমস্যায় আকুল।

আর ভালো লাগিতেছে না।

শিল্পীর ধৈর্য সীমা ছাড়াইয়াছে—হস্ত-পদ ক্লান্ত, অবসন্ন। চোখে ঘুম ঘিরিয়া আসিতেছে। সাদা সুতার জট এখনও জটিল হইয়াই আছে। আপন মনেই শিল্পী বলিয়া উঠিল, "আর তো পারি না। এর-যে কোনো আদি অন্তই খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক কষ্টে যদি খেই খুঁজে পেলাম, একটু পরেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে। যার জট ছাড়িয়ে রেখেছিলাম, খানিকক্ষণ পরে দেখি আবার তাতে নূতন করে জট পড়েছে। কী করা যায়? আনন্দের দেশের কোনো খবরই তো পাচ্ছি না! সন্দেহের পর সন্দেহ মনে জাগছে! এই জটিলতার মধ্যে কি—" সহসা শিল্পীর চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। হঠাৎ একটি গান কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল, অপূর্ব কণ্ঠস্বর!

উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়।···

● দ্বিতীয় শতক ●

জল !······ওই যে !

মরু-প্রান্তরের মরীচিকার পিছনে সে ছুটিল।

অনুজা ও অভিজিৎ।

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ পথ অতিবাহন করিয়াছে। এই তো জ্ঞানরাজ্য। কই? এখানেও তো কেহ নাই! অনুজা আজিও তাহার ভাইকে পাইল না—অভিজিৎ অনুজার সন্ধান আজও করিতেছে। পথ চলার শেষ নাই···কতদূর—!

সহসা অভিজিৎ কৃতার্থ হইয়া গেল।

অনুজা বলিতেছে—সে তৃষিতা, একটু জল চাই

জল?

ওই তো নিকটেই একটা কূপ রহিয়াছে। চতুর্দিক ফুল-গাছ দিয়া ঘেরা। জল তুলিবার কোনো উপকরণ কিন্তু নাই। অভিজিৎ সেই সন্ধানে অনুজাকে সেই কূপের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল—"বালতি কিংবা ঘড়া যাহোক একটা যোগাড় করে আনছি আমি। তুমি বোসো।"

অনুজা বসিল—অভিজিৎ চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আর আসে না। কোথায় গেল সে?

অনুজার তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে।

সহসা অনুজা বলিয়া উঠিল—"উঃ বড় পিপাসা—আর তো পারি না। আমাকে জল দেয় এমন কেউ নেই এখানে?"

অনুজার কথা শেষ হইতে না হইতে সেই কূপের ভিতর হইতে চন্দন-চর্চিত পুষ্পমাল্য-বিভূষিত একটি লোক বাহির হইয়া আসিল। অনুজাকে বলিল—"সুন্দর নির্মল জল যদি চান আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"এই কূপের ভিতর। কোনো ভয় নেই—আসুন।"

"আমার সঙ্গী যে এখনও ফেরেন নি।"

"তাহলে অপেক্ষা করুন! আমি যাই—"

"একটু জল এনে দিতে পারেন না দয়া করে—"

"না, সে জল আনা যায় না।"

"চলুন যাই তবে—"

অনুজা চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আসিয়া দেখে অনুজা নাই। একটু দূরে সিদ্ধান্তশেখর সুতার জট ছাড়াইতেছেন! অভিজিৎ তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একজন রমণী এখানে ছিলেন। কোথায় গেলেন তিনি? দেখেছেন আপনি?"

সিদ্ধান্তশেখর বলিলেন—"দেখেছি। তাঁকে সহজে এখন পাবেন না। তিনি ধর্মকূপে প্রবেশ করেছেন।"

"ধর্মকূপ? সে আবার কি?"

"ওই যে আপনার সম্মুখেই রয়েছে। ওখানে কোনো সরল অসহায় বিশ্বাসপ্রবণ প্রাণ যদি গিয়ে তৃষ্ণার জল চায় তাহলে ধর্মকূপের অভ্যন্তর-বাসী কেউ এসে নির্মল জলের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ওর ভিতরে নিয়ে যায়। একটি স্ত্রীলোককে এক্ষুনি নিয়ে গেছে আমি দেখেছি।"

অভি। আপনি দেখলেন অথচ বারণ করলেন না?

সিদ্ধান্তশেখর। বারণ ক'রে কোনো ফল হয় না, বরং উলটো ফল হয়। আমি আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ওই ধর্মকূপে পতিত হতে দেখেছি। এই জ্ঞান-রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি ধর্ম-কূপ আছে। একবার যদি ওর প্রতি কোনো মোহ জন্মায় তাহলে আর নিস্তার নাই। জ্ঞান-রাজ্যে সে আর ফিরে আসতে পারবে না।

অভি। আপনি এতে পড়েন না কেন?

সি। আমি যে নাস্তিক।

অভি। আমি কি প্রবেশ করতে পারব?

সি। তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করুন। আপনাকে যদি যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন— ওঁরা নিজেরাই এসে সমাদরে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

অভি। আমি যদি লাফিয়ে পড়ি?

সি। (হাসিয়া) তা হয় না। ওর কিছুদূর গিয়েই একটা রুদ্ধদ্বার আছে। অবিশ্বাসী নাস্তিকের পক্ষে তা চির-রুদ্ধ।

এই বলিয়া সিদ্ধান্তশেখর চলিয়া গেলেন।

অভিজিৎ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

তারস্বরে তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিলেন—কেহ আসিল না।

ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন—কিন্তু উঠিয়া আসিতে হইল।

সর্বপ্রকার চেষ্টা তিনি করিলেন—কিন্তু ধর্মকূপ তাঁহার নিকট রুদ্ধই রহিয়া গেল।

অনুজা আর ফিরিবে না—?

সে কি!

শিল্পী,—উদ্‌ভ্রান্ত শিল্পী—চলিয়াছে।

চতুর্দিকে হতাশার মরুভূমি—মৃগতৃষ্ণিকারা মায়া-সরোবর রচনা করিতেছে। তৃষ্ণার্ত শিল্পী তাহাদেরই উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। তৃষ্ণা তো মিটিল না—কিন্তু শক্তির যে শেষ হইয়া আসিল!

তপ্ত বালুকণার জ্বলন্ত অনুভূতি—ঘূর্ণীবাতাসের উন্মত্ত নর্তন—মরীচিকার ছলনা!

শিল্পীর বিস্রস্ত কেশ, বিক্ষত চরণ। নয়নে তীব্র জ্বালা, বক্ষে নিদারুণ পিপাসা। বিশুষ্ক রসনায় অব্যক্ত হাহাকার—কোথায়—কোথায়—!

ওই যে আর একটু দূরে—ওই তো শ্যাম অরণ্যানীর স্নিগ্ধকান্তি।—জলধারার আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন!

মরীচিকার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সহসা শিল্পী আর পারিল না। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ তপ্ত বালুকায় লুটাইয়া পড়িল।

কাছে—দূরে মরীচিকারা স্বপ্ন রচনা করিতেছে। এখনও!

ধীরে ধীরে একটি মরীচিকা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিল।

…একটি মানবী মূর্তি।

সুন্দরী—যুবতী—তন্বী!

ধীরে ধীরে সে শিল্পীর নিকট আসিল।

ধীরে ধীরে কহিল—"ওঠ, আমি এসেছি"—

ধর্মকূপের অভ্যন্তর।…চতুর্দিক বন্ধ। আলোক-প্রবেশের পথ নাই। ধূপ-ধূনার ধূমে সমাচ্ছন্ন। হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। রাশি রাশি মৃত কিংবা মৃতপ্রায় পুষ্পের শবদেহ। এখানে মহাধার্মিক সকলেই অন্ধ। এক-একজন হাত ধরিয়া তাহাদের

লইয়া বেড়াইতেছে। বিবিধ মূর্তি। কাহারও শিখা—কাহারও জটা—কেহ মুণ্ডিত-মস্তক—কেহ পট্টবস্ত্র-পরিহিত—কেহ উলঙ্গ—কেহ রক্তাম্বরধারী।

...সিংহবাহিনী-মূর্তির পদতলে অনুজা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সরলতার প্রতিমূর্তি একটি নারী বসিয়া গান গাহিতেছে। তাঁহার নাম বিশ্বাস। এই গানের সুরই ধর্মরাজ্যের প্রাণ-মন্ত্র!

ডাকো শুধু ডাকো—
তাঁহারি চরণে মরমখানিরে
উজাড় করিয়া রাখো।
বেদনার বোঝা চরণের তলে
ভিজাইয়া রাখো নয়নের জলে
সকল বেদনা ঘুচিবে মুছিবে
যেও না, দাঁড়ায়ে থাকো!
বেদনার কথা লুকায়ে রেখো না
সরমের কথা বৃথাই ঢেকো না
কেবল তাঁহার মোহন মূরতি
ব্যথিত মরমে আঁকো!

এই একই মন্ত্রের বিবিধ ভাষা! অন্ধকারে অন্ধের প্রার্থনা। অনুজা অন্ধ হইয়াছে। প্রার্থনা করিতেছে, 'ভাইকে ফিরাইয়া দাও'—পিপাসা কিন্তু মিটে নাই। অভিজিৎ কখন জল আনিবে—মনে মনে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

অভিজিৎ মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অনুজার মতো বিশ্বাস তাহার নাই...ধর্ম-জগতে সে স্থান পাইল না। শিল্পীর মতো স্বপ্ন নাই, কোনো মরীচিকা মূর্তি পরিগ্রহ করিল না। সংসারের সাধারণ মানুষ সে। শিল্পী তাহার বন্ধু ছিল—তাহার পাগলামির জন্যই তাহাকে ভালোবাসিত। অনুজাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করিতে চাহিয়াছিল। পাইল না। কাহাকেও পাইল না!

হতাশার মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। অভিজিৎ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়—জীবনের সমস্তটা যখন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার সহিত এক ফেরিওয়ালার দেখা হইল। নাম তার ব্যসন। অভিজিৎ তাহাকে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

"তুমি কে ভাই ?"

"আমি একজন ফেরিওয়ালা !"

অভি। ফেরিওয়ালা ? এই মরুভূমির মাঝখানে ফেরিওয়ালা !

ব্যসন। আজ্ঞে হ্যাঁ। এইখানেই আমার সমঝদার বেশী—

অভি। কি আছে—তোমার কাছে ?

ব্যসন। নানারকম জিনিস আছে। কি চান বলুন ?

অভি। দু-একটা নাম কর দেখি—

ব্যসন। তাস, পাশা, গান, সাহিত্য, সঙ্গীত, মদ।

অভি। মদ আছে ?

ব্যসন। আছে।

অভি। দাম তো আমার কাছে এখন নেই।

ব্যসন। আমার কাছে আসতে হলে অগ্রিম দাম দিয়ে তবে আসতে হয়। তা আমি পেয়ে গেছি। জিনিসটার দাম যথাসময়ে ও যথাস্থানে আপনার কাছে আদায় করে নেওয়া হবে।

অভি। (সাগ্রহে) দিন তবে।

বহুকাল পরে অনুজা ও অভিজিতের দেখা হয়।

অনুজা অন্ধ—অভিজিৎ মত্ত।

কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

আনন্দের দেশ। চতুর্দিক উজ্জ্বল। অজস্র ফুল, অজস্র হাসি—অনবদ্য সঙ্গীত—অফুরন্ত আনন্দ। তরুণ তরুণীর হাট। বিশ্বের যৌবন এখানে অক্ষয় হইয়া আছে।

একটি নির্জন চাঁপা-গাছের-তলায় বসিয়া শিল্পী মরীচিকা-সুন্দরীর কর্ণমূলে স্তুতিগান করিতেছে—"তুমি কত সুন্দর !"

শিল্পীর সেই মর্মর-প্রতিমা ?"

তাহা এখনও ভগ্ন-বিদীর্ণ।

শ্যাম শৈবালদল আসিয়া তাহার বিদীর্ণ স্থানটুকু ঢাকিয়া দিতেছে।

স্বপ্ন

নিদারুণ দারিদ্র্য। দুই বেলা অন্ন জোটে না, পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন। অপরিচ্ছন্ন পল্লীতে খোলার ঘরে তবু দিন কাটিতেছিল। কিন্তু নূতন একটি সমস্যার উদয় হইয়াছে, পুঁটি আসন্নপ্রসবা। যদিও প্রথম সন্তান, তবু আনন্দ নাই। দীন-দরিদ্রের অভাব-অনশনের মধ্যে কোন্ হতভাগ্য আসিতেছে কে জানে! পুঁটি বিপিন উভয়েরই চিন্তার অন্ত নাই। যেদিন ব্যথা ধরিল, সেদিন সেই সরু গলিতে একটি দামী মোটর প্রবেশ করিল এবং মোটর হইতে কাঁচাপাকা-গোঁফ ঝাঁকড়া-ভুরুওয়ালা এক ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। লোকটি খর্ব্বাকৃতি। গায়ে দামী শাল, পায়ে দামী জুতা, অনামিকায় দামী আংটি। ভদ্রলোক নামিয়া প্রশ্ন করিলেন, এগারো নম্বর বাড়ি কোন্‌টা ?

পাড়ার এক ব্যক্তি খোলার ঘরগুলি দেখাইয়া দিল।

ওই খোলার ঘরগুলো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ির মালিক সামনের ঘরটায় থাকেন, পেছনের ঘরগুলো ভাড়া দেন। সবগুলোরই এক নম্বর।

কী দুর্দৈব !

অস্ফুট কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া ভদ্রলোক আগাইয়া গেলেন। বাড়ির মালিক সম্মুখের দাওয়ায় বসিয়া ছিলেন।

আপনিই কি এই বাড়ির মালিক ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার বাড়িতে বিপিন বলে কি কোনো ভাড়াটে থাকে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার স্ত্রীর নাম কি পুঁটি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি কি আসন্নপ্রসবা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কবে নাগাদ ছেলে হবে বলতে পারেন আপনি ?

আজই হতে পারে, শুনছি ব্যথা ধরেছে।

ও, তাই নাকি? তা হলে তো দেরি করা ঠিক হবে না। এই রঘুবীর সিং, তুমি গিয়ে ওদের নিয়ে এস তা হলে, জলদি।

মোটর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ভদ্রলোক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া রোয়াকটা ঝাড়িয়া বসিতে যাইতেছিলেন, বাড়িওয়ালা বাধা দিল।

ওখানে বসবেন না, আমি মোড়া বার করে দিচ্ছি।

মোড়ায় উপবেশন করিয়া ভদ্রলোক একটি সিগার ধরাইলেন এবং বলিলেন, এখানে নহবত বসাতে চাই, তার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?

নহবত? কেন?

কেন পরে বলছি; ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

এখানে কি করে ব্যবস্থা হয় এখন!

হুঁ, মুশকিল বটে। আচ্ছা, ফুটপাতে বসেই বাজাব। এপাড়ায় যতগুলো শাঁখ আছে যোগাড় করুন। পুঁটিমায়ের ছেলে হবামাত্র বাজাতে হবে। প্রত্যেক শাঁখের জন্যে আমি নগদ দশ টাকা করে দেব। যোগাড় করতে পারবেন?

এক্ষুনি। তা হবে না কেন?

বিস্মিত বাড়িওয়ালা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

যান তা হলে, দেরি করবেন না।

পকেট হইতে এক শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া বাড়িওয়ালার হস্তে দিলেন, বাড়িওয়ালা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। বিস্ময়কর খবর রটিতে বিলম্ব হইল না, দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল। রঘুবীর সিং আসাসোঁটাধারী জরির পাগড়ি-পরা একদল বরকন্দাজ আনিয়া সারি সারি দাঁড় করাইয়া দিল। নহবতও লইয়া আসিল। তাহারা ফুটপাতে বসিয়াই আশাবরী রাগিণী বাজাইতে লাগিল। একজন ডাক্তার ও নার্স আসিয়া পুঁটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন।

কৌতূহলী জনতার আগ্রহাতিশয্যে খর্বাকৃতি ভদ্রলোক আসল ব্যাপারটি অবশেষে খুলিয়া বলিলেন।

রাজা নেহাল সিং আমার মনিব ছিলেন। লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি রেখে অপুত্রক অবস্থায় তিনি মারা যান। আমাকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন, সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই দিয়েছিলেন। কাল রাত্রে হঠাৎ এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম: আমার

মনিব যেন আমাকে বলছেন, ঐশ্বর্যের সুখ তো অনেক ভোগ করেছি, দারিদ্র্যের সুখ কি তাও একবার ভোগ করবার ইচ্ছে আছে। কাল আমি এক দরিদ্রের ঘরে জন্মাব, আমার মায়ের নাম পুঁটি ও বাবার নাম বিপিন, ঠিকানা এই। ঠিকানাটা দিয়েই তিনি অন্তর্ধান করলেন, আমারও তখন ঘুম ভেঙে গেল। সকালে উঠে ভাবলাম, একবার খোঁজ নিয়ে আসি। সত্যিই যদি তিনি আবার আসেন, তা হলে তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। খোঁজ নিয়ে দেখছি স্বপ্ন মিথ্যে নয়। তাই সামান্য একটু ব্যবস্থা করেছি। আপনারা পাড়াসুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করুন, খরচ যা লাগে আমি দেব। বিপিনবাবু এখনও ফেরেন নি? তাঁর ছেলের সম্পত্তিও তাঁর হাতে আমি ফিরিয়ে দিতে চাই, বুঝলেন।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর হইতে বহু শঙ্খ একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। রাজা নেহাল সিং জন্মগ্রহণ করিলেন। নহবতে আশাবরী তখন জমিয়া উঠিয়াছে।

নন্দী ক্ষ্যাপা

ট্রেন থেকে নেমেই একটি দুঃসংবাদ পেলাম—'কনেক্‌শন' 'মিস্' করেছি। পরবর্তী ট্রেনের জন্য সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটাবার কোনো আয়োজন বা উপকরণ সঙ্গে নেই। বন্ধু নেই, পরিবার নেই, এমন কি একখানা বই পর্যন্ত নেই। সম্বলের মধ্যে ছোট একটি সুটকেশ—তাতে খান দুই কাপড়, গামছা, কামাবার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু নেই। স্টেশনের দিকে চেয়েও সান্ত্বনা পাবার মতো চোখে পড়ল না কিছু। ছোট স্টেশন। হুইলার নেই। গোটা দুই ফেরিওলা ও কুলি এবং জন দুই স্টেশনের বাবু (তাঁরাও কাজে ব্যস্ত)—এদের কেউ আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না সাত ঘণ্টা চুপ ক'রে বসে থাকাও তো মুশকিল!

সুটকেসটি হাতে ঝুলিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একটু দূরে গিয়েই একটি খাবারের দোকান চোখে পড়ল। ঢুকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা এখানে দেখবার মতো কিছু আছে কাছে-পিঠে? সমস্ত দিনটা কাটাই কি করে?"

"এখানে দেখবার মতো আর কি আছে! তবে নন্দী ক্ষ্যাপাকে যদি দেখতে চান চেষ্টা করতে পারেন।"

"সে আবার কে?"

"সাধক একজন, শ্মশানে থাকে। তবে গেলেই যে দেখা পাওয়া যাবে তার কোনো মানে নেই। নদীর চড়ায় কখন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না—মন মরজি—"

"শ্মশান কত দূর এখান থেকে?"

"আধ ক্রোশটাক হবে—এই রাস্তা ধরে চলে গেলেই দেখতে পাবেন। মা-কালীর মন্দির আছে—"

কি আর করি, শ্মশানের দিকেই অগ্রসর হলাম।

বেশ ভালো লাগল। চমৎকার নির্জন জায়গা। পাশ দিয়ে একটি নদী বইছে। নদীর ধারেই কালী-মন্দির। মন্দিরের চার দিকে পাকা প্রশস্ত বারান্দা। মন্দিরে কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। মন্দিরের কপাট খোলা রয়েছে। সামনে দাঁড়াতেই কালীপ্রতিমা চোখে পড়ল। লেলিহ-রসনা ভয়ঙ্করী মূর্তি। প্রণাম

করলাম। একটা বলিষ্ঠ কালো কুকুর মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে রইল, তার পর চলে গেল। আমি নদীর ধারের বারান্দাটায় গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। বারান্দার নীচেই খানিকটা জমি, তারপরই কণ্টকাকীর্ণ নদীতীর, ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ, গোটাকয়েক গ্রন্থিল আশশ্যাওড়া গাছ নদীর উপর ঝুঁকে আছে। চতুর্দিক কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে, একটি পাখি পর্যন্ত ডাকছে না। দিনের বেলাও গা ছমছম করতে লাগল। তবু কিন্তু উঠে পালিয়ে আসতে পারলাম না। অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি আমাকে যেন টেনে বসিয়ে রেখে দিলে। বসে রইলাম। সমস্ত মনটা উদাস হয়ে আসতে লাগল ক্রমশ। কতক্ষণ ব'সে ছিলাম জানি না—হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। মন্দিরের সামনের দিক থেকে কান্নাটা আসছে মনে হল। উঠে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মড়া এসেছে। মড়া বয়ে এনেছে জন ছয়েক লোক, তা ছাড়া সঙ্গে দুটি স্ত্রীলোক রয়েছে। একটি কম-বয়সী—বছর ষোল হবে—আর একটি প্রৌঢ়া। একজন স্ত্রী, একজন মা। দুজনেই খুব কাঁদছে। শুনলাম সর্পাঘাতে মারা গেছে লোকটি। কে যেন ওদের বলেছে যে নন্দী ক্ষ্যাপা যদি কৃপা করে তাহলে ও বেঁচে যাবে। সেই আশায় এসেছে ওরা।

একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কতক্ষণ এসেছেন আপনি ?"

প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে!

"নন্দীবাবার দর্শন পেয়েছেন ?"

"না, আমি তো কাউকেই দেখি নি।"

শ্মশানের ডোমটাও এসে জুটেছিল। সে বললে—"এখন বস খানিক—উ কখন যে কুথায় থাকে—কেউ বলতে লারে—"

সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় করে শব্দ হল একটা। ফিরে দেখি নদীর ধারের ঝোপ-ঝাড়-কাঁটাবন ভেঙে আবির্ভূত হচ্ছেন নন্দী ক্ষ্যাপা। বিরাট পুরুষ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জবা-ফুলের মতো লাল চোখ। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। বিরাট একটা মত্তমহিষ যেন। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে। আমিও করলাম।

"কি চাস এখানে ?"

ওদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে ব্যাপারটা নিবেদন করলে। শোনামাত্র লোকটা যেন ক্ষেপে গেল।

"বেরো শালা—বেরো—বেরো—বেরো বলছি এখান থেকে—"

একটা পোড়া কাঠ পড়ে ছিল, তাই নিয়ে তাড়া করলে। পুরুষগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। মেয়ে দুটি বসে রইল।

"তোরা আবার বসে রইলি কেন, যা না—"

তারা নড়ে না।

"ওঠ, ওঠ বলছি—"

তারা মাথা নীচু ক'রে কাঁদতে লাগল ব'সে ব'সে। তখন নন্দী ক্ষ্যাপা যা মুখে এল তাই বলে গাল দিতে লাগল। সে ভাষা এত অশ্লীল যে লেখা যায় না। কতকগুলো ইট পড়েছিল কাছে, তাই তুলে মারতে লাগল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। আমি আর এ দৃশ্য দেখতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ও করছিল। আমি তাড়াতাড়ি মন্দিরের পিছনের বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম সবাই চলে গেলে আস্তে আস্তে সরে পড়া যাবে। সমস্ত মনটা ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল। ইনিই সাধক! এঁরই এত নামডাক! ছি—ছি—ছি! এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।

হঠাৎ গালাগালির শব্দ থেমে গেল। মন্দিরের ভিতর পদশব্দ পেলাম। তারপরই—

"মা, সত্যিই বড় দুঃখী ওরা—যদি পারিস বাঁচিয়ে দে বাঁচিয়ে দে মা—তুই দয়াময়ী, ইচ্ছে করলে সব পারিস—" নন্দী ক্ষ্যাপার কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে এলাম। এসে দেখি নন্দী ক্ষ্যাপা মন্দির থেকে নেমে যাচ্ছে। কারও দিকে ফিরে চাইলে না। ঝোপঝাড় ভেঙে সোজা নেমে গেল নদীর খাতের মধ্যে।…

ফেরবার সময় দেখলাম মড়া আগলে মেয়ে দুটি তখনও বসে কাঁদছে। কষ্ট হ'ল। একটা বদ্ধ পাগলের উপর বিশ্বাস করে কি দুর্ভোগ এদের।

স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। হঠাৎ স্টেশনের বাইরে একটা শোরগোল উঠল। বেরিয়ে এলাম! এসে দেখি ভিড়ের মধ্যে সেই মেয়ে দুটি—তাদের মুখে হাসি ফুটেছে—আর তাদের সঙ্গে একটি যুবক। সবাই বলাবলি করছে—আশ্চর্য ক্ষমতা লোকটার। মড়াকে বাঁচিয়ে দিলে? আশ্চর্য!

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেকালের রায়-বাহাদুর

রায়বাহাদুর কর্তব্য কর্মে লিপ্ত ছিলেন।

গত কয়েক দিবস হইতে তাঁহার আহার-নিদ্রা নাই বলিলেও চলে। বিদ্রোহ-দমনার্থ সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিতে হইয়াছে। আইনভঙ্গকারী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিবার আদেশ দিয়া, বিদ্রোহী নেতাগণকে বন্দী করিয়া, পলাতক আসামীদের নামে সমন জারি করিয়া কর্তব্যপরায়ণ রায় বাহাদুর গত কয়েক দিবস হইতে আইন ও শান্তি রক্ষাকার্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, এ জাতীয় কার্য করিতে অভ্যস্ত নহেন। কিন্তু দেশের এই দুর্দিনে, স্বেচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়াই, তাঁহাকে এই সকল অপ্রিয় কর্তব্য করিতে হইতেছে। তিনি ইহা জানেন যে, জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিলে অনেক নিরীহ লোকও মারা পড়ে। যাহারা পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নির্দোষ লোক থাকাও অসম্ভব নহে; কিন্তু কি করিবেন তিনি! কেহই যে আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতেছে না, সকলেই যে আইনভঙ্গ করিতে বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় নিক্তির ওজনে বিচার করিয়া চলিলে বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব। বিদ্রোহীদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে বিভীষিকাপূর্ণ বিকটতা প্রয়োজন। এই আকস্মিক বিপদ হইতে, যে কোন উপায়েই হউক, দেশকে রক্ষা করা প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। তিনি কর্তব্যে অবহেলা করিতে অপারগ।

রায় বাহাদুর একাগ্রচিত্তে লিখিতে লাগিলেন।

রায় বাহাদুর দেশদ্রোহী নহেন। তিনিও স্বদেশহিতৈষী। কিসে দেশের মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল, তাহা তাঁহার অবিদিত থাকিবার কথা নহে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ইতিহাসেই প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। এতকাল শাসন-বিভাগে কর্ম করিয়া তিনি দেশের কার্যই করিয়াছেন এবং মর্মে মর্মে ইহাই বুঝিয়াছেন যে ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুগত্য করিলেই ভবিষ্যতে হয়তো আমরা কোন দিন স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব। ইহা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই।

যাঁহারা অন্য পন্থার কথা চিন্তা করিয়া স্বল্পবুদ্ধি অথবা দুষ্টবুদ্ধিবশে উত্তেজনা-প্রবণ জনতাকে বিপথে চালিত করেন এবং দেশের অগ্রগতিকে পিছাইয়া দেন, তাঁহারা উন্মার্গগামী বাতুল মাত্র। গারদই তাঁহাদের যোগ্য স্থান।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রায় বাহাদুর লেখনী সংযত করিলেন। দূরে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে। কিন্তু সময় নষ্ট করিলে চলিবে না, রিপোর্টটা আজই লিখিয়া ফেলিতে হইবে। আবার কাজে মন দিলেন।

—লুঠতরাজ করিলে আমরা স্বাধীন হইব? রেল-স্টেশন, পোস্টঅফিস পোড়াইয়া দিলেই স্বরাজ হইবে? টেলিগ্রাফের তার কাটিলেই বৃটিশ-সাম্রাজ্য পঙ্গু হইয়া যাইবে? ইহারা ক্ষ্যাপা, না পাগল!

যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায়, ইহাদের দৌলতেই যাইবে। ইতিহাসের নজির তুলিয়া রায় বাহাদুর অনায়াসেই প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, ইংরেজ-শাসনের প্রভাবে আমরা কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ সুসভ্য আত্মসচেতন জাতিতে পরিণত হইতেছি এবং ভবিষ্যতে ক্রমশ কিরূপে সুপক্ব হইয়া অবিমিশ্র স্বাধীনতা-লাভে সমর্থ হইব। এখনও যে আমরা অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অসমর্থ আত্মকলহপরায়ণ সুবিধাবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক জনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া অর্থহীন। যোগ্য হইলেই ব্রিটিশ জাতি যে আমাদের স্বাধীনতা দিতে ইতস্তত করিবেন না, এ বিষয়ে রায় বাহাদুর নিঃসন্দেহ। যোগ্যের সমাদর করিতে বৃটিশ জাতি কখনও পরাঙ্মুখ নহেন—ইহার প্রমাণ তিনি নিজেই। অখ্যাত বংশে তাঁহার জন্ম। দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্র তিনি। অসীম কষ্ট সহ্য করিয়া প্রভূত অধ্যবসায়বলে তিনি বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন; গুণগ্রাহী ইংরেজ তাঁহার সে দুরূহ তপস্যার জন্য অভীষ্ট বরদান করিয়াছেন।

বন্দে মাতরম্, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—কোলাহলটা ক্রমশ নিকটবর্তী ও প্রবল হইয়া উঠিল।

বন্দে মাতরম্—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

বন্দে মাতরম্—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

বন্দে মাতরম্—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

চীৎকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল।

দুম—দুম—দুম—দুম—

গুলি-বর্ষণ শুরু হইয়া গেল। তারপর সব চুপ। রায় বাহাদুর উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, ভীরুর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতেছে। একটা লোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় মারা গিয়াছে। তাহার হাতে কংগ্রেসের পতাকা। রায় বাহাদুর নামিয়া গেলেন। রক্তাক্ত দেহটার পানে চাহিয়া ক্ষণিকের জন্য তাঁহার হৃদস্পন্দন থামিয়া গেল। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ক্ষণিকের জন্য তিনি বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। পর মুহূর্তেই মোটরে চড়িয়া কমিশনার-ভবনের উদ্দেশ্যে তিনি ছুটিতে লাগিলেন—নির্বোধ ছেলেটার হঠকারিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

অপূর্ব কৌশল

প্রায় সাত ফুট লম্বা লোকটাকে লইয়া সত্যই সকলে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। এই বিদেশী লোকটা প্রথম যখন আসিয়াছিল, তখন—ভদ্রলোক মাত্রেরই যেমন করা উচিত—আমরা উহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম। লোকটাও প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ সদ্ব্যবহার করিয়া সকলের মনোহরণ করিয়াছিল। গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে খেলনা দিত, কাহারও রোগ হইলে সাগ্রহে সেবা করিত, গ্রামোফোন বাজাইয়া বিলাতী সঙ্গীত শুনাইত, ধর্মকথা তত্ত্বকথা অনেক কিছু বলিত। সত্য কথা বলিতে কি আমরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। লোকটা যাহাতে গ্রামে বসবাস করে, বদ্ধপরিকর হইয়া সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম। আমাদেরই আনুকূল্যে বেশ কিছু জমিজমা লইয়া লোকটা গ্রামের মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। এখন কিন্তু আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। লোকটা নিজমূর্তি ধরিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি করে। চুরি করিবার পদ্ধতিটাও অদ্ভুত। বলিয়া কহিয়া চুরি করিতেছে। অন্যত্র কোথায় নাকি ভয়ানক খাদ্যাভাব—সেখানে খাদ্য পাঠাইতে হইবে, যেমন করিয়া হউক পাঠাইতে হইবে। পাঠাইতেছে। এমন একটা মানবহিতৈষীকে বাধা দিতে অনেকের বিবেকেই বাধিতেছে। লোকটা নিজে লম্বা, কিন্তু ভাব করিয়াছে যত বেঁটের সঙ্গে, বিশেষতঃ তরলমতি বালকেরা খেলনার লোভে উহার পদানত বলিলেই হয়। বেঁটেরা সবাই গদগদ।

কোন তরকারিওয়ালী হয়তো মাথায় তরকারির ঝাঁকা লইয়া বাজারে যাইতেছে। লোকটা হাঁকিল, এই, দাঁড়াও। দাঁড়াইবামাত্র বেঁটেগুলো তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, প্রত্যেক বেঁটের হাতেই একটা করিয়া থলি—লম্বা লোকটা লম্বা হাত বাড়াইয়া টপ টপ করিয়া ঝাঁকা হইতে তরকারি তুলিয়া বেঁটেদের থলিতে ফেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঝাঁকা খালি এবং থলি ভরতি হইয়া গেল। বেঁটেরা থলি কাঁধে করিয়া সরিয়া পড়িল। তরকারিওয়ালী যখন দাম চাহিল, তখন লম্বা লোকটা বলিল, দেখ বাপু, মানবের হিতার্থে এই তরকারি লইয়াছি। লাভ করিও না, ন্যায্য মূল্য লও।

এক পয়সা, দুই পয়সা—যা প্রাণ চাহিল, দিয়া দিল। কখন বা দিলই না। গরিব বেচারীরা ভয়ে কিছু বলিতেই পারে না। একজন নাকি প্রতিবাদ করিয়াছিল, লম্বা হাতের চড় খাইয়া নিরস্ত হইয়াছে।

লম্বা হওয়াতে লোকটার সুবিধা অনেক। হাত বাড়াইয়া গাছ হইতে ফল পর্যন্ত পাড়িয়া লইতে পারে। সেদিন ধনেশ্বরের চাল হইতে কয়েকটা কুমড়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। যেখানে নাগাল পায় না, সেখানে বেঁটেরা আছে—মর্কটের মত চড়িয়া পাড়িয়া আনে। কিছু বলিবার উপায় নাই। মানবহিতৈষীকে বাধা দিবে কে? তা ছাড়া, চড়ের ভয় আছে।

লোকটা এত লম্বা যে, আমাদের মত সাধারণ উচ্চতাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইলে ঊর্ধ্বমুখে করিতে হয়। একবার আলাপ শুরু করিলে নড়িবারও উপায় থাকে না, এমন মনোরম আলাপ যে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। কথা বলিবার ক্ষমতা আছে লোকটার। সেদিন আমরা জন কয়েক উহার পাল্লায় পড়িয়াছিলাম, ঊর্ধ্বমুখে তন্ময়চিত্তে আলাপ শুনিতেছিলাম, বেঁটেগুলা আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেঁটেগুলা সর্বদাই উহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আলাপ শেষ করিয়া বেঁটের দল লইয়া লোকটা যখন চলিয়া গেল, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, আমাদের সকলের পকেট কাটা। আমাদের ঊর্ধ্বমুখ ও মুগ্ধভাবের সুযোগ লইয়া বেঁটেগুলাই আমাদের পকেট মারিয়াছে।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

যা থাকে কপালে বলিয়া লাঠি সোঁটা যাহার যাহা ছিল লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হয়তো একটা এস্পার ওস্পার হইয়া যাইত, যদি না অপূর্ববাবুর সহিত দেখা হইত। কিছু দূর গিয়া অপূর্ববাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। অপূর্ববাবু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাঁহাকে আমাদের দলে পাইলে আরও জোর পাইব এই ভরসায় আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে আমাদের দলে যোগ দিতে অনুরোধ করিলাম।

সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হঠকারিতা করিবেন না। আমার সঙ্গে আসুন—

গেলাম।

নিজের বৈঠকখানায় আমাদের বসাইয়া অপূর্ববাবু আমাদের প্রশ্ন করিলেন, আপনারা এ কথা স্বীকার করেন কি না যে, শূকর এবং শৃগাল মানবজাতির পরম শত্রু—বিশেষ করিয়া কৃষকদের ?

নিশ্চয়ই।—সকলে স্বীকার করিলাম।

এ কথা স্বীকার করেন কি না যে, ওই ভদ্রলোক আজকাল বন্দুক দিয়া শূকর এবং শৃগাল মারিতেছেন ?

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোকটার অনেক জমিজমা আছে, ফলাও রকম চাষও করে, নিজের ফসল রক্ষা করিবার নিমিত্তই উহাকে শূকর শৃগাল কেন, বহুবিধ জন্তু মারিতে হয়।

স্বীকার করিলাম।

প্রায় জ্যামিতিক পদ্ধতিতে অপূর্ববাবু তখন বলিলেন, অতএব স্বীকার করিবেন কি না যে, ওই লোকটি গৌণভাবেও আমাদের উপকার করিতেছেন ?

অঙ্কে বরাবরই কাঁচা ছিলাম, স্বীকার করাই নিরাপদ বলিয়া মনে হইল।

বিজয়ীর মত অপূর্ববাবু তখন প্রশ্ন করিলেন, উপকারী ব্যক্তিকে কি মারা উচিত ?

এতদুত্তরে কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

দীনু ময়রা আমাদের মনোভাবকে ভাষা দিল।

কিন্তু লোকটি আমাদের অবস্থা যে শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সেদিন আমার দোকান হইতে সন্দেশ রসগোল্লা সব তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, মায় কড়াসুদ্ধ।

মৃদু হাসিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, সব জানি। তাহার ব্যবস্থাও ভাবিয়া রাখিয়াছি। অত্যুচ্চঃ পতনায় চ—সংস্কৃত এ কথাটা আপনারা মানেন কি ?

মানি বইকি।

ওই সূত্র ধরিয়াই ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকটাকে ক্রমাগত উঁচু করিয়া দিতে হইবে। আরও জমিজমা আরও ধনসম্পত্তি আরও প্রতাপ-প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দিয়া উহাকে খুব বেশি উঁচু করিয়া তুলিলেই উহার পতন অনিবার্য ! লোকটার জুতা পরার শখ আছে, লক্ষ্য করিয়াছেন কি ?

করিয়াছি।—স্বীকার করিলাম।

উহার এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আমি ছোটখাট আর একটা ব্যবস্থাও করিয়াছি। আসুন।

ভিতরের একটা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সুদৃশ্য কিন্তু প্রায় একফুট উঁচু-হীল-ওয়ালা একজোড়া জুতা একটি টেবিলের উপর শোভা পাইতেছে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, লোকটাকে ক্রমাগত উঁচু করাই আমার লক্ষ্য। মতলব করিয়াছি, এই জুতা-জোড়া পরাইয়া তাহার শারীরিক ভারকেন্দ্রে অসাম্য সৃষ্টি করিব। লোকটা এমনিতেই বেশ লম্বা, তাহার উপর শখের বশবর্তী হইয়া এই জুতা-জোড়া পায়ে দিয়া যদি চলিতে চেষ্টা করে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে আপনিই মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। লাঠিসোঁটা কিছুরই দরকার হইবে না।

বলিলাম, কিন্তু আপনি যে বলিতেছেন, শূকর শৃগাল ধ্বংসের জন্য উহাকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার?

আপাতত নিশ্চয়ই দরকার। উহাকে ক্রমাগত উঁচু করিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখীই মরিবে। বেশি বলশালী হইয়া শূকর-শৃগালও মারিবে, এবং অতুচ্চঃ পতনায় চ—এই সূত্র অনুসারে নিজেও শেষ পর্যন্ত মরিবে। রাশিয়ার জারের ইতিহাস জানেন না?

দীনু ময়রা সবিস্ময়ে জুতা-জোড়াটাই পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কোন ভদ্রলোক কি এ রকম জুতা পরিতে রাজী হইবে?

রাজী করাইতেই হইবে। জোর করিয়া, হাত জোড় করিয়া, যেমন করিয়া হউক। প্রয়োজন হইলে পায়ে তুলিসহযোগে তেল মাখাইয়া ভেলভেট-মোড়া শু-হর্নের সাহায্যেও এ জুতা উহাকে পরাইব ঠিক করিয়াছি। দেখুন না, কি করি—

আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম।

অপূর্ব রহস্য

সেদিন অপূর্ববাবু বেশ একটি রহস্য করিলেন। দেবু আসন পাতিয়া বসিয়া ছিল। সম্মুখে রেকাবিপূর্ণ সন্দেশ, পাশে জলপূর্ণ গ্লাস। দেবু সন্দেশগুলির সদ্ব্যবহার করিতে যাইবে, এমন সময় অপূর্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

দেবু। [স-সম্ভ্রমে] আসুন, অপূর্ববাবু। সন্দেশ খাইবেন ?

অপূর্ব। কি করিতেছ ?

দেবু। [স-সঙ্কোচে] সন্দেশগুলি খাইব ভাবিতেছি।

অপূর্ব। তোমার নাম কি ?

দেবু সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

দেবু। আমার নাম কি আপনি জানেন না ?

অপূর্ব। তবু বল না শুনি।

দেবু। আমার নাম দেবু।

অপূর্ব। আর কোন নাম নাই ?

দেবু। ভাল নাম দেবতাচরণ।

অপূর্ব। সন্দেশগুলি কে খাইবে ? দেবু, দেবতা, চরণ, না দেবতাচরণ ?

দেবু। [ভ্যাবাচাকা খাইয়া] আজ্ঞে ?

অপূর্ব। তোমার নাম সম্পর্কে চারিটি শব্দ পাইতেছি। দেবু, দেবতা, চরণ এবং দেবতাচরণ। সন্দেশগুলি কে খাইবে ?

দেবু একটু চিন্তিত হইল। কিয়ৎকাল চিন্তার পর একটি সদুত্তর তাহার মাথায় আসিয়া গেল।

দেবু। সন্দেশগুলি আমি খাইব।

অপূর্ব। তুমি কে ?

দেবু। আমি দেবু।

অপূর্ব। তোমার নামটাই কি সন্দেশ খাইবে ?

দেবু। আজ্ঞে না, আমি খাইব।

অপূর্ব। [অধীরভাবে] তাই তো প্রশ্ন করিতেছি—তুমি কে ?

দেবু। [ঈষৎ চটিয়া] আমি দেবু।

অপূর্ব। তুমি কে, তাহা তুমি জান না দেখিতেছি।

দেবু। মানে ?

অপূর্ব। বহু-কিছু তোমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তুমি জান না।

দেবু। প্রচ্ছন্ন আছে !

অপূর্ব। আছে। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাও ? রাগ করিও না, বল, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাও ?

দেবু চুপ করিয়া রহিল। অদ্ভুত রকম প্রখর দৃষ্টিতে অপূর্ববাবু দেবুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবু কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

অপূর্ব। [ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া] বল, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাও ?

দেবু। [স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে] চাই।

অপূর্ব। দেবতা এবং চরণ দুইটি শব্দ মাত্র ইহাই তোমার ধারণা। শাস্ত্রে কিন্তু বলিয়াছে শব্দব্রহ্ম। শঙ্করের মতে জীবাত্মাই ব্রহ্ম। দুইটি জীবের সমন্বয়ে তুমি দেবতাচরণ হইয়াছ, তাহা জান কি ?

দেবু। আজ্ঞে না।

অপূর্ব। দেখাইতেছি। [দ্বারের দিকে চাহিয়া] ওরে, তোরা আয়—

ছিরু ধোপা এবং মুন্সী চামার প্রবেশ করিল।

অপূর্ব। [ছিরুকে] তোমার নাম কি ?

ছিরু। দেবতা।

অপূর্ব। [মুন্সীকে] তোমার নাম কি ?

মুন্সী। দেবতা।

অপূর্ববাবু স্মিতমুখে দেবুর দিকে চাহিলেন।

দেবু। [সবিস্ময়ে] কিন্তু আমি তো জানিতাম উহাদের নাম ছিরু এবং মুন্সী।

অপূর্ব। ভুল জানিতে। আরও দেখাইতেছি। উপসর্গ কাহাকে বলে জান ?

দেবু। উপসর্গ ?

অপূর্ব। হ্যাঁ, উপসর্গ।

দেবু বাল্যকালে পঠিত ব্যাকরণ স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া কিঞ্চিৎ কৃতকার্য হইল।

দেবু। যে শব্দের রূপান্তর হয় না, তাহাকে উপসর্গ বলে। কিন্তু যাহা অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া—যুক্ত হইয়া—

অপূর্ব। উহাতেই হইবে। আর শুনিতে চাই না। দেবতা এবং চরণ এই দুইটি শব্দের উপসর্গযুক্ত রূপ এক-প্রস্থ দেখ। [দ্বারের দিকে চাহিয়া] ওহে, তোমরা এস—

রমেন, হরিশ, যতীন, স্থরেশ, কালী, বিপিন, স্থখেন, শ্যাম প্রবেশ করিল। সকলেই তরুণবয়স্ক ছাত্র, সকলেই অপূর্ববাবুর ভক্ত। সকলেই মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

অপূর্ব। তোমাদের প্রত্যেকের নাম কি বল।

রমেন, হরিশ, যতীন, স্থরেশ, কালী, বিপিন, স্থখেন ও শ্যাম নিজেদের নাম বলিয়া চলিল—উপদেবতা, অপদেবতা, অতি-দেবতা, অভি-দেবতা, সঞ্চরণ, দুশ্চরণ, বিশ্চরণ, বিচরণ ও আচরণ।

অপূর্ববাবু স্মিতমুখে দেবুর দিকে চাহিলেন।

দেবু। ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতেছি না।

অপূর্ব। ইহাদেরও কাহারও মধ্যে দেবতা এবং কাহারও মধ্যে চরণ আছে। ইহাদের প্রত্যেকেই তোমার ওই সন্দেশের অংশভাক।

দেবু। [সচকিত] তাই নাকি? ইহাদের সন্দেশ খাওয়াইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু জোর করিয়া লুঠিয়া খাইবে নাকি?

অপূর্ব। তোমার করুণার প্রত্যাশী ইহারা নহে, কারণ তোমার সন্দেশে ইহাদের সম্যক অধিকার আছে। না দিলে জোর করিয়াই লইবে।

দেবু। তাহা হইলে ভূতোকে ডাকিতে হইল দেখিতেছি।

অপূর্ব। ভূতো ব্যক্তিটি কে?

দেবু। আমার ভৃত্য।

অপূর্ব। তাহাকে ডাকিবার প্রয়োজন নাই। [রমেনকে] বাহিরে আর ছেলে আছে?

রমেন। আছে।

অপূর্ব। তাহাদের 'ভূত' শব্দের পোশাক পরাইয়া লইয়া আইস।

রমেন চলিয়া গেল।

অপূর্ব। [দেবুকে] নামটা কিছু নয়, বাহিরের পরিচয় মাত্র। জীবাত্মাই আসল বস্তু। নাম মাত্রেই এক বা একাধিক শব্দের সমন্বয়। শব্দ অর্থেও যে জীবাত্মা, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি।

ক্যাবলা, জটু, টিপ্‌লে, পুতু, হাবুল ও গদাই সমভিব্যাহারে রমেন প্রবেশ করিল।

অপূর্ব। তোমাদের নাম কি বল ?

ক্যাবলা প্রভৃতি পর পর উত্তর দিল—প্রভূত, পরাভূত, সম্ভূত, অনুভূত, উদ্ভূত, অভিভূত।

অপূর্ববাবু স্মিতমুখে দেবুর দিকে চাহিলেন।

দেবু। ক্রমাগত লোক জুটাইতেছেন, ইহার মানে কি ?

অপূর্ব। ইহারা সকলেই তোমার সন্দেশের ন্যায্য অংশীদার।

দেবু। এ তো বড়ই তাজ্জব ব্যাপার।

অপূর্ব। [সকলের দিকে চাহিয়া] তোমাদের কি সন্দেশ খাইবার ইচ্ছা নাই ? স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া বল।

এইখানে একটু গোল হইল। মুখস্থ-করা কথা সব সময়ে মনে থাকে না। সর্বসমক্ষে অপূর্ববাবু স্মারকের কার্যও করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ সত্য সত্যই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ফেলিল।

দেবতা। আমার মহাশয় নিমকি ভাল লাগে।

চরণ। আমার পাটালি।

কলেজের ছোকরারা তাহাদের নব-উপাধি-অনুযায়ী কবিত্বময় চটুল উক্তি করিতে লাগিল।

উপদেবতা। আমি চাই ঘাড়।

অপদেবতা। আমি চাই মাছ।

অতি-দেবতা। আমার কাম্য হবির সূক্ষ্মতম বায়বীয় অংশটুকু।

অভিদেবতা। আমি মাংসাশী।

সঞ্চরণ। আমি খাইতে চাই না, বেড়াইতে চাই।

বিচরণ। আমিও। কিন্তু তোমার মত অত ধীরে ধীরে নয়।

দুশ্চরণ। খাইতেও নয়, বেড়াইতেও নয়, আমার কেবল লাথি মারিতে ইচ্ছা করে।

আচরণ। আমার ইচ্ছা করে উপদেশ দিতে।

প্রভূত। আমি যেরূপ স্থূল, তাহাতে আর খাওয়া কি ঠিক ?

পরাভূত। আমার এ বিষয়ে কিছু বলাটাই অশোভন।

অপূর্ববাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

অপূর্ববাবু। [ধমক দিয়া] সাম্যের খাতিরে সকলেরই অন্তত স্বীকার করা উচিত যে সন্দেশ তোমাদের সকলের প্রিয়।

সকলে। সাম্যের খাতিরে নিশ্চয়ই।

অপূর্ব। [সহাস্যে] তোমরা তাহা হইলে সকলেই এ সকল খাইতে ইচ্ছুক ?

সকলে। সাম্যের খাতিরে নিশ্চয়—

অভিভূত এতক্ষণ কিছু বলে নাই। এইবার সে করজোড়ে হৃদয়ভার লাঘব করিবার প্রয়াস পাইল।

অভিভূত। প্রভু একটি নিবেদন আছে।

অপূর্ব। কি বল ?

অভিভূত। সন্দেশগুলি আপনি ভক্ষণ করুন। আপনি সকলের জন্যই চিন্তা করিয়াছেন, করেন নাই কেবল নিজের জন্য। অহো, কি মহত্ত্ব! অথচ আমি জানি, আপনি সন্দেশ কত ভালবাসেন।

দেবু ব্যতীত বাকি সকলে। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অপূর্ব। তোমাদের সকলেরই এই মত নাকি ? [দেবুকে] তোমার ?

দেবু। আমি তো আগেই আপনাকে ভাগ দিতে চাহিয়াছিলাম, আপনি খাইবেন, তাহাতে আর আপত্তি কি! খান না।

অপূর্ব। তোমরা যখন সকলে বলিতেছ—

অপূর্ববাবুর মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটিল। রেকাবিটি তুলিয়া তিনি সন্দেশগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অপূর্ব-বিজ্ঞান

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল।

পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। কি সর্বনাশ, আমাদের সকলেরই যে খড়ের চাল! সবেগে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহির হইয়া বুঝিলাম, ডাকাত পড়িয়াছে। তাহারাই আগুন লাগাইয়াছে। লোকগুলা কোথায় গেল? বাঁশ-ফাটার শব্দ ছাড়া আর তো কোন শব্দ নাই। বারান্দা হইতে নামিতেই নাকে প্রচণ্ড একটা ঘুষি খাইয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। নিমেষ মধ্যে কয়েকজন আসিয়া আমার হাত-পা-মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বাঁচিয়া গেলাম, একজন ডাকাত একটু ঝুঁকিয়া আমার মুখটা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আরে, এ যে ডাক্তারবাবু! এঁকে ছেড়ে দাও। উপকারী ব্যক্তিটি কে, চিনিতে পারিলাম না। মুখোশ পরা ছিল। সকলেরই মুখোশ পরা। আমাকে খুলিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। তাহাদের নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে বিস্মিত হইলাম। বুঝিলাম, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হাত-পা-মুখ শক্ত করিয়া বাঁধা, তাই টুঁ শব্দটি নাই।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কি কর্তব্য ভাবিতে গিয়া কিন্তু হতাশ হইয়া পড়িতে হইল। এই বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি একা কি করিতে পারি! সহসা নারীকণ্ঠের আর্তনাদে চমকাইয়া উঠিলাম। একটু আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, শুধু লুণ্ঠন নয়, ধর্ষণও চলিতেছে। মনে হইল, প্রতিবাদ করা উচিত। চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিলাম, কেহ আমার কথা শুনিল না। নিকটেই একটা থান ইট পড়িয়া ছিল, উত্তেজনাবশত তাহাই তুলিয়া একটা দস্যুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে কে আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

"কি করছেন, আসুন আমার সঙ্গে, ইট ফেলে দিন।"

ফিরিয়া দেখিলাম, প্রতিবেশী অপূর্ববাবু। প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি। বরাবর সমীহ করিয়া থাকি। ইট ফেলিয়া দিলাম।

"আসুন আমার সঙ্গে।"

বাড়ির পিছনে ঘেঁটুবন ছিল। অপূর্ববাবুর নির্দেশ অনুসারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, আমার এবং অপূর্ববাবুর পরিবারবর্গও ইতিপূর্বে তথায় সমাবিষ্ট হইয়াছেন—সম্ভবত অপূর্ববাবুরই প্রাজ্ঞতার ফলে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, "মাথা ঠিক রাখুন। আমাদের আসল গলদটা কোথায় বুঝুন। আসল গলদ একতার অভাব। একতা থাকলে কি পাড়ায় ডাকাত পড়তে পারে? খামখা একটা ইট ছুঁড়ে কি করবেন আপনি? মূল সমস্যাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই ধরুন না, রুশদেশে—"

অপূর্ববাবু নিম্নকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান রাজনীতি সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে বিজ্ঞ অপূর্ববাবুর নখদর্পণে প্রাণপণে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, আমাদের আসল গলদ কোথায়!

লুণ্ঠন চলিতে লাগিল।

প্রতিবাদ

ট্রেনে একটা বই পড়তে পড়তে আসছিলাম। বইটিতে লেখক মহাশয় অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেছেন। তথ্য-প্রমাণ-সহকারে বলেছেন যে আমাদের দেশের নৈতিক অধঃপতনের কারণ শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই অর্থাভাবে স্কুলে যেতে পারে না। ফলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন ভদ্রলোক পাশের বেঞ্চিতে ছিলেন। অনেকক্ষণ থেকেই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বইটার দিকে। বইটা মুড়ে রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন—একবার দেখি বইখানা, দিন তো—

দিলাম।

তিনি একাগ্রচিত্তে পড়তে লাগলেন। আমি জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। দূর চক্রবালরেখায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নানাবর্ণের রঙীন মেঘ বিচিত্র পোশাক প'রে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন কোনও সম্রাট বিদায় নিচ্ছেন আর বড় বড় রাজা মহারাজা আমীর ওমরার দল সমবেত হয়েছেন তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন দেবার জন্য।

পরের স্টেশনেই নেমে আমাকে জাহাজে উঠতে হবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। তাড়াতাড়ি কুলি যোগাড় ক'রে দ্রুত গিয়ে যদি না পৌঁছতে পারি তাহলে জাহাজে স্থান পাব না। সারাটা পথ দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

স্টেশনে আসতেই তাড়াতাড়ি কুলি ডেকে জিনিসপত্র তার মাথায় চড়িয়ে রওনা হলাম জাহাজের দিকে। প্রচণ্ড ভীড়। ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি ক'রে অগ্রসর হতে লাগলাম তবু। জাহাজে উঠবার মুখে ভীড়টা পুঞ্জীভূত হয়ে গেল। টিকিট চেকার প্রত্যেকের টিকিট পরীক্ষা ক'রে তবে জাহাজে উঠতে দিচ্ছিলেন।

আমারও টিকিট দেখাবার পালা এল। চামড়ার মানিব্যাগ থেকে টিকিট বার ক'রে হাতের মধ্যে রাখলাম। ব্যাগটা রাখলাম বুক পকেটে। জাহাজে উঠে সৌভাগ্যক্রমে বসবারও জায়গা পেলাম। দুর্ভাগ্য কিন্তু পাশেই যে দাঁড়িয়েছিল তা বুঝতে পারি নি। কুলিকে পয়সা দিতে গিয়েই টের পেলাম যে মানিব্যাগটা বুক পকেট থেকে তুলে নিয়েছে কে ভীড়ে। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাইতে

লাগলাম। কুলি জিনিসপত্র নামিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল পাগড়ি খুলে। তার মুখের দিকে চেয়ে আরো ভীত হ'য়ে পড়লাম। লোকটা চেনা, আগে কশাই ছিল। এ কি শুনবে কোনও কথা? শুনুক আর না-ই শুনুক, সত্যিকথা বলতে হল। একটা রূঢ় কিছু প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু সে সেলাম ক'রে মৃদু হেসে বললে—"আমার পয়সার জন্যে ভাববেন না বাবু। আপনার কাছ থেকে আমার পয়সা মারা যাবে না। কিন্তু ব্যাগটা—চুরি গেল—বড় আফসোসের কথা। আচ্ছা, যাই বাবু"—পুনরায় সেলাম করে চলে গেল।

যে ভদ্রলোকটি ট্রেনে আমার কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি দেখলাম এক কোণে বসে' আমার বইটি পড়ছেন। গেলাম তাঁর কাছে। সব কথা বললাম। তিনি হেসে বইটা দেখিয়ে বললেন—এ ভদ্রলোক ঠিকই লিখেছেন; ছোটলোকেরা শিক্ষিত না হ'লে আমাদের আর গতি নেই। একজন চা-ওলাকে তিনি বোধ হয় চা আনতে বলেছিলেন। সে চা দিয়ে গেল। আমারও খুব ইচ্ছে করছিল চা খাবার, কিন্তু আমি কপর্দকশূন্য, লোভ সম্বরণ করতে হ'ল। সে ভদ্রলোকও নির্বিকারচিত্তে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমার বইটা পড়ে যেতে লাগলেন। আমাকে এক কাপ চা খাওয়াবার কথা তাঁর মনেও এল না।

আমার দুর্ভাবনা হ'তে লাগল ওপারে গিয়ে কি হবে। টিকিট কলেকটারকে সব কথা বলেছিলাম। তিনি হয়তো আমাকে গেট পার করে দেবেন—কিন্তু কুলি? বাস ভাড়া? ঘাট থেকে আমার বাড়ি প্রায় পাঁচ মাইল। অতদূর কি হেঁটে যেতে পারব রাত্রিবেলা?

ষ্টিমার ঘাটে ভিড়তেই সেই কুলিটা এসে দাঁড়াল আবার। বিনা বাক্যব্যয়ে আমার জিনিসগুলো মাথায় তুলে নিল। আমি পিছু-পিছু চলতে লাগলাম। বাসের কাছে গিয়ে সে সটান বাসে আমার জিনিসপত্র তুলে দিলে। আমি বললাম, "বাসে জিনিস তুললে কেন, আমার যে—" বাক্য সম্পূর্ণ করবার পূর্বেই সে তার কোমর থেকে গেঁজে বার ক'রে তার সমস্ত দিনের উপার্জন আমাকে দিয়ে বললে, "আপনি নিয়ে যান—আমি কোনও সময়ে নিয়ে আসব এখন—"

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার এক ভাই কাছে থাকে। পকেটে ছোট একটা পকেটবুক ছিল। তার থেকে একটা পাতা

ছিঁড়ে আমার ভাইকে লিখে দিলাম, "এ লোকটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে দিও। আমি গিয়েই টাকাটা তোমায় পাঠিয়ে দেব।"

কাগজটা দিয়ে বললাম, "আমার ভাইকে এই চিঠিটা দিও. সে তোমাকে তোমার পয়সা দিয়ে দেবে।" সে সেলাম করে চলে গেল। আমি নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌছলাম।

তারপর দিন সকালেই দেখি কুলিটা আবার এসে হাজির হয়েছে। ভাবলাম আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি বোধহয়।

সেলাম ক'রে বললে, "হুজুর, কাল আপনি ভুল ক'রে বেশি টাকার কথা আপনার ভাইকে লিখে দিয়েছেন। আমি আপনাকে আড়াই টাকা দিয়েছিলাম—আর আমার দু'বারের মজুরি আট আনা। সবসুদ্ধ তিন টাকা হয়। আপনি দু'টাকা বেশি লিখে দিয়েছেন।"

দুটি টাকা সে আমার সামনে রেখে দিল। বলা বাহুল্য, আমি ইচ্ছে করেই দু'টাকা তাকে বেশি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর সেকথা তাকে বলতে পারলাম না। তাকে দু'টাকা বখশিস করবার স্পর্ধা আমার হল না। চুপ করে রইলাম। হঠাৎ মনে পড়ল ট্রেনের সেই ভদ্রলোকটি আমার বইটি ফেরত দেননি—আমিও চেয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

প্রভেদ

চশমাটা খুলে আড়ময়লা খদ্দরের কাপড়ের কোঁচা দিয়ে সেটা আবার ভাল করে পরিষ্কার ক'রে নিলেন যোগেন্দ্রনাথ। ভাল ক'রে আবার চেয়ে দেখলেন। এবার বেশ দেখা গেল। আর ঝাপসা মনে হল না। অতীতের কুয়াশাটাও কেটে গেল। তরুণকান্তি ক্ষুদিরামের ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন পক্ককেশ যোগেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, সেই মুখই বটে। তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল। ক্ষুদিরাম আজ শহীদ। কাগজে কাগজে সভায় সমিতিতে ঘরে-বাইরে তার জয়-জয়কার। অথচ—

"যোগেনবাবু উঠুন, মল্লিক সাহেব এসেছেন—" কে যেন বলল কানের কাছে। ত্রস্ত যোগেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারটা খালি ছিল বলে বসেছিলেন তিনি। তাঁর আপিসের মনিব মিস্টার মল্লিক! ক্ষুদিরামের স্মৃতি সভাতে বিলাতী স্যুট চড়িয়ে যদিও আসেননি, তবু বিলাতী গন্ধটা সম্পূর্ণ ঢাকতে পারেন নি তিনি। তাঁর চোখে মুখে চলার ভঙ্গীতে ঠোঁট-বাঁকানো ঈষৎ হাসির কায়দায় মিস্টার মল্লিক নিজের অজ্ঞাতসারেই যে ভাব ফুটিয়ে তুলছিলেন তা নিতান্তই বেমানান মনে হচ্ছিল এই সভায়। ক্যাপস্ট্যান টোবাকোর গন্ধ বিকিরণ করতে করতে চেয়ারটা টেনে বসলেন তিনি। যোগেনবাবু সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক পাশে। সঙ্কুচিতভাবে নমস্কারও করলেন একটা। কিন্তু মিস্টার মল্লিক সেটা দেখতে পেলেন না। ক্ষুদিরামের ছবির দিকে চেয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ যোগেনবাবুর মনে হল সেই অগ্নি-যুগের দৌলতেই মিস্টার মল্লিকও আজ তার মনিব হয়েছেন। এরই কোন এক আত্মীয় সে যুগে পুলিশের সি. আই. ডি. বিভাগে সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন। অগ্নি-যজ্ঞের অনেক হোতাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁর আত্মীয় স্বজনকে বড় বড় চাকরি দিয়েছেন। মিস্টার মল্লিক তাঁদেরই একজন। তা হোক তবু এঁরই দয়ায় যোগেন্দ্রবাবু চাকরিতে 'এক্‌স্‌টেনশন' পেয়েছেন।

সভায় গান হচ্ছিল—

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান
আজি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান—"

তন্ময় হয়ে শুনছিলেন যোগেনবাবু। হঠাৎ দেখতে পেলেন ভূপেন বাইরে থেকে হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে। হাতছানিটা এত প্রবল রকম মনে হল যে স্থিরচিত্তে আর গান শুনতে পারলেন না তিনি। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে হল। একজন ছোকরা তাঁর পায়ের কড়াটা মাড়িয়ে দিলে। অসহ্য যন্ত্রণায় শিউরে উঠল সমস্ত শরীরটা। তবু মুখটি বুজে বেরিয়ে এলেন, ক্ষুদিরামের স্মৃতিসভায় গোলমাল করা যায় না। তাছাড়া দোষ তাঁরই, গানের মাঝখানে এমন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

ভূপেন অবশ্য খুব সঙ্গত কারণেই ডাকছিল তাঁকে। বেরিয়ে আসতেই বললে— "রেশন কার্ডটা দিন। আজ জিনিস না কিনলে এ হপ্তার জিনিস যে আর দেবে না।"

রেশন কার্ড বাড়িতে বাক্সের মধ্যে আছে! একবার মনে হল চাবিটা দিয়ে দেন ভূপেনকে। কিন্তু সাহস হল না। বাক্সে গোটা কয়েক টাকাও আছে; ভূপেন যদি সরায় কিছু মুশকিলে পড়তে হবে। অনেকবার ঠকেছেন তিনি, অনেকবার প্রমাণ পেয়েছেন, ভূপেনকে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ ভূপেন ছাড়া চলেও না। বাজার করা, ওষুধ আনা, ডাক্তার ডাকা, পারমিটের জন্য সাপ্লাই আপিসে ধরনা দেওয়া— সবই ভূপেন করে।

ক্ষুদিরামের স্মৃতিসভা ফেলে দৌড়লেন যোগেনবাবু বাড়ির দিকে।

বাড়ি গিয়ে যখন পারমিট আর টাকা ভূপেনকে দিচ্ছিলেন তখন পাশের ঘর থেকে তাঁর অসুস্থ পুত্র খোকন বললে, "বাবা আমার জন্যে কমলালেবু আনতে দিও আজ। আবার ভুলে যেও না যেন—"

"আচ্ছা।"

ভূপেন বললে, "আজকাল আট আনায় একটা।"

"আচ্ছা এনো গোটা দুই।"

একটা টাকা বেশি দিলেন তাকে।

ভূপেনের ছোট বোন—যোগেনবাবুর ছোটশালী—টুনকি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বয়স তার পাঁচ বছর। ক্ষুদিরামের স্মৃতিসভায় সকলে গিয়েছিল, সে-ই কেবল যায় নি। যার জন্যে সে এতবড় লোভটা সংবরণ করেছিল তা-ও নিতান্ত তুচ্ছ করবার মতো নয়। মাথার ক্লিপ কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে তার দিদি বাড়িতে

রেখে গিয়েছিল তাকে অসুস্থ ছেলের তত্ত্বাবধান করবার জন্য। টুনকি বললে, "দিদি আমাকে কিলিপ দেবে বলেছে, দাদাকে সেটা আনতে দাও না জামাইবাবু।"

"আমি যখন নিজে বাজার যাব নিয়ে আসব"

অনিচ্ছাসহকারে টুনকিকে বলতে হল, "আচ্ছা—।"

তাকে আর একটু আশ্বস্ত করে যোগেনবাবু বললেন, "আমি বেশ ভাল দেখে নিয়ে আসব। ভূপেন ঠিক পছন্দ করতে পারবে না। কেমন?"

টুনকি এবার আনন্দে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। যোগেনবাবু পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। জ্বর বেশ আছে। ছেলে কিন্তু হেসে বললে, "আজ আমি বেশ ভাল আছি বাবা।"

যোগেনবাবু আবার বেরিয়ে পড়লেন স্মৃতিসভার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আবার বাধা। বাড়ি-ওলার সঙ্গে দেখা। লোকটি ভদ্র, কিন্তু বাড়ি-ওলা। একমুখ হেসে বললেন—"মাইনে পেয়েছেন না কি—"

"পেয়েছি। কিন্তু খোকাটার অসুখ। বড্ড খরচ হচ্ছে—তাই এ মাসের ভাড়াটা এখনও দিতে পারি নি—"

"ও, আচ্ছা—তাতে কি হয়েছে—দেবেন যখন সুবিধে হয়"

"হাতে টাকা হলেই দিয়ে দেব"

"বেশ, বেশ"

যোগেনবাবু আবার ধাবিত হলেন স্মৃতিসভার দিকে। মোড়টা ঘুরতে না ঘুরতে বৈকুণ্ঠবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"বিলটা পাঠিয়ে দেব না কি যোগেনবাবু? বেশী নয় উনিশ টাকা সাত আনা।"

আবার দাঁড়াতে হল। মোড়ের দোকানটা বৈকুণ্ঠবাবুর। তাঁর কাছে যোগেনের কৃতজ্ঞ থাকার কথা। ছেলের অসুখের সময় বাজারে যখন কোথাও হর্লিক্স্ পাওয়া যাচ্ছিল না, চিনি পাওয়া যাচ্ছিল না, বার্লি পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন এই বৈকুণ্ঠবাবুই সব যোগাড় করে দিয়েছিলেন কালোবাজার থেকে। দামটা দেওয়া হয় নি এখনও, টাকাও নেই এখন।

সুতরাং নমস্কারান্তে মৃদু হেসে বলতে হল—"সে আমার মনে আছে। আপনার ঋণ কি উনিশ টাকা সাত আনা দিলেই শোধ হবে বৈকুণ্ঠদা? আপনার ঋণ কোনও দিনও শোধ হবে না।"

প্রীত হলেন বৈকুণ্ঠনাথ।

"খোকা কেমন আছে আজকাল?"

"জ্বর চলছে—"

যোগেনবাবু গমনোদ্যত হতেই বৈকুণ্ঠ আবার বলল, "বিলটা পাঠিয়ে দেব কি?"

"আসছে মাসে দেব টাকাটা। অসুখের বাড়ি, বুঝতেই পারছেন, টাকা দাঁড়াতে পারছে না—"

বৈকুণ্ঠ চুপ করে রইলেন। তাঁর এই নীরবতার অর্থ বেশ প্রাঞ্জল। কিন্তু তাঁকে তোয়াজ করবার জন্যে যোগেনবাবু আর দাঁড়াতে পারলেন না। মোড় ঘুরে চলতে লাগলেন দ্রুতপদে। প্রায় ছুটতে লাগলেন। ক্ষুদিরামের স্মৃতিসভায় না যাওয়াটা ঘোরতর অন্যায় হবে তাঁর পক্ষে।

···ভীষণ ভিড় হয়েছে। ভিতরে আর ঢুকতে পারলেন না যোগেনবাবু। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সভা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। যে নব্যযুবকটি প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুধু উচ্ছ্বসিত নয়, উচ্চও। বাইরে থেকে বেশ শুনতে পাচ্ছিলেন যোগেনবাবু।—"যে বৃটিশের সিংহ-শক্তির ভয়ে সেদিন সমস্ত বিশ্ব কম্পমান ছিল, ভারতবর্ষ থেকে সেই বৃটিশ-সিংহ-শক্তির উচ্ছেদকল্পে নির্ভয়ে এগিয়ে গেল কে? বাংলা মায়ের দুরন্ত ছেলে কিশোর ক্ষুদিরাম। পরাধীনতার যে কারাগারে সমস্ত ভারত বন্দী ছিল সেদিন সেই কারাগারের পাষাণ প্রাচীরে মাথা কুটে রক্তাক্ত হয়ে মরেছিল কে? আমাদেরই ক্ষুদিরাম। সাম্রাজ্যবাদীর স্পর্ধিত দম্ভের শীর্ষে বজ্র হানতে হবে ঠিক করেছিল সেদিন বাঙালী, সেই বজ্রনির্মাণে প্রথম অস্থিদান করেছে কোন্ দধীচি? আমাদেরই ক্ষুদিরাম।"

ঘনঘন হাততালি পড়ল সভায়। যোগেনবাবু দেখতে পেলেন মল্লিক সাহেবও সোৎসাহে হাততালি দিচ্ছেন। সভা ভঙ্গ হল। রাস্তায় ভিড় করে চলতে লাগল সবাই। বড় বড় মোটরকারগুলো হর্ন দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। যোগেনবাবু রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। তাঁর মনে পড়ছিল নিজের অতীত জীবনের কথা। তিনিও অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন একদিন। ক্ষুদিরাম বন্ধু ছিল তাঁর। প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গেও আলাপ ছিল। যৌবনারম্ভের সেই অতীত দিনগুলো মনে পড়তে লাগল। ফুলার সাহেবের চাবুক খেয়ে সকলের মতো তিনিও সেদিন

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এদের উচ্ছেদ করতে হবে। প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু হল না। তিনি যে অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন তা জানাজানি হয়ে গেল যেন কি করে। বাবা দু'হাত ধরে বারণ করতে লাগলেন, মায়ের কান্না আর থামে না। যোগেনবাবুকে ও পথ ছাড়তে হল শেষকালে। বাবা-মার বারণ শুনে তিনি কি অন্যায় করেছিলেন? সহসা এতদিন পরে নিজেকেই এ প্রশ্ন করলেন তিনি আবার। বাবা-মা অমন ক'রে বাধা না দিলে তিনিও নিঃসন্দেহে একজন শহীদ হতে পারতেন। তাঁরও সাহসের অভাব ছিল না। সহসা তাঁর মনে হল—সারাজীবন ধরে' তিনি কি করলেন? কাজের মতো কোন কাজ করেছেন তিনি? এম. এ.-টা পাশ করেছিলেন অবশ্য, ভাল ভাবেই পাশ করেছিলেন,--কিন্তু তারপর? সুপারিশের অভাবে ভাল চাকরিও জোটেনি একটা। সামান্য কেরাণীগিরি করতে করতেই জীবনটা কেটে গেল। বাবার অনুরোধে বাবারই এক দরিদ্র বন্ধুর কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বাবা মা মারা গেছেন, শ্বশুরমশাইও মারা গেছেন। তাঁর সমস্ত সংসারটা এখন যোগেন বাবুর ঘাড়েই। বিধবা শাশুড়ী, তাঁর তিন মেয়ে, এক ছেলে। নিজের তিনটি নাবালক ভাইকে মানুষ করতে হয়েছে। তাঁর নিজের উপর্যুপরি পাঁচটি মেয়ে হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকটির বিয়ে দিয়েছেন। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাগুলি নিঃশেষিত-প্রায়, কিছু ঋণও হয়েছে। একমাত্র ছেলে খোকন এখনও মানুষ হয় নি। সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে সে। খোকন ভাল ছেলে, পনের টাকা বৃত্তি পেয়েছে, তার উপর যোগেনবাবুর অনেক আশা। ভাল করে যদি মানুষ করতে পারেন—কিন্তু পারবেন কি আর —জীবন তো শেষ হয়ে এল। যোগেনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। প্রকাণ্ড বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছেন—আর যেন পারছেন না। প্রতি দিন পলে পলে নিজের জীবনীশক্তি ক্ষয় ক'রে তিনি এই যে বিরাট পরিবার পালন ক'রে এসেছেন কি মূল্য আছে এর? এর জন্যে কেউ মনে ক'রে রাখবে না তাঁকে। যুগে যুগে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীদের নিয়ে সভা হবে, তাঁর কথা মনেও থাকবে না কারও। পরিবার পালন করার জন্যে কেউ কাউকে বাহবা দেয় না, তিনিও দেন না। অথচ পরিবার নিয়েই সমাজ, সমাজ নিয়েই দেশ। সৎপথে থেকে সংসারধর্ম পালন করে তিনিও যে প্রকৃত-

পক্ষে দেশ-সেবাই করেছেন এ কথা কেউ ভাববেও না। ফাঁসির মঞ্চে মরাটাকেই লোকে বেশি বীরত্ব বলে মনে করে, কবিরা তা নিয়ে কবিতা লেখে, তিলে-তিলে মরাটা চোখে পড়ে না কারও। যোগেনবাবুর নিজের চোখেও পড়ল না। তাঁরও মনে হল জীবনটা বৃথাই গেছে।

যে ডাক্তারবাবু খোকনের চিকিৎসা করছেন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"খোকা আজ কেমন আছে যোগেনবাবু?"

"জ্বর আছে এখনও। ওর স্পিউটাম্‌টা পরীক্ষা করেছিলেন?"

"করেছিলাম।"

"কি পেলেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তারবাবু বললেন, "টি. বি. পাওয়া গেছে"।

বিবর্ণমুখে যোগেনবাবু ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

যোদ্ধা

স্থানীয় স্কুলের কার্যকরী সভার সভ্য হিসাবে নূতন শিক্ষকটির মনোনয়ন ব্যাপারে আমারও খানিকটা হাত ছিল। আমার পালটি ঘর বলিয়া নয়, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণাবলীর জন্যই আমি তাহার হইয়া লড়িয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীর এম. এ. এবং বি. টি.। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও আছে। দরখাস্তের সঙ্গে সে সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইয়াছিল। তাহাকে আসল সার্টিফিকেট পাঠাইবার জন্য লেখা হইল। ফেরত ডাকেই আসল সার্টিফিকেট-গুলি আসিয়া গেল। দেখিয়া মেম্বাররা সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। বস্তুত মফঃস্বলের স্কুলে এরূপ প্রথম শ্রেণীর লোক পাওয়া যাইবে তাহা আমরা আশাই করিতে পারি নাই। তার-যোগে আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিলাম। সার্টিফিকেট দিয়া যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করিয়াছেন, দেখা গেল তাঁহারা মোটেই অত্যুক্তি করেন নাই। চৌকোস ছোকরা। শুধু গুণবান নয়, রূপবানও। গান বাজনা খেলা সবেতেই দক্ষ। চমৎকার পড়াইতে পারে। সহকর্মীদের সহিত ব্যবহারও ভদ্রজনোচিত। সকলেই সুখ্যাতি করিতে লাগিল। আমি তাহাকে আমার বাড়িতেই স্থান দিলাম। মফঃস্বলে মেয়েদের পড়াইবার বড় অসুবিধা। আমার একমাত্র সন্তান একটি মেয়ে। সাধ ছিল বিজলীকে লেখাপড়া শিখাইব, কিন্তু সুবিধা ছিল না। নরেন্দ্রনাথকে পাওয়াতে সুবিধা হইল। আমার বাসায় থাকিয়া সে বিজলীর পড়াশোনার ভার লইল।

…শুধু বাংলা ইংরেজী অঙ্ক সংস্কৃত নয়, অনেক বিষয়ই সে বিজলীকে পড়াইত। পাশের ঘর হইতে একদিন শুনিলাম সে ডারবিনের থিয়োরি অব ইভল্যূশন সম্বন্ধে সরলভাষায় বক্তৃতা করিতেছে। বেশ লাগিল।

বলিতেছিল—"একটা কথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে আমরা সকলেই যোদ্ধা। সকলেই আমরা বাঁচবার জন্যে যুদ্ধ করছি। এই যুদ্ধের প্রধান, উপকরণ শক্তি। সে শক্তির নানা রূপ। শুধু বাহুবলই শক্তি নয় বুদ্ধিবলই আসল শক্তি। এই বুদ্ধিবলে মানুষ জীবনযুদ্ধে সিংহ গণ্ডার হাতীকে হারিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। মানুষদের মধ্যেও যে যত বেশি

বুদ্ধিমান, সে তত বেশি কৃতী। পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, প্রকৃতির এই এত অজস্র ঐশ্বর্য সবই সেই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, বিচিত্র লীলা…"

সহজ সরল ভাষায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এমন ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে শুনি নাই। ছেলেটির প্রতি ক্রমশই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলাম। একদিন মনে হইল বিজলীর সহিত ইহার বিবাহ দিলে কেমন হয়? ইহাকে স্বামীরূপে পাইলে বিজলী যে অসুখী হইবে না তাহা তো স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। মাস্টার মশায়ের কাছে বসিয়া থাকিতে পাইলে বিজলী আর কিছুই চায় না।

পরিচয় লইয়া জানিলাম নরেন্দ্রনাথের তিনকুলে কেহ নাই। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে নাকি বাল্যকাল কাটাইয়াছিল। তাহার পর স্কলারশিপের টাকা দিয়াই সে বরাবর নিজের খরচ চালাইয়াছে। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। পণ দাবি করিতে পারেন এমন কোন অভিভাবক নাই। ইহার সহিত বিবাহ হইলে আমার একমাত্র সন্তানটিও আমার কাছেই থাকিতে পারিবে।

কথাটা একদিন পাড়িলাম। নরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। বুঝিলাম অমত নাই। বিবাহ হইয়া গেল।

* * *

বিবাহের পর তিনমাস অতীত হইয়াছে।

সেদিন নরেন এবং আমি বাহিরের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, হঠাৎ পথ-চলতি একজন ভদ্রলোক নরেনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"আরে পূর্ণ যে! তুমি এখানে—"

লোকটি আগাইয়া আসিলেন। নরেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। আমিও অবাক হইয়া গেলাম। নরেনকে পূর্ণ বলিয়া ডাকিল কেন! ভদ্রলোক আগাইয়া আসিতেই নরেন উঠিয়া পড়িল এবং বলিল, "আমি আসছি একটু ভিতর থেকে—" ভিতরে চলিয়া গেল। আমিই ভদ্রলোক:কে আহ্বান করিয়া বসাইলাম।

"আসুন, বসুন।"

ভদ্রলোক উপবেশন করিয়া বলিলেন, "পূর্ণকে এখানে দেখব আশাই করি নি।"

আমি প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না।

"ওর নাম তো নরেন, পূর্ণ বলছেন কেন?"

"নরেন ? ওকে পূর্ণ বলেই তো বরাবর জানি। ও আমাদের স্কুলের নামজাদা ছেলে। এখানে নাম বদলেছে নাকি ?"

"আপনার সহপাঠী ছিল ?"

"শুধু আমার কেন, আমার, আমার দুই দাদার, আমার ছোট কাকারও। বেচারী ম্যাট্রিকুলেশনটা কিছুতেই পাশ করতে পারল না। এদিকে চৌকোস। গান, বাজনা, খেলা সবেতেই ওস্তাদ। ইংরেজিও বেশ বলতে কইতে পারে, এখানে কি করছে ?..."

স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

নরেন বাহির হইয়া আসিল। মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। চোখে মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব।

"বীরেন এখানে কি মনে করে ?"

"আমি ভাই পাটের বীজনেস করছি। পাট কিনতে এসেছি এখানে। এখানকার নাথুমলের সঙ্গে আলাপ আছে তোর ?"

"আছে।"

"একবার যাবি আমার সঙ্গে ? আয় না—"

দুই বন্ধুতে বাহির হইয়া গেল।

অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। কাহাকেও কিছু বলিলাম না। সন্ধ্যার পর নরেনকে নিরিবিলিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, সকালে ওই যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন—"

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া নরেন বলিল—"সব কথা খুলেই বলি তাহলে। বীরেন যে কথা সকালে আজ আপনাকে বললে তা মিছে নয়। আমার নাম পূর্ণ, নরেন নয়।

"তুমি এম. এ. বি. টি. নও ?"

"আজ্ঞে না। আমি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারি নি। তবে আমি মূর্খ নই, আমি—"

"তবে তুমি সার্টিফিকেটগুলো পেলে কি করে ?"

"যোগাড় করেছিলাম। মানে, খুলেই বলি তাহলে। আপনি এখন আমার আপনার লোক, আপনার কাছে আর গোপন করে লাভ নেই। কোথাও চাকরির

কোনও যোগাড় করতে না পেরে আমি একটা বুদ্ধি বার করলাম শেষে। আমিই নিজে একটা বিজ্ঞাপন দিলাম যে অমুক স্কুলের জন্য ভাল একজন শিক্ষক চাই। বেতন মাসিক দুশো টাকা। অমুক পোস্টবক্সে দরখাস্ত করুন। অনেক দরখাস্ত এল। তার মধ্যে নরেন বাঁড়ুয্যের কোয়ালিফিকেশন দেখলাম সবচেয়ে ভাল। তাকে লিখলাম যে তোমার অরিজিন্যাল সার্টিফিকেটগুলো পাঠিয়ে দাও, তোমার চাকরি হবার খুব সম্ভাবনা। সেই সার্টিফিকেটগুলো হস্তগত হবার পর আমি আপনাদের স্কুলে দরখাস্ত করলাম। এদিকে তার সঙ্গে চিঠিপত্র চলতে লাগল। চিঠিতে তাকে খুব আশা দিতে লাগলাম যে আপনার চাকরি হবার খুবই সম্ভাবনা, দুজন মেম্বার অসুস্থ, তাই আমাদের মিটিং হচ্ছে না। তাঁরা সুস্থ হলেই আপনাকে নিয়োগপত্র পাঠান হবে। তারপর আপনারা যখন আমাকে রাখলেন তখন তাকে সার্টিফিকেটগুলো ফেরত দিয়ে দুঃখের সহিত জানালাম যে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার মতন লোককে আমরা নিযুক্ত করতে পারলাম না, কারণ ইন্সপেক্টার সাহেবের ইচ্ছা একজন মুসলমান নেওয়া। এই হল আসল ফ্যাক্ট্…"

বুদ্ধিদীপ্ত হাসিতে নরেনের চোখমুখ ঝলমল করিতে লাগিল।

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, বুঝিলাম প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই, তবু করিলাম, "এমন কাজ করলে কেন?"

"পেটের দায়ে। জীবনটা একটা যুদ্ধ—কথাই আছে Everything is fair in war and love. জীবনযুদ্ধে বুদ্ধিই একমাত্র অস্ত্র। আপনাকে অকপটে সব কথা খুলে বললাম, আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও হয়েছে, আশা করি আপনি আমার সহায় হবেন। স্কুলের চাকরি আমি করব না বেশিদিন। বীরেনের সঙ্গে পাটের কারবারেই নাবব ভাবছি। বীরেন আমাকে সাহায্য করবে বলছে—"

নীরব হইয়া রহিলাম।

এখনও নীরব হইয়া আছি, কারণ জীবনযুদ্ধে আমিও একজন যোদ্ধা। বিজলীর ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া নীরব থাকাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে।

মুখোশ

অঘোরে ঘুমুচ্ছিলাম বাইরের ঘরটায়। রাস্তার দিকের কপাটটা ভেজান ছিল। হঠাৎ বিজন আমাকে ডেকে জাগিয়ে দিলে।

"আপনি ভিতরে যান একবার, পিসিমা কি রকম করছেন—"

ব'লেই সে চলে গেল। পাশের বাড়িতে থাকে বিজন। পাশের ঘর থেকে সত্যিই গোঁ গোঁ শব্দ আসছিল একটা। তাড়াতাড়ি গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি পিসিমা—আমার একমাত্র পিসিমা—বিছানায় বসে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছেন।

"কি হল পিসিমা ?"

পিসিমা নিরুত্তর।

"অমন করছ কেন পিসিমা ? কি হল ?"

"ভূ-ভূ-ভূ-ভূ" গোছের একটা শব্দ ক'রে পিসিমা অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন। পিসিমা বরাবরই একটু ভীতু প্রকৃতির লোক। কিন্তু তাঁকে অজ্ঞান হ'য়ে যেতে দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম একটু। ছুটে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলাম, বেরিয়েই দেখি বিজন দাঁড়িয়ে আছে।

"ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছেন না কি ?"

"হ্যাঁ।"

"আমিই ডেকে নিয়ে আসছি। আপনি বরং পিসিমার কাছে থাকুন।"

বিজন ছেলেটি বড় ভাল।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু এলেন। এসেই একটা ইনজেকশন দিলেন। এক ডোজ ওষুধও খাইয়ে দিলেন ব্যাগ থেকে বার করে। বললেন, পিসিমার স্নায়ু-দৌর্বল্য হয়েছে। একটা ফুল কোর্স ভিটামিন বি এবং ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিতে হবে। ডাক্তারবাবুকে তখনই নগদ বাইশ টাকা দিতে হল। রাত্রে এসেছেন বলে ডবল ফি ষোল টাকা, ইনজেকশন আর ওষুধের দাম ছ টাকা। ফুল কোর্স ভিটামিন বি এবং ক্যালসিয়ামে আরও কত লাগবে কে জানে। তবু মরীয়া হয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ভিটামিন বি এবং ক্যালসিয়ামের ইনজেকশন তিনি দিয়ে যান যেন এসে। কালো-বাজারে অনেক পয়সা পিটেছি, পিসিমার চিকিৎসার ত্রুটি করব না। পিসিমাই মানুষ করেছেন আমাকে।

রাত্রে পিসিমা চুপ করে শু'য়ে রইলেন। কোনও কথা বললেন না বিশেষ। ডাক্তারবাবুও মানা ক'রে গিয়েছিলেন যেন কথা কওয়াবার চেষ্টা না করা হয়।

সকালে পিসিমা একটু সুস্থ হতে জিগ্যেস করলাম, "আচ্ছা পিসিমা, কি হ'ল বল তো তোমার কাল হঠাৎ?" পিসিমা চুপি চুপি বললেন, "ভূত বাবা, ভূত! ডাক্তার না ডেকে একটা ওঝা ডাক।"

"ভূত!"

"হ্যাঁ, ভূত।"

পিসিমার চোখের দৃষ্টি ভয়-বিহ্বল।

"বল কি! দেখলে তুমি?"

"স্বচক্ষে! আমার মাথার শিয়রের দিকে জানলাতে রাস্তার আলোটা পড়ে তো, হঠাৎ চোখ খুলে দেখি সেখানে এক বিকট মূর্তি। কুচকুচে কালো চেহারা, বড় বড় সাদা চোখ, চোখের তারা লাল টকটক করছে, বড় বড় দাঁত। উঃ, আবার যদি দেখি তা হলে ম'রে যাব আমি! একটা ওঝার সন্ধান দেখ্ তুই।"

চিন্তিত হলাম। ভূতের জন্য নয়, পিসিমার জন্য। পাগল হয়ে যাবেন না তো শেষটা? আমার এক বন্ধুর মা ভূত-ভূত ক'রে পাগল হয়ে গেছেন জানি। যে ডাক্তারবাবু কাল এসেছিলেন তার সঙ্গে বিজনেরই আলাপ বেশি। তিনি যদি আর কোনও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত মনে করেন তাই করুন না হয়।

বিজনের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে গেলাম পাশের বাড়িতে। বিজনরা অল্পদিন হল আমাদের প্রতিবেশী হয়েছে! খুব বেশি মাখামাখি হয় নি, তবু বিজন ছোকরাটিকে ভাল ব'লেই মনে হয়। গিয়ে দেখি বিজন বেরিয়ে গেছে। বাইরের বসবার ঘরটি খোলা ছিল, সেইখানে বসে তার ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হঠাৎ বিজনের ভাই-পো ফড়িং একটা মুখোশ প'রে এসে আমাকে ভয় দেখাতে লাগল—হুম্ হুম্ হুম্—! কুচ্‌কুচে কালো রংয়ের মুখোশ। তাতে বড় বড় সাদা চোখ আর চোখের তারা টকটকে লাল, দাঁতগুলোও বড় বড়!

মুখোশ খুলে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল ফড়িং।

"কোথা থেকে পেলি এটা রে?"

"কাকা পরশু দিন কিনে এনেছে"—বলেই ফড়িং ছুটে চলে গেল অন্দরের দিকে।

পরমুহূর্তেই বিজন ফিরল। বাজারে গিয়েছিল, চমৎকার একটা ইলিশ মাছ কিনেছে দেখলাম।

"আমি আসছি এখনি"—বলেই সে ভিতরে ঢুকে গেল। বাজারটা রেখে ফিরে এল মিনিট পাঁচেক পরে। আসতেই তাকে বললাম, "পিসিমা কি বলছেন জান?"

"কি!"

"বলছেন তিনি ভূত দেখেছিলেন। আর ভূতের চেহারার যা বর্ণনা দিলেন তা আশ্চর্য রকম মিলে যাচ্ছে তোমার ভাইপো ফড়িং যে মুখোশটা প'রে এসেছিল তার সঙ্গে।"

"এসেছিল না কি! রাস্কেলটাকে মানা ক'রে গেলাম ওটাতে যেন হাত না দেয়।"

সবেগে বিজন ঢুকে গেল অন্দরের দিকে আবার এবং পর মুহূর্তেই ফড়িংয়ের আর্ত হাহাকার শোনা গেল। বুঝলাম ফড়িংকে চাবকাচ্ছে বিজন।

বেরিয়ে এল আবার।

"কি ব্যাপার কি?"

বিজনের সমস্ত মুখের চেহারাই বদলে গেছে যেন।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, তারপর কেঁদে ফেলল। খুব কাঁদতে লাগল। ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমি। হল কি!

কিছুক্ষণ কেঁদে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে বিজন শেষকালে যা বললে তা আরও বিস্ময়কর। কিছুদিন থেকে অত্যন্ত দুরবস্থা চলেছে তাদের। যদিও বাইরের ভড়ংটা বজায় আছে কিন্তু ভিতরে হাঁড়ি চড়ছিল না। যে ডাক্তারবাবুটি এসেছিলেন তিনি বিজনের মাসতুতো ভাই। তাঁর অবস্থাও তদ্রূপ। তাই দুজনে মিলে প্যাক্ট করেছে একটা। রোগী জুটিয়ে দিলে রোগী পিছু তাকে কমিশন দেবেন ডাক্তারবাবু। অনেক ফন্দী ক'রে অনেক রকম রোগী তাকে জুটিয়ে দিয়েছে বিজন। কিন্তু গত সাতদিন থেকে একটিও রোগী

জোটাতে পারেনি সে। অথচ সংসারের নিত্য খরচ লেগেই আছে। কাল বৌদি বললেন যে, চাল বাড়ন্ত হয়েছে। এ ক'দিন শুধু ভাত জুটছিল, অবিলম্বে কিছু টাকা যোগাড় করতে না পারলে তাও জুটবে না। পিসিমা ভীতু লোক সে জানত, তাই একটা মুখোশ কিনে সে···।

শুনলাম ওই ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামওলাদের সঙ্গেও না কি ডাক্তার-বাবুটির কমিশন বন্দোবস্ত আছে।

সাধুতার মুখোশ প'রে কালো-বাজারে ব্যবসা করি বলে মনে মনে আমিই লজ্জিত ছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি—ও বাবা!

মায়া

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, "মণিমোহন চক্রবর্তী? ভদ্রলোকের বাঁ চোখের নীচে কি কালো দাগ ছিল একটা?"

"হাঁ। আপনি চিনতেন না কি তাকে?"

"দেখা হয়েছিল একবার"

ট্রেনে পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। পণপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা ওঠাতেই মণিমোহন চক্রবর্তীর কথা উঠিয়া পড়িয়াছিল। মণিমোহন চক্রবর্তীর কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ ট্রেনে তাহার শ্বশুরের সহিত যে দেখা হইয়া যাইতে পারে ইহাও আমার কল্পনাতীত ছিল।

...প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। চাকুলা ডিস্‌পেন্সারির ডাক্তারবাবু ছুটি লইয়াছিলেন, আমি এক মাসের জন্য তাঁহার জায়গায় গিয়াছিলাম। সেইখানেই মণিবাবুর সহিত দেখা হয়। মণিবাবু চাকুলার ডাক্তারবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের যে ঘরটি স্ত্রীলোকদের জন্য আলাদা করা থাকে মণিবাবু সেই ঘরটিতেই রাত্রে শয়ন করিতেন। ঠিক তাহার পাশেই রোগীদের ঘা ধোয়াইবার জন্য যে ঘরটি নির্দিষ্ট আমি সেইটাতেই শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। মফঃস্বলের ডিস্‌পেন্সারিতে আইন বাঁচাইবার জন্য এ ঘর দুটি থাকে বটে কিন্তু রোগীদের জন্য কখনও ব্যবহৃত হয় না। রোগী সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কর্মই প্রায় বারান্দাতেই নিষ্পন্ন হয়। আমাদের খাবার ডাক্তারবাবুর বাসা হইতে আসিত। ডাক্তারবাবু ছুটি লইয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ ছিলেন চাকুলায়।

একদিন এই মণিবাবুর জ্বর হইল। সামান্য জ্বর, বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু মণিবাবু কেমন যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল যেন ভয় পাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম, ঔষধাদি দিলাম এবং চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া থাকিতে বলিলাম। তখন শীতকাল। মণিবাবু সমস্ত দিন লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন। জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না। সন্ধ্যাবেলা দেখিলাম জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে। চক্ষু দুইটি লাল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছেন?"

"খুব ভাল, চমৎকার।"

টেম্পারেচার লইয়া দেখিলাম জ্বর বাড়িয়াছে।

রাত্রি তখন বোধহয় দশটা হইবে। ডাক্তারবাবুর চাকর মধু আসিয়া বলিল, "মণিবাবু কি রকম করছেন, আপনি একবার দেখুন এসে।"

গিয়া দেখিলাম সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া মণিবাবু চেয়ারে বসিয়া আছেন।

বলিলাম, "এ কি করছেন মণিবাবু, কাপড় খুলে ফেললেন কেন? ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।"

"এখনই তো লেপের তলায় ঢুকব, কাপড় প'রে আর কি হবে।"

মধু মণিবাবুর জন্য সাবু আনিয়াছিল। সাবুটুকু তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলাম।

"জল খাবেন একটু?"

"খাব বই কি। কিন্তু কাঁসার গ্লাসে নয়, রূপোর গ্লাসে! ওই যে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন না?"

খোলা দ্বারটার দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। আমি ঘাড় ফিরাইয়া অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

"কে দাঁড়িয়ে আছে?"

"মায়া, আমার স্ত্রী মায়া। দেখতে পাচ্ছেন না? রূপোর গ্লাসে ক'রে ঠাণ্ডা জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওই যে—"

বিস্ফারিত উৎসুক নেত্রে অন্ধকারের দিকে তিনি খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—মনে হইল সত্য যেন কিছু একটা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"এই যে যাচ্ছি—"

ওই অবস্থাতেই উঠিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, আমি জোর করিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলাম। বুঝিলাম জ্বর বাড়াতে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।

"আপনি একলা উঠে খবরদার বাইরে যাবেন না! আমি পাশের ঘরেই আছি, দরকার হ'লে ডাকবেন? কেমন? আমি সজাগ হয়ে রইলাম।"

…অনেকক্ষণ জাগিয়াই ছিলাম। একবার উঠিয়া আসিয়া দেখিলাম মণিবাবু আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া আছেন। আমিও গিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাঙিল চৌকিদারের ডাকাডাকিতে। বাহির হইয়া দেখি উলঙ্গ মণিমোহন তাহার সঙ্গে।

চৌকিদার বলিল, "আমি রোঁদ দিয়ে ফিরছিলাম। দেখলাম বেত ঝোপটার কাছে অনেকগুলো কুকুর ডাকছে। খুব ডাকছে। কেমন যেন সন্দেহ হল, এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। গিয়ে দেখি এই লোকটা ন্যাংটো দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম, পাগল টাগল হবে বোধ হয়। জিগ্যেস করাতে বললে ডাক্তারখানার রাস্তা কোন্‌টা খুঁজে পাচ্ছি না। কথা শুনে ভদ্রলোক মনে হল, তাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম।"

চৌকিদারকে বিদায় করিয়া মণিবাবুকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেলাম। ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মুখে মৃদু হাসি।

"একা বেরিয়ে গেস্‌লেন কেন? আমাকে ডাকলেই পারতেন।"

"মায়া ছিল যে। চকচকে রূপোর গ্লাসটা দেখিয়ে সে আমায় ডাকলে। বললে, আমার সঙ্গে এস। ঝরনা থেকে ফটিক জল তুলে দেব তোমাকে। তাই চলে গেলাম। হঠাৎ মাঝখানে কি রকম বেত বন টন এসে পড়ল—বুঝতে পারছি না ঠিক—গুলিয়ে যাচ্ছে—"

"শুয়ে পড়ুন। আমাকে না ডেকে আর বাইরে বেরুবেন না।"

বাধ্য বালকের মতো মণিবাবু বিছানায় ঢুকিয়া পড়িলেন।

…মধুর ডাকাডাকিতে ভোরবেলা ঘুম ভাঙিল। বাহির হইয়া দেখি মণিবাবুর মৃতদেহটা সিঁড়ির উপর পড়িয়া আছে।

…অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন হু হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। পার্শ্ববর্তী বৃদ্ধকে আবার প্রশ্ন করিলাম, "আপনার মেয়ে মায়া আত্মহত্যা করেছিল?"

"হ্যাঁ, মশাই। দানে রূপোর বাসন দিতে পারি নি বলে' এমন গঞ্জনা দিয়েছিল সবাই মিলে যে গলায় দড়ি দিতে হয়েছিল তাকে।"

চুপ করিয়া রহিলাম।

শিল্পীর ক্ষোভ

মদন ঘোষাল যদিও জীবনে কোনও কবিতা লেখেন নি বা ছবি আঁকেন নি তবু তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বললে অন্যায় হবে না, কারণ তিনি জীবনের প্রতি মুহূর্তটিকে শিল্পীসুলভ আনন্দসহকারে উপভোগ করেছেন। অনন্যতাও আছে তাতে।

রেস খেলেছেন, কিন্তু টাকার লোভে নয়, খেলেছেন ওর নাটকীয় উন্মাদনাটা উপভোগ করবার জন্যে। জীবনে নর্তকী-বিলাস করেছেন বহুবার, কিন্তু নর্তকীকে স্পর্শ করেন নি কখনও। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন খুব বড়লোকের বাড়িতে। ব্যাঙ্কের অঙ্ক তাঁকে মুগ্ধ করে নি, করেছিল জামাইয়ের লক্ষ্য-ভেদের ক্ষমতা। অদ্ভুতরকম অব্যর্থ বন্দুকের লক্ষ্য ছোকরার।

শোনা যায় তত্ত্ব করবার সময় বেয়াই মশায়কে লিখেছিলেন—আমি গরীব মানুষ, আপনার মর্যাদা রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই আমার। বেশি কিছু পাঠাতে পারলাম না। একটি মাত্র মিষ্টান্ন পাঠাচ্ছি, দয়া ক'রে গ্রহণ করলে বাধিত হব।

বেয়াই মশাই চিঠি পড়ে চটে উঠেছিলেন, কিন্তু মিষ্টান্নটি দেখে অবাক হ'তে হল তাঁকে। বিশাল একটা কড়ায় বিরাট একটা পানতোয়া প্রচুর রসে হাবুডুবু খাচ্ছে। কড়ার আংটায় বাঁশ গলিয়ে ষোল জন লোক বয়ে এনেছে।

খবর নিয়ে জানতে পারলেন পানতোয়াটির ওজন একমণ।

ঘোষাল মশায় দানে চিরকাল মুক্তহস্ত। দানটা যত নাটকীয় হ'ত তত আনন্দ হ'ত তাঁর।

পাড়ার এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন। মেয়েটি কালো; অনেক টাকা পণ লাগবে।

ঘোষাল মশাই অর্থ সাহায্য করলেন না, মেয়েটিকে একেবারে নিজের পুত্রবধূ ক'রে নিলেন।

শোনা যায় প্রথম যৌবনে নব-পরিণীতা বধূর কাছে চিঠি পাঠাবার জন্যে বহুবিচিত্রবর্ণের শিক্ষিত পারাবত পুষেছিলেন তিনি। পায়রার গলায় চিঠি বেঁধে দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিতেন এবং আশা-আশঙ্কা-দোদুল-চিত্তে চেয়ে থাকতেন আকাশের দিকে।

এ রকম নানা গল্প প্রচলিত আছে ঘোষাল মশায়ের সম্বন্ধে। তাঁর যা কিছু ছিল খেয়ালের হাওয়ায় রঙীন ফানুসের মতো উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি সারাজীবন ধ'রে।

সেদিন ঘোষাল মশায় অতিশয় বিপন্নমুখে প্রতিবেশী হরেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছে টাকা নেই একথা কি বলা যায়, আর বললেই বা বিশ্বাস করবে কেন হরেন। চিরকাল টাকা পেয়ে এসেছে সে। কিন্তু সত্যিই আজ তাঁর হাতে টাকা নেই, যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। বাইরের ঠাট বজায় আছে কিন্তু ভিতর ফোঁপরা। সত্যিই আজ তিনি কপর্দকশূন্য। অথচ হরেন অগাধ বিশ্বাস নিয়ে এসেছে।

শিল্পী মদন ঘোষাল নাটকীয় পরিস্থিতিটা বেশ উপভোগ করছিলেন মনে মনে। প্রার্থী হরেন চক্রবর্তীর জন্যে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছিল ফতুর মদন ঘোষালের জন্যে।

কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে হরেনবাবু আর একবার বললেন, "অনেক আশা ক'রে আপনার কাছে এসেছি। বিশ্বাস আছে, আপনি অন্তত আমাকে নিরাশ করবেন না। সত্যি বলছি, বড় কষ্টে পড়েছি ঘোষাল মশাই। ঘরে চাল নেই, কাপড় নেই, ছেলেটা অসুখে ভুগছে, ওষুধ কেনবার সামর্থ্য নেই। স্কুলের মাইনে দিতে পারিনি ব'লে বড় ছেলেটার নাম কেটে দিয়েছে। কি যে করব জানি না। বেশি নয়, গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিন আমাকে দয়া ক'রে—"

ফতুর মদন ঘোষাল অপ্রস্তুত মুখে বাইরের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা নেই একথা অবিশ্বাস্য। জানালার দিকে চেয়ে গুম্ফপ্রান্ত পাকাতে লাগলেন তিনি। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন শিল্পী মদন ঘোষাল।

ফতুর মদন কি করে দেখা যাক।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর যখন রূঢ় সত্য কথাটাই মোলায়েম ক'রে বলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ফতুর মদন ঘোষাল, তখন রঙ্গমঞ্চে আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

ময়লা-কাপড়-পরা গরীব-গোছের একটি লোক ঘরে ঢুকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

বলল, "আমি আপনার প্রজা। পঞ্চাশ টাকা খাজনা বাকি ছিল দিতে এসেছি।"

ফতুর মদন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ টাকাটা হরেনবাবুর হাতে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

সফলমনোরথ হরেন বাষ্পাকুল নয়নে অস্ফুটকণ্ঠে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সমস্যাটার এমন একটা অরোমাঞ্চকর সমাধান হওয়াতে শিল্পী মদন কিন্তু ভারী দমে গেলেন। প্রজাটির দিকে চেয়ে বললেন,—"তোমার নাম কি?"

"জনার্দন গোস্বামী।"

"তোমার নাম তো শুনি নি কখনও, কোথায় থাকা হয়?"

"আপনারই আশ্রয়ে।"

আরও প্রশ্ন হয়তো করতেন তাকে, কিন্তু হন্তদন্ত হয়ে পুরোহিত মশাই প্রবেশ করলেন।

"সর্বনাশ হয়েছে বাবু, ঠাকুরঘরে ঠাকুর নেই!"

"অ্যাঁ, সে কি! সিংহাসনের পাশে পড়ে-টড়ে যায় নি তো?"

"না, আমি দেখেছি ভাল ক'রে।"

"আর একবার দেখুন গিয়ে।"

পুরোহিত চলে গেলেন। পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সোনার তৈরী জনার্দন —সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হওয়াতে শিল্পী মদন ঘোষালের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল যেন।

গৃহদেবতা জনার্দন ঠাকুর সিংহাসনে নেই, প্রজাটির নাম জনার্দন গোস্বামী। ফতুর মদন ঘোষালের অবস্থা দেখে তবে কি স্বয়ং জনার্দন—আর ভাবতে পারলেন না তিনি।

চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল ক'রে উঠল, থরথর ক'রে কেঁপে উঠল নীচের ঠোঁটটা।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন প্রজা জনার্দন চলে গেছে। তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, না নেই—চলেই গেছে।

পুরোহিত মশাই ফিরে এলেন।

তাঁর মুখে হাসি।

ঠাকুর পাওয়া গেছে। গিয়ে দেখেন ঠিক সিংহাসনের উপরেই বসানো আছে। হেসে বললেন—"আমার বিশ্বাস, মণ্টুবাবু তুলে নিয়ে ছিলেন। জনার্দনের ওপর ওঁর ভারী লোভ। আমার কাছে একদিন চেয়েও ছিলেন—"

মণ্টু মদন ঘোষালের নাতি, বয়স পাঁচ বছর। শিল্পী মদন ঘোষাল তখন উত্তেজনার তুঙ্গে আরোহণ ক'রে বসে আছেন।

বললেন—"মাধব গোমস্তাকে ডেকে দিন তো একবার।"

একটু পরেই মাধব গোমস্তা এল।

"মাধব, দেখ তো জনার্দন গোস্বামী নামে কি আমাদের প্রজা আছে কোনও? আমার তো যতদূর মনে পড়ছে ও নামের কেউ নেই।"

"দেখি।"

মাধব চলে গেল।

পরবর্তী দৃশ্যের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন মদন। কেবলই তাঁর মনে হতে লাগলো নাটকটা বেশ জমেছে, শেষ পর্যন্ত কি হয় ...।

মাধব ফিরে এসে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। জনার্দন গোস্বামী নামে আছে একজন প্রজা মহালে।"

"আছে? ভাল ক'রে দেখেছ তুমি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তার পঞ্চাশ টাকা খাজনাও বাকি আছে।"

উত্তপ্ত কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন মদন:

"খাজনা বাকি আছে কি না তা তো দেখতে বলি নি তোমায়, ও নামের কোনও লোক আছে কি না?"

"আছে।"

"ভাল ক'রে দেখেছ তো?"

"দেখেছি।"

"আচ্ছা যাও তবে।"

ক্ষুব্ধ হয়ে বসে রইলেন মদন ঘোষাল। আজকাল আর নাটক জমে না। ঠিক সময়ে কিছুতেই যেন তালটি পড়ে না আজকাল। সবই কেমন যেন পানসে গোছের!

ভাগ্য-পরিবর্তনের ইতিহাস

ভাজিবার মতো ভ্যারেণ্ডাও যখন গ্রামে আর জুটিল না, তখন আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে গিয়া দিনকতক কাটাইয়া আসিব মনস্থ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। ট্রেনে ভাগ্য পরিবর্তন হইয়া গেল।

ভদ্রলোকটি পাশেই বসিয়াছিলেন। আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। খাঁটি স্বদেশী লোক। নগ্নপদ, নগ্নগাত্র। এক-পা ধুলা, এক-বুক চুল। মাথায় ঈষৎ টাক। পরিধানে খদ্দর। কিছুক্ষণ কথা-বার্তার পর অনিবার্য ভাবে গান্ধি-প্রসঙ্গে আসিয়া উপনীত হইতে হইল।

ভদ্রলোক বলিলেন—"উনিই তো ভারতবর্ষের প্রতীক, মশাই। বাইরে অনাড়ম্বর, অন্তরে ঐশ্বর্য। এইটেই তো ভারতের বৈশিষ্ট্য। কি ভীষণ আধ্যাত্মিক শক্তি বলুন তো, ইংরেজের মতো অতবড় একটা হুঁদে জাতকে কেঁচো বানিয়ে দিলে একেবারে—এ কি সোজা শক্তি—"

শ্রদ্ধা হইল। সুতরাং গৃহিণী একটি ক্ষুদ্র কৌটায় করিয়া যে খাবার সঙ্গে দিয়াছিলেন সেটি যখন বাহির করিলাম, তখন অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকেও আহ্বান করিতে হইল। দেখিলাম তিনিও আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, কারণ আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন না। দুই পেয়ালা চা কিনিলাম, আমিই কিনিলাম। চা সহযোগে সেই শুক্‌নো পরোটা ও আলু-চচ্চড়ি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ফেলিল যাহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। দুইটি সিগারেট ধরাইবার পর তাহা প্রায় অবর্ণনীয় হইয়া উঠিল।

মহাত্মা গান্ধি সম্বন্ধে অতঃপর উভয়ে এমন সব উক্তি করিতে লাগিলাম যাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু তখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না।

ভদ্রলোক বলিলেন—"আসল কথা কি জানেন, মহাত্মা একটি ঘুঘু। আমি খুব 'রিলায়বেল সোর্স' থেকে শুনেচি যে রোজ রাত্রে উনি ওড়েন।"

বাংলা ভাষায় 'ওড়েন' কথাটি একাধিক অর্থ বহন করে। ইহার সহিত 'ঘুঘু' জড়িত থাকিলে সাধারণতঃ যে অর্থ করা উচিত তাহাই করিয়া আমি বাম চক্ষুটি

কুঞ্চিত করতঃ বলিলাম—"উনি নিজের জীবন-চরিতে এই ধরনের আভাসও দিয়েছেন, লুকো-ছাপা কিছু নেই!"

"আরে না মশাই, সে কথা বলছি না। ঘুঘু মানে যোগী। পদ্মাসনে বসে উনি রোজ শূন্যমার্গে ওড়েন একজন স্বচক্ষে দেখেছে। আমার বিশ্বাস উনি হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবের সঙ্গে কনসাল্‌ট ক'রে আসেন রোজ। তা না-হলে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলামাত্র ইংরেজেরা সুট সুট ক'রে চলে যাবে একি আর এমনিতে হয়! অ্যাটম্ বমের বাবা স্বয়ং ব্যোমকেশ রয়েছেন এর মধ্যে।"

তখন আমাকেও বলিতে হইল—"শুনেছি একবার এক বখাটে ছোঁড়া ওঁর বন্ধুর একটা খাসি কেটে ফেলেছিল। বন্ধু খাসির শোকে কেঁদে আকুল, তখন উনি অহিংসা মন্ত্রবলে সেটাকে নাকি বাঁচিয়ে দেন—"

চোখ বড় বড় করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"তবেই দেখুন, সাধে আমি জাতীয়-পতাকাকে আশ্রয় করেছি। ওইটি আঁকড়ে থাকলেই কূল পাব—"

তাহার পর কৌশলে পরস্পর পরস্পরের হাঁড়ির খবর লইতে শুরু করিলাম। শুনিলাম ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। আমি বেকার শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনার তো দু'পয়সা হওয়া উচিত। আচ্ছা, আপনি আমার দোকানে আসুন একদিন, দেখব যদি কিছু করতে পারি আপনার—"

ঠিকানা দিলেন।

তাঁহার দোকানে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি বিলাতী রেশমী কাপড়ের ব্যবসায় করেন। সম্প্রতি রেশমী কাপড়ের উপর ছোট ছোট ত্রিবর্ণ পতাকা ছাপাইয়া একরকম সুন্দর ডিজাইনের ছিট বাহির করিয়াছেন। শাড়ি ব্লাউস দুইই হইতে পারে, মূল্য প্রতি গজ কুড়ি টাকা।

ভদ্রলোক চোখ মটকাইয়া বলিলেন—"হু হু ক'রে বিক্রি হয়ে যাবে দেখবেন। আপনি যদি ইচ্ছে করেন কমিশন বেসিসে ক্যানভাস্ করতে পারেন।"

তাহাই করিতেছি।

দাঙ্গার সময়

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আতঙ্কে আকাশ বাতাস থমথম করছে। দিনের বেলাটা তবু কোন রকমে কাটে কিন্তু রাতটা আর কাটতে চায় না। ওই বুঝি শাঁখ বাজল, ওই বুঝি 'বন্দে মাতরম্' ! যে-কোনও কোলাহলের সামান্যতম আভাস পেলেই হুড়হুড় ক'রে সবাই ছাদের উপর এসে হাজির হই। প্রায়ই কিছু হয় না, দু-চার মিনিটের মধ্যেই থেমে যায় সব। ঠাণ্ডায় ছাদে বেশিক্ষণ দাঁড়ানও অসম্ভব, নেবে আসতে হয়। গিন্নী কেবল তদারক ক'রে বেড়ান প্রত্যেক কপাটের প্রত্যেক খিল, প্রত্যেক জানলার প্রত্যেক ছিটকিনি ঠিক আছে কি-না। রাত্রে পালা ক'রে জাগা হয়। এই সুযোগে 'সুনরি' দাইও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তার তাড়িখোর নাকবসা লম্বা স্বামী ফৈজুই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা! কারণ বাড়িতে আমি ছাড়া সে-ই দ্বিতীয় পুরুষ। তৃতীয় পুরুষ আমার দশ বছরের ছেলেটি। আমার সম্বল একটি লাঠি, সেটিকে ছড়ি বললেই আরও ভাল হয়। ফৈজু একটা ভোঁতা বর্শা যোগাড় ক'রে এনেছে। ছাতের উপর ইট জমা করা হয়েছে প্রচুর। এর বেশি যুদ্ধোপকরণ যোগাড় করতে পারা যায় নি। কিন্তু মুসলমানদের নৃশংস হত্যাকাহিনীর, দুর্ধর্ষ প্রতাপের, হিটলারী চালচলনের যেসব বর্ণনা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল তাতে এই সব সামান্য সরঞ্জাম নিয়ে তাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে যে পেরে উঠব সে ভরসা হচ্ছিল না কিছুতে। আমার বন্দুক একটা আছে অবশ্য ; কিন্তু টোটা নেই। যে দু-চারজন অফিসারের সঙ্গে ভাব ছিল তাঁদের প্রত্যেককে অনুরোধ করেছি টোটা সংগ্রহ ক'রে দেবার জন্যে। প্রতিশ্রুতি সকলেই দিয়েছেন, কিন্তু কার্যত প্রতিদিন সন্ধ্যা হ'লেই সেই পুরাতন সত্যটিকে বারংবার স্মরণ করেছি—কারও কথার ঠিক নেই। সাধে মুসলমানরা আমাদের নাজেহাল করেছে ! মুসলমানরা যদি আক্রমণ করে ওই সরু লাঠি এবং ভোঁতা বর্শা দিয়েই আত্মরক্ষা করতে হবে।

যে সব গুজব শোনা যাচ্ছে তা রোমাঞ্চকর। শোনা যাচ্ছে, মুসলমানেরা অতর্কিতে নদীপথে আসবে। বহু নৌকো না কি যোগাড় করেছে তারা। অস্ত্র-শস্ত্র প্রচুর—বোমা বন্দুক তো আছেই—কামানও আছে না কি। আমাদের বাড়ি

ঠিক গঙ্গারই উপরেই। সুতরাং প্রথম ধাক্কাটি আমাদের সামলাতে হবে। কিন্তু কি করে যে সামলাব তা ভাবতে গিয়ে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসছে। ওই সরু লাঠি আর ভোঁতা বর্শা দিয়ে কি…। ফৈজুর ভয় নেই। সে ভোঁতা বর্শাটা ঘ'ষে ঘ'ষে ধার করে আর ভরসা দেয়—"কুছ ডরিয়ে নেহি হুজুর, সব ঠিক হো যায়ে গা। দরিয়াপুর মে গোয়ালা বস্তি হ্যায়"—ইত্যাদি।

দিনের বেলা ভয়টা কম থাকে। সুতরাং দার্শনিক মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিই, ইতিহাসের নজীর তুলে আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করি। এমন কি, দিনের আলোতে নিজের অতীত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকেও যাচিয়ে দেখবার সাহস পাই। আজ না হয় এই কাণ্ড হয়েছে কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ, এমন কি, ঘনিষ্ঠতাও তো ছিল।

হঠাৎ সেদিন রহিমের মায়ের কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে হল রহিম কিংবা রহিমের মা কি আমার শত্রু হতে পারে? রহিমের বাবা আবদুল আমাদের চাকর ছিল, আমাদের ক্ষেতখামারের তদারক করত। কখন কোন্ জমিতে কি বীজ বুনতে হবে, কটা লাঙ্গল লাগবে, কখন কোন্ জমির ফসল কাটতে হবে, ক'জন মজুর দরকার, কোন্ ফসল কোন্ হাটে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়—সমস্ত ভার আবদুলের উপর। অর্থাৎ আসলে আবদুলই মালিক ছিল। সে-ই সব করত। তার বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করবার কোনও কারণও ঘটেনি।

…একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ। রহিমের মায়ের দুধও আমি খেয়েছি। রহিম আর আমি সমবয়সী। একই বছরে একই মাসে জন্ম আমাদের। আমি জন্মাবার মাস দুই পরেই মা অসুখে পড়েন। তখন রহিমের মা নিজের দুধ খাইয়ে আমাকে মানুষ করেছিল। প্রচুর দুধ ছিল তার। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত তার মাই খেয়েছি। মানে, প্রায় চার-পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। মনে আছে রহিমের মা আমাকে মাঠে নিয়ে যেত। রহিমের সঙ্গে সেই বড় অশ্বথ গাছতলায় কতদিন খেলা করেছি। রহিমের মা মাঠে কাজ করত, আর আমরা খেলা করতাম। অবসর হলে সে এসে আমাদের দুধ খাইয়ে যেত।…আবদুল মরে গেছে। সে বেঁচে থাকলে এখনও আমাদের বাড়িতেই থাকত। রহিম আমার সহপাঠী ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর সে পাটনায় একটা চাকরি পায়। মাকে নিয়ে সেইখানেই চলে গিয়েছিল বছর দুই আগে। এখন কোথায় আছে কে জানে…।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছিল বারান্দার কোণটায়। চতুর্দিক নির্জন। একটা বসন্ত-বউরী অশ্রান্ত ডেকে চলেছে। আরক্তিম স্বর্ণকিরণে মায়ালোক গ'ড়ে উঠেছিল যেন একটা। দাঙ্গার কথা ভুলে গিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্য। কতক্ষণ বসেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ চমক ভাঙল প্রতিবেশী হরেনবাবুর কণ্ঠস্বরে।

"আজকের খবর শুনেছেন ?"

"কি ?"

"ওপারের হিন্দুবস্তি দরিয়াপুর একেবারে সাফ।"

ধড়াস ক'রে উঠল বুকের ভিতরটা।

"অ্যাঁ, বলেন কি! দরিয়াপুরের গোয়ালারাই যে আমাদের ভরসা মশাই।"

"একটি প্রাণীও বেঁচে নেই।"

"বলেন কি ?"

বলবার কিছু নেই, দুজনেই চুপ ক'রে চেয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হরেনবাবু দ্বিতীয় সংবাদটিও দিলেন।

"বিশু ব'লে গেল, আজ রাত্রেই নাকি ওরা গঙ্গা পেরিয়ে এসে আমাদের অ্যাটাক করবে। অনেক নৌকা যোগাড় করেছে।"

"অতটা সাহস করবে কি ?"

"করবে। ওরা সব পারে। আপনার বন্দুকটা ঠিক ক'রে রাখুন আজ।"

"বন্দুক ঠিকই আছে। টোটা নেই।"

"টোটা নেই ? হাঁস আর ঘুঘু মেরে মেরে সব শেষ করেছেন বুঝি ? এখন ঠেলাটি সামলাবেন কি ক'রে ?"

হরেনবাবুর ধরনধারণ একটু অভিভাবকী গোছের। প্রত্যুত্তর না ক'রে চুপ ক'রে রইলাম। মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে হরেনবাবু বললেন—"আচ্ছা, দেখছি আমি বাসদেও বাবুর কাছে। ওর স্টকে থাকে অনেক সময়।

"তাঁকে আমিও বলেছি—"

"দেখি"

বাসুদেওবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন হরেনবাবু। বিহারী জমিদার বাসুদেও মিশ্র এ অঞ্চলের নামজাদা শিকারী। তাঁর কাছে টোটা থাকা সম্ভব।

হরেনবাবু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী হাজির হলেন এসে। তিনি পাশের বাড়ি থেকে যে খবর শুনে এসেছেন তা আরও ভয়ানক। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক রেলে কাজ করেন। তিনি নাকি দেখে এসেছেন আড়াইশ' বলিষ্ঠ কাবুলী নেবেছে এই বিকেলের ট্রেনে।

"কাবুলী যদি বাড়িতে ঢোকে তাহলে আর কাউকে বাঁচতে হবে না। তোমাকে ব'লে ব'লে তো হার মেনে গেলাম, দেয়ালটা তুমি কিছুতেই সারালে না। গেট বন্ধ ক'রে আর কি হবে দেওয়ালে যদি অতবড় ফাঁক থাকে!"

আমার বাড়ির হাতার চারদিকে যে দেওয়াল আছে তাতে সত্যিই একটা ফাঁক আছে মস্ত বড়। বর্ষায় ধসে' গিয়েছিল গেল বার। সারাব সারাব ক'রে আর সারানোই হয় নি। বিস্ফারিত-নয়নে ফাঁকটার দিকে চেয়ে ব'সে রইলাম। আপাতত সারাবার উপায়ও নেই। সমস্ত রাজমিস্ত্রী মুসলমান।

...সূর্য অস্ত গেল। তারপর গুটি গুটি পাড়ার লোকেরা আসতে লাগলেন একে একে। হিতৈষীর দল। সকলেরই মুখে এক কথা—"সাবধান, আজ রাত্রে হবেই কিছু একটা।" একজন আমাকে একটু অন্তরালে ডেকে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন—"এখানকার মুসলমান এস. ডি. ও. গোপনে গোপনে আর্মস সাপ্লাই করেছে—সাজংগীর মুসলমানদের। 'মাস্ অ্যাটাক' হবে রাত দশটার পর।"

আর একজন বললেন—"মিলিটারী যা এসেছে, সব মুসলমান..."

কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। ফৈজু আরও গোটা দুই বর্শা যোগাড় ক'রে এনেছে। বলছে, যদি তেমন দরকার হয় মাঈজি একটা চালাবেন আর একটা চালাবে সুনরি। ওই অস্থি-চর্মসার সুনরি না কি ভল্লচালনায় সুদক্ষ। জানা ছিল না।

"কিছু ডরিয়ে মৎ হুজুর"—বারংবার আশ্বাস দিতে লাগল নাক-বসা ফৈজু।

কিন্তু আমার মনে হতে লাগল অকূল-সমুদ্র।

আড়াইশ' কাবুলী, দরিয়াপুরের পঞ্চাশখানা নৌকো, ক্ষিপ্ত কশাই আর সাজংগীর সশস্ত্র পাঠানের দলকে গোটা তিনেক বর্শা দিয়ে আটকানো যাবে? বলে কি লোকটা! একটু পরেই কিন্তু অকূল সমুদ্রে ভেলা পাওয়া গেল। হরেনবাবু গোটা চারেক টোটা দিয়ে গেলেন। চারটে বুলেট।

...পাড়া রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাড়ার ছেলেরা নিয়েছিল। প্রতি মোড়ে মোড়ে প্রতি গলিতে গলিতে কিশোরের দল মজুত ছিল 'হুইস্‌ল্' নিয়ে। বিপদের সম্ভাবনা

দেখলেই তারা হুইস্‌ল্ বাজাবে। হুইস্‌ল্ শোনামাত্র সকলকে ছাতে উঠে যেতে হবে, ছাদে গিয়ে শাঁখ বাজাতে হবে। যাদের ছাদে আছে কিন্তু ছাদে ওঠবার সিঁড়ি নেই তাদের ছাতে ওঠবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে। খোলার বাড়ি যাদের তারা নিকটতম পাকা বাড়ির ছাতে উঠবে। ব্যবস্থার কোনও ক্রটি নেই।

...সেদিন অমাবস্যার রাত্রি। চতুর্দিক থমথম করছে। জনমানবের সাড়া নেই। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ফৈজুদেরও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি শুয়ে আমি একটি ইংরেজি উপন্যাস পড়ছি, গৃহিণী পড়ছেন বাংলা। আসলে কিন্তু দু'জনেই উৎকর্ণ হয়ে আছি; সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে।...কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ পেটে একটা গুঁতো খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"শুনছ, হুইস্‌ল্ বাজছে—"

গৃহিণী দেখলুম আলুথালু বেশে উঠে বসেছেন। হ্যাঁ, বাজছে তো! পাশের বাড়ি থেকে শাঁখও বেজে উঠল। ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছাতে দৌড়ে গেলাম। গৃহিণী শাঁখ বাজাতে লাগলেন। চারিদিক থেকে শাঁখ বেজে উঠল। জয় হিন্দ্—বন্দে মাতরম্,—অন্ধকার মুখরিত হয়ে উঠল।

হরেনবাবু পাশের বাড়ি থেকে চীৎকার করে উঠলেন হঠাৎ।

"আপনার কম্পাউণ্ড ওয়ালের কাছ ঘেঁষে ঘেঁষে যাচ্ছে দু'জন। দেখতে পাচ্ছেন? ফায়ার করুন, ফায়ার করুন।"

বন্দুকটা নীচে ছিল। দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। এসে দেখি গৃহিণী হাহাকার করছেন।

"ওগো, ওই যে দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ঢুকছে! কি হবে, হে মা কালী, হে মা দুগ্‌গা—ভগবান ভগবান—" টর্চ ফেলে দেখলাম। সত্যিই তো, কে একজন ঢুকছে গুঁড়ি মেরে।

ফৈজুকে বললাম—'টর্চটা ঠিক ক'রে ধ'রে রাখ—'

ফৈজু টর্চ ধ'রে রইল। ফায়ার করলাম। একবার নয় দু'বার। শাঁখের আওয়াজে গগন বিদীর্ণ হতে লাগল। জয় হিন্দ—বন্দে মাতরম্—জয় হিন্দ—বন্দে

মাতরম্‌···মনে হল' রাত্রির অন্ধকার এইবারে ছিঁড়ে যাবে বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি গাড়ি এসে পড়ল।

কম্পাউণ্ড ওয়ালের সেই ফাঁকটার কাছে গিয়ে ভীড় ক'রে দাঁড়ালাম সবাই। হঠাৎ রাস্তার ওপারের অন্ধকার ঝোপটা থেকে আর্তকণ্ঠে হাহাকার ক'রে উঠল কে যেন—"ভাই পরেশ, আমি রহিম। পাটনা থেকে আমি মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় পাবো বলে। আমাদের বাঁচাও ভাই। গেট বন্ধ। দেওয়ালের ওই ফাঁকটা দিয়ে মা বোধ হয় ভেতরে ঢুকে গেছেন—"

রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে টেনে বার করা হল। দেখা গেল বুলেটটা ঠিক বামস্তন ভেদ ক'রে বেরিয়ে গেছে।

অহঙ্কার পাঁড়ে

অহঙ্কার পাঁড়ে একবার খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। একাধিকবার হওয়ার কথা, আমি একবারের খবরটা জানি।

অহঙ্কার পাঁড়েকে চেনেন আপনারা? খুব সম্ভব চেনেন না। কারণ অহঙ্কার পাঁড়ে নামে তিনি পরিচিত নন। বিনয় কুমার ভদ্র, সুশোভন মিত্র, সুব্রত দাস বা ওই ধরনের কোনও একটা মোলায়েম নামের লেফাফায় আবৃত হয়ে তিনি সমাজে বিচরণ করেন। আমি কিন্তু জানি তাঁর নাম অহঙ্কার পাঁড়ে। আপনারা হয়তো দেখেছেন তার গোঁফ-কামানো, নাপিত-লালিত মুখখানি, আমি কিন্তু তাঁর উদগ্র গোঁফ-জোড়া দেখেছি মহিষের শিঙের মতো উঁচিয়ে আছে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে। নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত দেখেছি তাঁকে। বর্তমান আখ্যায়িকায় তিনি একজন সমালোচক। ফ্রী লান্স—খাপখোলা তলোয়ার একেবারে। সাহিত্য, রাজনীতি, বাজারদর, প্রতিবেশী, ফেরিওলা, শিক্ষা, সমাজ—প্রত্যেককে কেন্দ্র করেই ওষ্ঠ-প্রান্ত ফেনায়িত হয় তাঁর। অহঙ্কার পাঁড়ের সমালোচনা-এলাকার পরিধি বহুবিস্তৃত।

কারও সমালোচনা-বাতিক যদি আইনের সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তা হলে অনাত্মীয় ব্যক্তিদের তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়। দূরদর্শী মধ্যবিত্ত আত্মীয়দের অবশ্য একটু চিন্তা হতে পারে; কারণ যে ব্যক্তি ঠিক সীমারেখার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তার সীমারেখা অতিক্রম করতে দেরি লাগে না। আর অতিক্রম করলেই বিপদ। পাগলা-গারদে রাখবার খরচ আজকাল প্রচুর, বিনা পয়সায় রাখতে চায় না আজকাল। অনাত্মীয় ব্যক্তিদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়, কিন্তু পৃথিবীতে এসব ব্যাপারে অনাত্মীয় ব্যক্তিদেরই ঘর্মপ্রবণতা একটু বেশি। আজকালকার বাজারে ফুলকো লুচি, মোহনভোগ খুব সুলভ নয়, তবু কিন্তু আর সহ্য করতে পারছিলেন না তাঁরা। অহঙ্কার পাঁড়ের বাগ্‌বিস্ফোরণে আকৃষ্ট হয়ে যদি পাগলা-গারদের কর্তৃপক্ষেরা আকৃষ্ট হতেন তাহলে অনাত্মীয়ের দলও রেহাই পেত। কিন্তু তা তাঁরা হন নি। লোকটা এখনও ছাড়া রয়েছে।

প্রধান মুশকিল, অধিকাংশ লোকই অহঙ্কার পাঁড়েকে চিনতে পারে না প্রথমে। বিনয়কুমার বা ওই ধরনের কিছু একটা ভেবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যায়। তারপর ইট খেয়ে পালিয়ে আসে। অহঙ্কার পাঁড়ের দু'হাতে এবং চার পকেটে যে অনেক ইট মজুত থাকে সর্বদা, এ-খবরও অনেকে জানে না। কারণ ইটগুলোও অদৃশ্য। অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যখন নাকে বা রগে লাগে তখন চমকে যেতে হয়।

শুধু সমালোচনা করেই যদি অহঙ্কার পাঁড়ে নিরস্ত থাকতেন তাহলেও তত গোল হ'ত না। কিন্তু তা তিনি থাকতে চাইতেন না। তিনি তাঁর সমালোচনা শোনবার জন্যে একটি ভক্তমণ্ডলীও চান। ফুলকো লুচি মোহনভোগ, ভাল চায়ের আয়োজন করেছেন প্রচুর। ভক্তমণ্ডলী পেয়েছেনও। এমন কি তাঁর বৈঠকখানায় স্থানাভাবও ঘটে প্রায় প্রত্যহ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুচি মোহনভোগ খেতে খেতে অহঙ্কার পাঁড়ের বক্তৃতা শুনছেন এ রকম ভক্তও দেখেছি আমি স্বচক্ষে। অহঙ্কার পাঁড়ের বক্তৃতায় সায় দেওয়া খুব যে একটা অসম্ভব ব্যাপার তা নয়। হাসি চাপবার একটু ক্ষমতা থাকলেই হল।

তিনি হয়তো বললেন—"দেখুন, আকাশের সম্বন্ধে একটা বড় কথা আবিষ্কার করেছি।"

উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে উঠলেন সবাই।

স্পর্দ্ধিত দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অহঙ্কার পাঁড়ে খানিকক্ষণ। ভাবটা যেন—আমার আবিষ্কারকত্বে সন্দেহ প্রকাশ করবার সাহস তোমাদের আছে নাকি? যদি থাকে—

সকলেই জানেন, এ অবস্থায় চুপ করে থাকাটাই সঙ্গত। অহঙ্কার পাঁড়ে তখন বললেন—"জানেন সেটা কি?"

প্রায় সমস্বরে—"না"

"আন্দাজ করুন"

নানা ভঙ্গীতে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন সকলে এবং ব্যর্থকাম হলেন।

একজন মাথা চুলকে মৃদু হেসে শ্রদ্ধাগদগদ কণ্ঠে বললেন—"আপনিই বলুন"

অহঙ্কার পাঁড়ে বললেন—"আকাশ নীল"

এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু কেবলমাত্র মুচকি হাসির সায় পেয়ে

সন্তুষ্ট থাকবার লোক অহঙ্কার পাঁড়ে নন। তিনি দাবি করেন তিনি আকাশকে যে নীল দেখছেন তার মধ্যে অনন্তা আছে। তিনি যা দেখছেন তা আর কেউ দেখেনি। তাঁর বক্তব্য—"আমি শুধু আকাশ দেখছি না, আমি শুধু নীল দেখছি না, আকাশ নীল বলতে আপনারা যে বাহ্য-রূপটা বোঝেন তা-ও দেখছি না আমি। আকাশের নিগূঢ় সত্তা, যাকে আমি আকাশত্ব আখ্যা দিতে চাই এবং নীলের অন্য-বর্ণ-সম্পর্ক-হীনতা, যাকে আমি নীলত্ব নামে অভিহিত করতে চাই—এই উভয় বৈশিষ্ট্যের রহস্যময় যোগাযোগ আমার মর্ম চেতনায় যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করছে তাই আমি প্রত্যক্ষ করছি রস-পরকলা-যোগে।"

সুতরাং তিনি চান এজন্য সকলে মিলে তাঁকে ঘিরে বাহবা বাহবা করতে থাকুক। বাহবা বাহবা করতে বাধ্য তারা। তাঁকে প্রত্যেক শিল্প-সভায়, সাহিত্য-সভায়, গণ-সভায়, জন-সভায়, সাংস্কৃতিক সভায় সভাপতি করতে হবে। তাঁর নাম হাততালিতে বাজবে, রেডিওতে বাজবে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্তম্ভে। সমাজকে উঠতে বসতে হবে তাঁর কথায় কথায়। তিনি নীলকে নীল, সবুজকে সবুজ বলেছেন, এ কি সোজা কথা? এজন্য নীলের এবং সবুজেরও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাঁর কাছে। নীলের সত্যরূপ চিনতে পারে ক'টা লোক। সবুজকে সবুজ বলবার মতো বুকের পাটা ক'জনের আছে?

লুচি-লুব্ধ কয়েকটা ছোঁড়ার প্রশংসায় কেন সন্তুষ্ট থাকবেন তিনি। দেশ সুদ্ধ সবাই তাঁকে ঘিরে বাহবা-কীর্তন করবে না কেন? কেন—কেন—কেন?

নিদারুণ পরিস্থিতি। এহেন গুণী লোককে চিনতে বাংলাদেশের লোকেরও দেরি হয়। তারা হুজুকে। গান্ধী জওহরলাল নিয়েই মত্ত, অহঙ্কার পাঁড়ের দিকে চাইবার অবসর হল না তাদের।

মোহনভোগখোর কয়েকটা ছোঁড়া ছাড়া আর কেউ তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না।

...নিরুদ্ধ আক্রোশে কিছুদিন চুপ করে রইলেন অহঙ্কার পাঁড়ে। তারপর তাঁর সমালোচনায় বাজল নতুন সুর। বাহবা-বিরোধী হয়ে উঠলেন তিনি। কেউ কাউকে বাহবা দিলেই ক্ষেপে উঠতেন। রক্তচক্ষু, বিস্ফারিত-নাসা মুক্তকচ্ছ হয়ে যে সব কাণ্ড করতেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বুক চাপড়াতেন, চুল

ছিঁড়তেন, মুখ-বিকৃতি করতেন। লম্ফ দিয়ে ক্রমাগত বলতেন—'ছোটলোক, ছোটলোক ; ছোটলোক হয়ে গেছে সব !'

দূরদর্শী মধ্যবিত্ত আত্মীয়দের হৃৎকম্প হত।

পাগলা গারদের কর্তৃপক্ষেরা অহঙ্কার পাঁড়েদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও আর এক ধরনের লোক আছেন যাঁরা এঁদের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁরা শিল্পী,—ছবির বিষয় খুঁজে বেড়ান যাঁরা।

একদিন একজন শিল্পী অহঙ্কার পাঁড়ের কাছে এসে সবিনয়ে নিবেদন করলে, "আপনার একটি ছবি আঁকব আমি। দেবেন আঁকতে ?"

"আমার ছবি! আমার ছবি এঁকে কি হবে! সতু ঘোষের ছবি আঁকুন, নাম হয়েছে তার ফুটবল খেলায়। আমি সামান্য মানুষ।"

শিল্পী বিনয়ের মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে বললে,—"আজ্ঞে না, আপনিও অসামান্য।"

একজন শিল্পীর মুখে এ কথা শুনে মনে মনে যদিও প্রীত হলেন অহঙ্কার পাঁড়ে, মুখে তবু বললেন—"মহাবিপদে পড়া গেল দেখছি আপনাকে নিয়ে—"

স্তাবক দু-একজন দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছে, গদগদ হ'য়ে উঠল তাঁদের চোখের দৃষ্টি। মনে হ'ল তাঁরা যেন নীরবে মিনতি করছেন অহঙ্কার পাঁড়েকে রাজী হ'য়ে যাবার জন্য।

শিল্পী আবার বললেন—"সত্যিই আপনার ছবি আঁকবার মতো"

"কি করতে হবে আমাকে ?"

"বসে থাকতে হবে শুধু"

ছবি আঁকা শুরু হল। মধ্যপথেই দু-একবার বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন অহঙ্কার পাঁড়ে।

শিল্পী বললেন—"শেষ হোক আগে, তারপর যা বলবার বলবেন।"

...শেষ হল। ছবির দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে বোমার মতো ফেটে পড়লেন অহঙ্কার পাঁড়ে। নিজের আলেখ্য সম্বন্ধে তারস্বরে যা বললেন তা অলেখ্য। ছবি নিয়ে ছুটে পালাতে হল শিল্পীকে।

ঠিক পরদিনই দেখা গেল শিল্পী আবার আসছে। এবার সাইকেল চড়ে। তাঁর পিছনে একটি কুলি কাগজে মোড়া ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির মতো কি যেন একটা আনছে মাথায় ক'রে। কাছে আসতে দেখা গেল, একটা নয়—দুটো।

অহঙ্কার পাঁড়ে বারান্দাতেই বসেছিলেন।

চোখ পাকিয়ে বললেন—"আবার কি!"

শিল্পী বললেন—"নিজের চোখেই দেখুন।"

ব'লেই একটা মোড়ক খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। তাঁর প্রথম আঁকা ছবিটি। তারপর হেঁট হয়ে দ্বিতীয় মোড়কটির বাঁধন খুলতে লাগলেন। অহঙ্কার পাঁড়ের মনে হ'ল বোধ হয় ভাল ক'রে আর একখানা ছবি এঁকে এনেছে অনুতপ্ত-চিত্তে। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সাগ্রহে! দ্বিতীয় বস্তুটি ছবিখানির পাশে রেখেই শিল্পী কিন্তু তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন বারান্দা থেকে। এবং সাইকেলে চেপে উধাও হয়ে গেলেন নিমেষে। অহঙ্কার পাঁড়ে বিস্মিত হলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন দ্বিতীয় ছবিটি কাগজ দিয়ে ঢাকা রয়েছে তখনও। উঠে গিয়ে খুললেন সেটা তাড়াতাড়ি। দেখলেন ছবি নয়, একটি বড় আয়না।

● দ্বিতীয় শতক ●

রাজাধিরাজ

সেদিন পর্যন্ত জানিতাম, আমিই রাজা, কিন্তু অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছিল। রাজাধিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।

…শ্রাবণের নিবিড় সন্ধ্যা সেদিন। সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। রিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ভেক-কণ্ঠের উন্মত্ত কোলাহলের পটভূমিকায় ঝিল্লীকুল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সূক্ষ্ম সুরের জাল বুনিয়া চলিয়াছে। আমার ঘরের বাহিরে জানালার ঠিক নীচেই যে কালো হাঁড়িটা অবজ্ঞাত অবস্থায় এতদিন পড়িয়াছিল, সহসা সে একটা নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, জলপূর্ণ হইয়া আমার ভিজা চালটার সহিত কথোপকথন জমাইয়া তুলিয়াছে।

টপ্ টপ্ টপ্ টপ্…অবিশ্রান্ত আলাপ চলিতেছে।

সহসা সমস্ত মনটা খুশি হইয়া উঠিল। বর্ষা-সন্ধ্যাটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইবে। উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি—গাঁজা, আফিং, চরস এমন কি এক বোতল মদ পর্যন্ত হাতের কাছে মজুত। নেশার রাজা আমি, সব রকম নেশাই জীবনে করিয়াছি, কিন্তু এমন রাজকীয় যোগাযোগ ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই।

কিন্তু একটু চিন্তায় পড়িলাম। সবগুলো তো একসঙ্গে চালাইতে পারা যাইবে না। চালানো উচিতও নয়। কোনটা আগে শুরু করি? অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও যখন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না তখন স্টোভ জ্বালিতে বসিয়া গেলাম। চা পান করিয়া তাহার পর যাহা হয় ঠিক করা যাইবে। বেশ কড়া করিয়া এক কাপ চা পান করিলাম। মস্তিষ্ক ঈষৎ চাঙ্গা হইল বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। কোন্‌টা আগে শুরু করি? ঠাণ্ডার দিনে অবশ্য মদটা জমিবে ভাল, কিন্তু গাঁজাই বা কম কিসে! সহসা কমলাকান্তের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—ভাই, অহিফেনকে অবহেলা করিও না। পরমুহূর্তেই চরসের মধুর গন্ধ মনকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। এমন শ্রাবণ-সভায় কাহাকে সভাপতির আসনে বসাই? দোদুল্যমান চিত্তে বসিয়া আছি, এমন সময় দ্বারে কে যেন সন্তর্পণে করাঘাত করিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। প্রবেশ করিল একটি শীর্ণকান্তি ব্যক্তি। পূর্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রবেশ করিয়া ব্যক্তিটি যাহা বলিল তাহাতে কিন্তু পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

"প্রথমেই একটা কথা বলে নিই আপনাকে। আমি একটু নেশা ক'রে থাকি। এই বর্ষায় আজ রাত্রে আর বাড়ি ফিরতে পারছি না। এইখানেই একটু নেশা করে রাতটা কাটিয়ে যাব ভাবছি। দয়া করে একটু জায়গা দেবেন কি?"

দোসর পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম।

সোচ্ছ্বাসে বলিলাম, "নিশ্চয়। শুধু জায়গা কেন, নেশাও দেব। আসুন, বসুন।"

লোকটি বসিল এবং আড়চোখে একবার আমার দিকে চাহিল। মনে হইল, তাহার অধরে একটা অবজ্ঞার হাসি খেলিয়া গেল যেন।

সম্রাট যেমন দরিদ্র প্রজাকে প্রশ্ন করে—কি চাই তোমার—অনেকটা সেইরূপ ভাবেই আমিও তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, "কি নেশা করবেন আপনি—"

"কি আছে আপনার, সেইটা আগে শুনি"—খুব মৃদুকণ্ঠে বলিল।

"গাঁজা চলবে?"

"দিন এক ছিলিম।"

লোকটির কণ্ঠস্বর খুবই মৃদু।

দিলাম। স্বহস্তে সাজিয়া ছিলিমটি তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম। হাজার হোক অতিথি। উবু হইয়া বসিয়া এমন একটি টান দিল যে, ছিলিমটি ফাটিয়া গেল। তাহার পর যথারীতি দম বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ এবং আস্তে আস্তে ধোঁয়াটি ছাড়িতে লাগিল। সবটুকু ধোঁয়া নিঃশেষে বাহির করিয়া দিয়া আমার দিকে চাহিল এবং মৃদুকণ্ঠে বলিল—"এ কিছু হ'ল না, দিন আর এক ছিলিম"

আমার দ্বিতীয় ছিলিম ছিল না, সুতরাং অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

"গাঁজা আর আছে?"

"আছে"

"আনুন"

যতটুকু ছিল বাহির করিয়া দিলাম। চিবাইয়া খাইয়া ফেলিল।

"আর কি আছে আপনার?"

"চরস আছে"

"দিন"

কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত চরসটা ফুঁকিয়া দিল।

তাহার পর হাসিয়া বলিল, "এতেও কিছু হ'ল না, আছে নাকি আর কিছু ?"

"আফিং আছে ?"

"দিন দেখি"

কৌটাটি হাতে লইয়া সমস্তটা মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া লজেঞ্জের মত চুষিয়া চুষিয়া খাইতে লাগিল। বিস্ফারিত নেত্রে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

"জলীয় আছে নাকি কিছু ?"

"মদ আছে"

"আনুন দেখি জমে কি না"

মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠিলাম এবং মদের বোতলটা আনিয়া দিলাম। ঢক ঢক করিয়া নিমেষে সবটা শেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিলাম, এইবার বোধ হয় কাত হইবে। হইল না। পরমুহূর্তেই মাথা তুলিয়া দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া বলিল, "কিৎস্যু হ'ল না। আর কিছু কি আছে আপনার ?"

"আর তো কিছু নেই"

"নেই ? আমার কাছে আছে কিছু। সেইটে বার করি তা হলে।"

ট্যাঁক হইতে একটি ছোট কৌটা বাহির করিল।

কৌটাটি খুলিতেই কৌটার ভিতর হইতে ছোট একটি সাপ টপ্ করিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। লিক্লিকে ছোট সরু সাপ। সে কৌটাটি একবার দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের নিকট লইয়া গেল, সাপ ছোবল মারিল। তাহার পর সেটি বাম নাসারন্ধ্রের নিকট লইয়া গেল, আবার সাপ ছোবল মারিল। তাহার পর কৌটাটি বন্ধ করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে জড়িত কণ্ঠে বলিল—'এইবার জমেছে মনে হচ্ছে। শুচ্ছি।'

শুইয়া পড়িল।

আমি স্তম্ভিত হইয়া করজোড়ে বসিয়া রহিলাম। বাহিরে কেলে হাঁড়িটা বলিতে লাগিল—টপ্ টপ্ টপ্ টপ্…

রামগল্প

রাম-রাজত্ব এখনও আছে। আমাদের দৃষ্টি কলুষিত বলিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি না। পবিত্র-দৃষ্টি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি সংগ্রহ করিয়া সুধীবর্গের গোচরে নিবেদন করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে শান্তি পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল। সহসা কিন্তু একদিন তিনি শুনিলেন যে জনৈক দস্যু নাকি তাঁহার রাজ্যে যথেষ্ট লুটপাট করিতেছে, প্রজারা রাজদরবারে নালিশ করিয়াও কোন সুফল পাইতেছে না। তাহাদের নালিশ নাকি গ্রাহ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে না।

তিনি মন্ত্রীকে ডাকিলেন। সমস্ত শুনিয়া মন্ত্রী মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, কই মহারাজ, এরূপ কোনও দস্যুর সংবাদ তো শুনি নাই।

জলদগম্ভীর কণ্ঠে দাশরথি আদেশ করিলেন, অবিলম্বে অনুসন্ধান করুন।

ঈষৎ কাসিয়া মন্ত্রীমশায় নতমস্তকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

…ছয় মাস অতীত হইল। কোন সুরাহা হইল না। লুটপাটের গুজব কানে আসিয়া প্রজা-প্রাণ রাঘবের চিত্তকে ক্রমাগত উদ্বেলিত করিতে লাগিল।

পুনরায় মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন। বস্তুত মন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকার রাজনৈতিক পদক্ষেপ করা যে-কোনও রাজার পক্ষে অসম্ভবই। জানকী-বল্লভের পক্ষে তো বটেই—মন্ত্রীই তাঁহার সব।

মন্ত্রী, দস্যুর কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি ?

এখনও পাই নাই। অনুসন্ধান চলিতেছে।

অনুসন্ধান কতদিন চলিবে ?

শীঘ্রই শেষ হইবে আশা করি। দক্ষ কর্মচারিগণের উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছি—

একটু তাড়া দিন।

যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

ঈষৎ কাসিয়া মন্ত্রী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আরও ছয় মাস কাটিল। আরও বহু বেনামী পত্র আসিয়া কৌশল্যা-নন্দনের প্রজাবৎসল হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মন্ত্রীকে পুনরায় আহ্বান করিলেন।

দস্যুর কোনও খবর মিলিল?

অনুসন্ধান চলিতেছে। দক্ষতর রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে।

রঘুমণি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কে এই দস্যু? যে সকল প্রজা তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছে, তাহারাও কেহ দস্যুর নামোল্লেখ করে নাই। দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত, নৃশংস প্রভৃতি নানাবিধ বিশেষণ ব্যবহার করিয়া তাহার দুর্দমনীয়তা পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছে মাত্র। তা ছাড়া সমস্ত দরখাস্ত বেনামী। নিজেদের নাম দিতেও কেহ সাহস করে নাই। সীতাপতির মনে হইল, তাঁহার রাজ্যে যে শান্তি বিরাজমান তাহা আপাত-শান্তি, একটা মিথ্যা মুখোশ মাত্র। ভিতরে ভিতরে প্রত্যেক প্রজার অন্তরে অশান্তির হল্‌কা বহিতেছে।

দুর্মুখকে আহ্বান করিলেন। দুর্মুখ নতমস্তকে সমস্ত শুনিয়া বলিল, মহারাজ, আমি সব জানি।

জান? কে সেই দস্যু?

ক্ষমা করিবেন, নাম বলিতে পারিব না।

পারিবে না? কেন?

ক্ষমা করুন আমাকে।

আমার আদেশ, বলিতেই হইবে।

আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। তাহার নাম আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না। তবে নিতান্তই যদি জেদ করেন, দেখাইয়া দিতে পারি।

রাবণারি রাঘব কোষবদ্ধ তরবারি ঈষন্নিষ্কাশিত করিয়া পুনরায় কোষবদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন, বেশ, তাই দাও।

তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন।

চল।

নগরের প্রান্তে আসিয়া রাজরথ থামিল।

দুর্মুখ সবিনয়ে কহিল, এইবার মহারাজকে পদব্রজে কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার করিতে হইবে। দস্যু অরণ্যনিবাসী।

বেশ, চল।

বেশ কিছুদূর হাঁটিয়া উভয়ে একটি অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূরে গিয়া দুর্মুখ নিম্নকণ্ঠে সন্তর্পণে কহিল, প্রভু, ওই দেখুন, ওই—

দুর্মুখের উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত তর্জনী অনুসরণ করিয়া রামভদ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দেখিতে পাইবামাত্র কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া পড়িলেন।

বৃক্ষশাখায় বসিয়াছিলেন স্বয়ং অঞ্জনানন্দন হনুমান।—

লক্ষণাগ্রজের গদগদ ভাব এখনও কাটে নাই।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

"সাপের কথাই যদি তুললেন তা হলে শুনুন একটা ঘটনা, আমার নিজের চোখের দেখা। আমার এক বন্ধু ছিল প্রহ্লাদ, তাকে তোমাদের মনে আছে কারও কি?"

দাস্থ খুড়োর বন্ধু প্রহ্লাদের নামই শুনিনি আমরা। বললাম সে কথা।

"শোনবার কথাও নয়। প্রহ্লাদ যখন এ পাড়ায় থাকত, তখন তোমাদের জন্মই হয় নি কারও। এই প্রহ্লাদকে একবার সাপে কামড়ায়।"

ডাক্তার রায় সসম্ভ্রমে থেমে গেলেন। সাপের সম্বন্ধে আলোচনা তিনিই করছিলেন। সাপ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন তিনি, এখনও করছেন। সাপ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলজনক প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি বলছিলেন, আমরা শুনছিলাম, এমন সময় দাস্থ খুড়ো বাধা দিলেন।

"একেবারে জাত সাপে কামড়েছিল প্রহ্লাদকে, বুঝলে। তাও আবার ব্রাহ্ম-মুহূর্তে। দেখতে দেখতে নীল হয়ে গেল ছোকরা, সকাল হ'তে না হ'তেই খতম। ডাক্তার বদ্যি ডাকবার সময় পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মায়ের একমাত্র ছেলে, সেই সবে বিয়ে হয়েছে, বোঝ ব্যাপারটা।"

ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে তামাক টানতে লাগলেন দাস্থ খুড়ো।

"তারপর?"

"তারপর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে আমরা পাড়ার ক'জন গেলুম, আর গেল তার মা, আর সদ্য-বিধবা বউটা। বউটা রোগা লিক্‌লিকে, তের চোদ্দ বছর বয়স। মাথায় ঘোমটা ছিল ব'লে চোখ মুখ দেখতে পাইনি তখনও। পরে দেখলুম।"

ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে তামাক টানতে লাগলেন দাস্থ খুড়ো।

"তারপর?"

"শ্মশানে যখন গেলুম আমরা তখন বেলা দশটা আন্দাজ হবে। শ্মশান খাঁ খাঁ করছে, লোকজন বিশেষ কেউ নেই। একটু দূরে একটা নৌকো লাগানো ছিল ঘাটে, সেটাকে আমরা লক্ষ্য করিনি প্রথমে। কাঠ এসে

পৌঁছয় নি। আমরা মড়াটাকে একধারে নাবিয়ে কাঠের প্রতীক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল সেই নৌকো থেকে একটি লোক নেবে আমাদের দিকে আসছেন। পরনে টকটকে লাল কাপড়। গায়ে টকটকে লাল উত্তরীয়। কুচকুচে কালো রং, মাথায় এক মাথা কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। প্রত্যেকটি চুল যেন বেঁকে সাপের মতো ফণা ধরে আছে। প্রহ্লাদের মায়ের বুক-ফাটা কান্না শুনেই সম্ভবত আকৃষ্ট হয়েছিলেন ভদ্রলোক। সোজা তিনি আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন"

আবার নীরব হলেন দাস্থ খুড়ো। তাঁর হুঁকোর ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ডাক্তার রায় উসখুস করে গলা খাঁকারি দিলেন একটু। তিনি 'ভাইপার' এবং 'কলিউব্রিন' জাতের বিষাক্ত সাপের তফাত কি কি, তাই বোঝাচ্ছিলেন আমাদের ছবি এঁকে।

"তারপর ?"

"এসেই জিগ্যেস করলেন, 'কতক্ষণ মারা গেছে' ?"

'ভোর বেলা'—বললাম আমরা। 'কি হয়েছিল' 'সাপে কামড়েছিল' 'সাপটাকে তোমরা কেউ দেখেছিলে কি ?' প্রহ্লাদের মা তখন সব বললে খুলে—'না, বাবা, আমরা নিজের চোখে দেখিনি সাপকে। শেষ রাত্রে বউমা কপাট খুলে বেরিয়েছিল বাইরে। কপাট খোলা পেয়ে সাপ ঘরে ঢোকে। প্রহ্লাদ বললে বিরাট একটা কেউটে, সে নিজের চোখে দেখেছিল সাপকে। সেই সাপ বিছানায় উঠে বাছাকে আমার কামড়ায়। চীৎকার ক'রে উঠতেই সাপটা বিছানা থেকে নেবে বেরিয়ে গেল সর সর ক'রে। তার একটু পরেই বউমা এসে ঘরে ঢুকলো। বউমাও সাপটাকে দেখতে পায়নি। এর বেশি আর কিছু জানি না বাবা। বাছা আমার দেখতে দেখতে কালীবর্ণ হয়ে গেল। তারপর এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল সব। আমারই পূর্বজন্মের পাপ বাবা, আর কিছু নয়,—খুব কাঁদতে লাগল প্রহ্লাদের মা।

আবার নীরব হলেন দাস্থ খুড়ো।

"তারপর ?"

"কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে কাপালিক বললেন—কিছু খাঁটি দুধ আর একটি নূতন মাটির সরা যোগাড় করতে পারেন যদি, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

খাঁটি দুধ আর মাটির সরা যোগাড় করা কি আর এমন শক্ত কাজ! ছুটলুম আমরা তক্ষুনি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দুধ আর সরা যোগাড় হয়ে গেল। সরাতে দুধটা ঢেলে রেখে ভদ্রলোক তখন বললেন মড়ার গা থেকে কাপড়-চোপড় সব খুলে নিন। যেখানটায় সাপে কামড়েছিল সেখানটা বেশ করে' খুলে রেখে দিন। যে সাপ কামড়েছে সে নিজেই এসে ওখানে মুখ লাগিয়ে বিষ চুষে তুলে নেবে। সে সাপ যেখানেই থাক আসতেই হবে তাকে। আপনারা কেউ টুঁ শব্দটি করবেন না। আমি ধ্যানে বসছি। এই ব'লে মড়ার পায়ের দিকে তিনি ধ্যানে বসে গেলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষ একজন আর কি! দৈবাৎ এসে পড়েছিলেন—"

আবার নীরব হলেন দাস্থ খুড়ো। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

"তারপর?"

"কুম্ভক ক'রে' ব'সে' রইলেন সামনে। আমরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ব'সে রইলাম চুপচাপ। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাইতে লাগলাম সাপ আসছে কি না দেখবার জন্যে। খাঁ খাঁ করছে শ্মশান, তাঁ তাঁ করছে রোদ, রক্তাম্বর কাপালিক বসে আছেন কুম্ভক ক'রে, সামনে মড়া, এক অদ্ভুত মায়ারাজ্য গ'ড়ে উঠল যেন চারিদিকে। সাপের কিন্তু দেখা নেই। তার পর হঠাৎ নজরে পড়ল বউটা ব'সে দুলছে আস্তে আস্তে। মাথার ঘোমটা খ'সে পড়েছে। মাথাটাও দোলাচ্ছে। ঠিক যেন সাপের ফণা। তারপর তার চোখের দিকে চেয়ে দেখি, ও বাবা, একেবারে সাপের চোখ, জ্বল জ্বল করছে নিষ্পলক দৃষ্টি! ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস পড়তে লাগল ক্রমশ নাক দিয়ে। জিবও বার করতে লাগল। মানুষের জিব নয়, সাপের জিব। কালো, দু'ভাগ করা!"

চুপ করলেন দাস্থ খুড়ো।

"তারপর?"

"আমাদের চক্ষু তো চড়কগাছ। কাপালিক কিন্তু ঠিক বসে আছেন অনড় হ'য়ে, চোখ বুজে দম বন্ধ ক'রে। মনে হতে লাগল, তিনিও যেন একটা মড়া। আমরাও বসে আছি সব রুদ্ধশ্বাসে।"

"তারপর—"

"তারপর আস্তে আস্তে বউটা লম্বা হয়ে শুল মাটির উপর গিরগিটির মতো। শুয়ে সাপের মতো এগিয়ে যেতে লাগল বুকে ভর দিয়ে প্রহ্লাদের পায়ের দিকে। পায়েই সাপটা কামড়েছিল। ক্ষতচিহ্নটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। বউটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সেইখানে মুখ লাগিয়ে চুষতে শুরু ক'রে দিলে"

"তারপর ?"

"চোঁ চোঁ ক'রে চুষতে লাগল"

"তারপর ?"

"আধঘণ্টাটাক পরে মনে হ'ল প্রহ্লাদের যেন নিশ্বাস পড়ছে একটু একটু। তারপর চোখ চাইলে"

"তারপর ?"

"তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল। হঠাৎ চেয়ে দেখি বউটা আর নেই। তার জায়গায় পড়ে আছে একটা কেউটে সাপ আর শাড়িখানা"

"তারপর ?"

"সাপটা নেতিয়ে পড়েছিল একেবারে। কাপালিক ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে চোখ মেলে চাইলেন। তারপর সরার দুধটা সাপটাকে খেতে দিলেন। চুক চুক ক'রে সব দুধটুকু খেলে"

"তারপর ?"

"তারপর সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল মাঠের মাঝখান দিয়ে। কিছুদূর গিয়ে ফণা তুলে চেয়ে দেখলে একবার আমাদের দিকে, তারপর চ'লে গেল। আমরাও প্রহ্লাদকে নিয়ে বাড়ি চ'লে এলাম"

"আমিও এবার যাই"—একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ডাক্তার রায় উঠে চ'লে গেলেন।

কয়েকটি শব্দ

সেদিন প্রভাতে প্রচুর শব্দসহযোগে নানারূপ মুখবিকৃতি করিয়া হারু দন্তধাবন করিতেছিল। দন্তধাবন সমাপ্ত করিয়া চক্ষু তুলিয়া দেখিল, একটি সুকান্তি সুবেশ যুবক তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যুবকের পিছনে একটি কুলি, কুলির মাথায় একটি বাক্স। চোখাচোখি হইতেই যুবকটি বলিল, "আমরা খবর পেয়েছি যে, এ গ্রামে আপনারই সবচেয়ে বড় দইয়ের কারবার, তাই আপনার কাছে এসেছি। প্রথমে কে-একজন খবর দিয়েছিল, কেষ্ট গোয়ালাই নাকি সবচেয়ে বড়, কিন্তু পরে শুনলাম খবরটা ভুল।"

গোঁফ মুছিয়া হারু বলিল, "কেষ্ট আমার ভাই। চোর একটা। ভেন্ন হয়ে গেছি আমরা অনেক দিন আগেই। দই চাই আপনার? কত?"

মৃদু হাসিয়া যুবকটি বলিল, "আমি নিখিল-ভারত দধি-সমিতি থেকে এসেছি"

হারু একটু থতমত খাইয়া গেল।

"কি চান আপনি?"

"আপনার দই পরীক্ষা করব একটু। জাতির স্বাস্থ্যগঠন করবার দায়িত্ব আমাদের। জাতকে গড়তে হবে। নিখিল-ভারত দধি-সমিতি আমাকে দিল্লী থেকে পাঠিয়েছেন আপনার নাম শুনে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাতে আপনি দধি প্রস্তুত করতে পারেন তারই ব্যবস্থা করতে এসেছি।"

"ও!"

তাহার নাম শুনিয়া ভদ্রলোক দিল্লী হইতে আসিয়াছেন! নিরক্ষর হারুর হৃদয় বেলুনের মতো ফুলিয়া উঠিল। ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই হ'ল আসল হিউম্যানিজ্‌ম"

হারু সসম্ভ্রমে বলিল "আজ্ঞে"

"কমিউনিজ্‌মের মূলকথাও এই"

"আজ্ঞে"

" গান্ধীজ্‌মের সঙ্গে তো এর কোনও বিরোধই নেই"

"আজ্ঞে"

"আপনার দই একটু দেখতে পারি কি ? যেটা আপনি সবচেয়ে ভাল মনে করেন তাই দেখান।"

"এই যে"

এক কড়াই ভাল দই হারু বাহির করিয়া দিল।

ভদ্রলোক কুলিটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন। "এটা নিয়ে যেতে পারবি ?"

"পারব"

"আচ্ছা ওই বাক্সটা নাবা"

বাক্সের ভিতর মাইক্রস্কোপ স্লাইড প্রভৃতি ছিল, খানিকটা দধি গুলিয়া ভদ্রলোক মাইক্রস্কোপে দেখিতে লাগিলেন। হারু সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাইক্রস্কোপে হইতে চোখ তুলিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "ইস, পোকা গিজগিজ করছে একেবারে"

"পোকা!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি নিজের চোখে দেখুন।"

হারু আগাইয়া আসিয়া মাইক্রস্কোপে চোখ দিল এবং আগন্তুক ভদ্রলোকের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া স্বচক্ষে দেখিল যে, অতি ক্ষুদ্রকায় অসংখ্য পোকা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। আশ্চর্য কাণ্ড!

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বলিলেন, "এই দই খেলে লোকের অসুখ করবে। আমরা এক রকম বড়ি দিচ্ছি, তা দিয়ে দই জমালে এসব হবে না। একটা দিচ্ছি আপনাকে, আপাতত এক পেয়ালা দুধে দিয়ে রেখে দেবেন রাত্রিতে, সকালে দেখবেন চমৎকার দই জ'মে গেছে।"

বড়িটি হাতে করিয়া বিস্মিত হারু দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এ দইটা কি ফেলে দেব ?"

"ফেলে দেওয়াই উচিত ; কিন্তু আমি একটু চেষ্টা করে দেখব ওষুধ-বিষুধ দিয়ে শোধরানো সম্ভব কি-না"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ তো। কোথা উঠেছেন আপনি ?"

"ডাকবাংলায়"

জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভদ্রলোক বলিলেন, "দেশের অধিকাংশ লোকই

অশিক্ষিত, বেসিক এডুকেশন হ'লে দেখবেন কালচারের লেভেল কি রকম বেড়ে যায়। ওয়ার্ধা স্কীমটা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে।"

হারু বলিল, "আজ্ঞে"

"আচ্ছা, তা হ'লে চলি আমি। নমস্কার।"

হারু হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

কিছুক্ষণ পরে হারুর মনে হইল, পোকা পড়া দইটা ভদ্রলোক শোধরাইতে পারিয়াছেন কি-না দেখিয়া আসা যাক।

ডাকবাংলোয় গিয়া হারু দেখিল, গ্রামের দুই-তিনজন লোক বসিয়া আছে। একজন একটি পাঁঠা আনিয়াছে, আর একজন খানিকটা ঘি, তৃতীয় ব্যক্তি কিছু দাদখানি চাল লইয়া বসিয়া আছে।

ভদ্রলোকের মুখে খই ফুটিতেছে—"ভিলেজ রিঅর্‌গ্যানিজেশন করাটাই প্রধান কাজ, গ্রামই হ'ল দেশের প্রাণ, স্টার্লিং ব্যালান্স নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, অস্পৃশ্যতা দূর করতে হবে, পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস ক'রে দিতে হবে, চরকা চালাও, শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই—"

"আমার দইটার কি হল হুজুর?"

"কিছু করা গেল না। ফেলে দিয়েছি।"

আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনিয়া হারু বাড়ি ফিরিল। ফিরিবার পথে দেখিল দইয়ের খালি কড়াইটি পড়িয়া আছে। ভদ্রলোক একেবারে চাঁছিয়া পুঁছিয়া সমস্ত দইটা ফেলিয়া দিয়াছেন। ট্যাক হইতে দই-জমানো বড়িটি বাহির করিয়া সে একবার দেখিল। শুঁকিল একবার। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

প্রয়োজন

আমার জীবনে দুইটি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

প্রথম ঘটনাটি খুবই সাধারণ। তোমরাও অনেকে হয়তো এ রকম দৃশ্য দেখিয়াছ। মেলায় একটি ভিখারী বালক ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, চোখের কোণে পিঁচুটি, মাথার চুল কটা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ক্ষীণকণ্ঠ তুলিয়া সকলের কাছেই সে হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল। কিন্তু মেলার ভীড়ে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবার সময় ছিল না কাহারও। আমার হঠাৎ দয়া হইল। ব্যাগ খুলিয়া প্রথমে তাহাকে একটা পয়সা দিতে গেলাম, কিন্তু দিতে গিয়া মনে হইল এক পয়সায় উহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে কি? অন্তত চার আনা না দিলে কিছুই হইবে না। একটা সিকিই তাহাকে দিলাম। তাহার মুখে হাসি ফুটিল। সে ছুটিয়া গিয়া কিন্তু যাহা কিনিল তাহা খাবার নয়, বাঁশি। একটি বাঁশি কিনিয়া মনের আনন্দে সে বাজাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একটু অসাধারণ। তখন দাঙ্গার সময়। আমরা প্রত্যেকেই লাঠিসড়কি প্রভৃতি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমি শুধু সংগ্রহই করি নাই, বিতরণও করিতেছিলাম। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না। বহু লাঠিপ্রার্থী জুটিয়া গিয়াছিল। বিতরণ করিতে করিতে শেষে একটিমাত্র লাঠি অবশিষ্ট রহিল। ঠিক করিলাম, এটি আর কাহাকেও দিব না। সেদিন খুব জোর একটা গুজব উঠিয়াছিল, মুসলমানেরা রাত্রিতে না কি আমাদের পাড়া আক্রমণ করিবে। কারফিউ জারি হইয়াছে, রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ। তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আমি আমাদের বাহিরের ঘরে খিল লাগাইয়া একটি উপন্যাসে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। দ্বারে সন্তর্পণে কে যেন করাঘাত করিল।

"কে—"

"আমি কেনারাম।"

কেনারাম আমার বন্ধু। সে লাঠি লইয়া যায় নাই। ভাবিলাম, লাঠির জন্যই আসিয়াছে। কপাট খুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি, লাঠি চাই না কি—"

"না, বিড়ি। আছে তোমার কাছে? দু'দিন থেকে বিড়ির দোকান বন্ধ, পেট ফুলছে আমার—"

অত রাত্রে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কেনারাম আসিয়াছিল লাঠির জন্য নয়, বিড়ির জন্য।

সকলের প্রয়োজন সমান নহে।

আমার কোনও অভাব নাই, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা আছে, হাতে প্রচুর সময়, কাজ করিয়া খাইতে হয় না, পায়ের উপর পা দিয়া আরামে দিন কাটাইতে ছিলাম, অর্থ দিয়া যত প্রকার আনন্দ ক্রয় করা সম্ভব সবই করিয়াছি, তবু আমি আত্মহত্যা করিলাম, কারণ তাহার প্রয়োজন ছিল। সকলের প্রয়োজন সমান নহে। উপরোক্ত গল্প দুইটি ভাল করিয়া প্রণিধান কর।

* * *

পিস্তলের আঘাতে বিদীর্ণমস্তক মৃত্যুঞ্জয় সিংহ যে রক্তাক্ত বালিশটার উপর মাথা রাখিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন তাহারই তলায় উপরোক্ত লেখাটি ছিল।

প্রাচীন পন্থা

ব্রহ্মার বৈঠকখানাতেই একটি সভা বসিয়াছে, কারণ, বৈঠকখানাটি বেশ প্রশস্ত। ব্রহ্মাকে কিন্তু সুকৌশলে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। অতি আধুনিক দেবতাগণ ব্রহ্মার সান্নিধ্য তেমন পছন্দ করেন না। বুড়া অত্যন্ত দোষ-অনিসন্ধিৎসু হইয়া পড়িয়াছেন, দেখা হইলে একটা-না-একটা দোষ বাহির করিয়া ভৎর্সনা করেন। তা ছাড়া, পিতামহের মতামত অতিশয় সেকেলে, আধুনিক যুগে একেবারে অচল। কিন্তু তাঁহাকে বাদ দিয়া চলাও শক্ত। তিনি শুধু অমর নন, অত্যুৎসাহীও। নানাবিধ সচিত্র সাময়িক পত্র ও রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সহায়তায় তাঁহাকে পিছন দিকের একটি ঘরে অন্যমনস্ক করিয়া রাখা হইয়াছে। আজিকার সভায় অন্তত তাঁহার ন্যায় প্রাচীনপন্থী ব্যক্তির ভ্যানভ্যানানি চলিবে না। অতি-আধুনিক একটি সমস্যার আলোচনার জন্য অতি-আধুনিক দেবতাকুল সমবেত হইয়াছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি দেবতারাও কেহ নাই। তাঁহারা অহোরাত্র স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত, সভা করিবার মতো অবসর তাঁহাদের নাই। এ সভায় আছেন তড়িৎকুমার, জ্যোৎস্নাকুমার, অনলকুমার, অনিলকুমার, সলিলকুমার, তপনকুমার প্রভৃতি ছোকরা দেবতাগণ।

মানব সমাজের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহাদের আশঙ্কা মানব সমাজ এইবার ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং দেব সমাজও থাকিবে না। কারণ, মানবের কল্পলোকেই দেবতাদের বাস। দেবতাদের অস্তিত্ব অটুট রাখিতে হইলে মানুষকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার। মানুষ 'অ্যাটম্ বম্' আবিষ্কার করিয়াছে। কি সর্বনাশ!

তড়িৎকুমার কবি। বেশ নাম হইয়াছে। তিনি বলিতেছিলেন—জিলো পাখীর জিষ্ণুতার জাকড়ে প্রশান্ত ফুঁ দাও একটি ···।

সকলে বলিয়া উঠিলেন···অর্থাৎ?

তড়িৎকুমার নীরব। তাঁহার ওষ্ঠের প্রান্তভাগে কি একটা ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিতেছিল না। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাঁহার প্লীহা চমকাইয়া উঠিল। শুধু তাঁহার

অভিধান সৃষ্ট হইবে, তখন সেই অভিধানগুলি হইতে গাধা নাম তুলিয়া দিলেই চলিবে।

সলিলকুমার। কিন্তু মানুষের স্মৃতিকে ভস্মীভূত করিবার শক্তি কি অগ্নিদেবের আছে? আমার বিশ্বাস নাই—

লম্বকর্ণ। আমি অত শত বুঝি না। যে-কোনও উপায়ে হোক কথাটিকে লোপ করিতে হইবে।

সহসা দেবগণ একযোগে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। লম্বকর্ণ একটু অবাক হইয়া গেল। তাহার পর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, পিছনের ঘরের জানলায় স্বয়ং চতুরানন হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। অতি-আধুনিক মানবগণ হয়তো পিতামহের নাকের উপরই সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না কিন্তু অতি-আধুনিক দেবতারা ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

পিতামহ। [সোচ্ছ্বাসে] স্বাগতম্, স্বাগতম্! বাতায়ন-পথে তোমার সমস্ত কথাই শুনিয়াছি। ওসব ছেলে-ছোকরাদের কর্ম নয়, আমিই সব ব্যবস্থা করিয়া দিব। ভিতরে আইস।

[লম্বকর্ণ ভিতরে প্রবেশ করিল]

লম্বকর্ণ। কি ব্যবস্থা করিবেন বলুন!

পিতামহ। তোমাদের স্ট্রাইক করিতে হইবে! উহাই আধুনিক পদ্ধতি। ছোঁড়াগুলো মনে করে আমি আধুনিক জগতের কোনও খবর রাখি না। হুঁঃ— দেখ না সব ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

লম্বকর্ণ। স্ট্রাইকের কথা আমিও ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু স্ট্রাইক করিব কাহার বিরুদ্ধে? ধোপারা আজকাল আমাদের তোয়াক্কা করে না। রিক্‌শা এবং মোটর লরি করিয়া কাপড় লইয় যায়। আমাদের আর কদর নাই।

পিতামহ। ওই রিক্‌শা, মোটর লরির বিরুদ্ধেই আন্দোলন করিতে হইবে।

লম্বকর্ণ। তাহা কি করিয়া সম্ভব?

পিতামহ। [সহাস্যে] নিশ্চয়ই সম্ভব। আগে একটু বিশ্রাম করিয়া লও, তাহার পর আলোচনা করিব। ওহে বিশ্বকর্মা, শ্রীযুক্ত রাসভকে তুমি দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় লইয়া যাও, কোনরকম অযত্ন যেন না হয়।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় গিয়া রাসভ অবাক হইয়া গেল। অপ্সরাগণ তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। স্বয়ং উর্বশী ,তাহার গলায় মালা দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বকর্মা নন্দনকানন হইতে মরকতমণিসন্নিভ দূর্বারাজি আনিয়া দিল, স্বর্ণনির্মিত কটাহে সোমরস পান করাইল।

…কিছুক্ষণ পরে পিতামহ দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন উর্বশীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শ্রীরাসভ গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন।

পিতামহের চতুর্মুখে হাসি ফুটিল।

শ্রীরাসভের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

অভিধানগুলিতে 'গাধা' শব্দ এখনও বিদ্যমান আছে।

অবচেতনা

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্রুতগামী ট্রেন বেশ দ্রুতবেগেই ছুটিয়া চলিয়াছে। পরের স্টেশন বর্ধমান। আমার কামরায় দ্বিতীয় লোক নাই। আমি এককোণে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলাম। বোধ হয় একটু তন্দ্রাই আসিয়াছিল। ট্রেনের ঝাঁকানিতে সেটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিয়া কিন্তু আর তাহা বন্ধ করিতে পারিলাম না। সামনের বেঞ্চে একটি অপরূপ সুন্দরী বসিয়া আছে। অবাক কাণ্ড! মেয়েটি এতক্ষণ এখানেই ছিল অথচ দেখিতে পাই নাই?

...অপরূপ সুন্দরী। গায়ের রং ধপধপে ফরসা বলিলে কিছুই বলা হয় না। শ্বেতকমলের পাপড়ি দিয়া কে যেন তনু দেহখানি নির্মাণ করিয়াছে। তুষারশুভ্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, কিন্তু ঠিকটি বলা হইবে না যেন। অনেকখানিই যেন অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে। নিখুঁত সাদা, কিন্তু জীবন্ত।

...বিধবা কি? পরনের কাপড়ও সাদা, পাড় পর্যন্ত নাই। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না। বরং মনে হইতেছে কোনও রং থাকিলেই যেন ছন্দপতন ঘটিত। মাথায় সিঁদুর আছে কি না বোঝা যাইতেছে না। কপাল পর্যন্ত আধ-ঘোমটা দেওয়া। মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। হাত দুইটি কোলের উপর। দুই হাতে দুইটি দুগ্ধধবল শাঁখা। আর কোনও অলঙ্কার নাই।

...মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। ক্রমশ একটা অপরূপ গন্ধ চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। উগ্র নয়, স্নিগ্ধ, মধুর—অতি মধুর গন্ধ একটা। যূথিকা-বনের যে সৌরভ ধীরে ধীরে মরমে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাতসারে প্রাণ মন উতলা করিয়া দেয়, এ যেন সেই সৌরভ।

মহাভারতে পদ্মগন্ধার কাহিনী পড়িয়াছিলাম সেইরকম কিছু একটা না কি!

মেয়েটি যেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আর আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না।

"আপনি কোথায় যাবেন?"

মেয়েটি ঘাড় আর একটু নীচু করিল। তাহার পর মৃদু—অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আমি হারিয়ে গেছি।"

"হারিয়ে গেছেন! তার মানে—"

তারপর যাহা ঘটিল তাহা অবিশ্বাস্য।

ফাল্গুনের স্বচ্ছ কুয়াশার মতো ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল সে। কেবল এই কয়টি কথা বাতাসে ভাসিয়া আসিল—"আমি সীতাভোগের স্বপ্ন"

ট্রেন আসিয়া বর্ধমানে প্রবেশ করিল।

সাধু

সাধারণতঃ যে সব জিনিস সাধুত্বের পরিচায়ক তার কিছুই ছিল না সাধুটির। তাঁর নিজের কোনও সংসার ছিল না বলেই লোকে তাঁকে সাধু বলত। অতিশয় সাদাসিধা ধরনের লোক ছিলেন তিনি। ভস্ম জটা গেরুয়া এসব তো ছিলই না, মুখে বুকনিও ছিল না। আত্মা পরমাত্মা জীবাত্মা কখনও শোনা যায় নি তাঁর মুখে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁর পরোপকার করবার প্রবৃত্তির জন্য। দরিদ্র রোগী নিয়ে প্রায়ই আসতেন তিনি মাঝে মাঝে। সেই সূত্রেই ডাক্তারবাবুর বেকার ভাই জীবুর সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়। জীবু এই সাধুসঙ্গ লাভ ক'রে পরম উল্লসিত হয়েছিল। অনেকদিন থেকে একটি সাধুর খোঁজ করছিল সে। তাঁরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ-যাগ কত কি জানা থাকে তাঁদের, একটা 'হদিস' কেউ যদি 'বাতলে' দেন তাহ'লে ভাবনা কি। জীবু সব জিনিসই টাকার পরিমাণে বিচার করত। অবশ্য তার চিন্তাধারাটা ঠিক পাশ্চাত্ত্য নকলে নয়। তার ধারণা আমরা যেদিন থেকে সোজাসুজি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করলাম অর্থাৎ ইতরের মতো টাকা রোজগারে মন দিলাম সেইদিন থেকেই আমরা ডুবলাম। আমাদের দেশ যোগীর দেশ, যোগবলে আমরা ঐশ্বর্য পাব। আমাদের কি কেরানীগিরি সাজে, না ব্যবসা করা মানায়! সুতরাং জীবু ভারতবর্ষীয় পন্থাই অন্বেষণ করছিল এতদিন, কেবল মনোমত গুরু পাচ্ছিল না। এই সাধুটিকে পেয়ে সে যেন নিজের ভবিষ্যৎকেই পেয়ে গেল নিজের আয়ত্তের মধ্যে। ভারী পুলকিত হল। পুলকের প্রথম অবস্থাটা কেটে যাবার পর কিন্তু তাকে উপলব্ধি করতে হল ব্যাপারটা সে যত সহজ মনে করেছিল তত সহজ নয়। সাধু কিছুতেই আমল দিতে চান না। জীবুও ছাড়বার লোক নয়। আড়ালে পেলেই বলে—ঠাকুরমশাই, দীক্ষা দিন আমাকে। সাধু হাসেন। বলেন—আমি আবার কিসের দীক্ষা দেব। আমি কি জানি। জীবু অধিকতর মুগ্ধ হয়। আসল সাধু কি সহজে ধরা দেয়?

দিন কাটে। জীবু আমোল পায় না। একদিন কথায় কথায় সে তন্ত্রের কথা পাড়লে। বললে—আচ্ছা, ঠাকুরমশাই, শুনতে পাই তন্ত্রসাধনা করলে না কি অনেক কিছু পাওয়া যায়। সাধু বললেন—আমিও শুনেছি। তারপর মৃদু হেসে চুপ করে

গেলেন। জীবু এত সহজে ছাড়বার লোক নয়—তিনবার ফেল করে ম্যাট্রিক পাস করেছে সে—লেগে থাকবার মতো ধৈর্য তার আছে। সাধুর স্মিতমুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সবিনয়ে পুনরায় সে প্রশ্ন করলে—তন্ত্র ব্যাপারটা কি ধরনের একটু যদি বুঝিয়ে দেন। সাধু হেসে বললেন—আমি ঠিক জানি না। জীবুকে তাড়া-তাড়ি বলতে হল—আচ্ছা, থাক থাক এখন থাক, পরে কোন এক সময়ে হবে এখন। অর্থাৎ, জীবু ব্যাপারটাকে শেষ করতে চায় না, আলোচনার খুঁটটা ধরে' থাকতে চায় যেমন করে হোক। সাধুটি মাঝে মাঝে আসেন আবার চলে যান। তিনি ডাক্তার-বাবুর কাছে আসেন নিতান্ত আধিভৌতিক কারণে। কখনও চাঁদা চাইতে, কখনও কোন দুঃস্থ রোগী নিয়ে। ওই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান তিনি জনসেবা ক'রে। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের নাম লেখানো পাণ্ডা তিনি নন, অথচ সব সম্প্রদায়ের মধ্যই থাকেন। কংগ্রেস, রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দুমহাসভা সব দলেই দেখা যায় তাঁকে। জীবু সুযোগ খোঁজে কি ক'রে তাঁকে আড়ালে পাবে। আর একদিন সুযোগ মিলল। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে অগ্রসর হবার প্রয়াস পেল জীবু। সসঙ্কোচে বলল, আচ্ছা, প্রাণায়াম জিনিসটা কি রকম বলুন তো, ঠাকুরমশায়। সাধু চকিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—শুনেছি নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া। জীবু সোৎসাহে ব'লে উঠল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই, শুনেছি হঠযোগের আসল জিনিসই হল প্রাণায়াম—নয়? জীবু এসব বিষয়ে গোপনে পড়াশোনাও করত। সাধু চুপ করে রইলেন। জীবু একটু মাথা চুলকে আবার প্রশ্ন করলে—কি বলেন? সাধু উত্তর দিলেন—শুনেছি তাই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর জীবু পুনরায় অগ্রসর হবার চেষ্টা করল একটু। বললে—আচ্ছা শুনেছি প্রাণায়াম করলে কপালের ঠিক মাঝখানে না কি আলো দেখা যায়? সাধু উত্তরে বললেন—গেলই বা। তাঁর কণ্ঠস্বরে এবার একটু বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল যেন। জীবু বললে—সত্যি যায় না কি? জীবুর চেষ্টা সাধুর মুখ দিয়ে ওই জাতীয় একটা কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া। এতদিন চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছে না সে লোকটাকে। এর উত্তরে সাধু যা বললেন তাতে অন্য কেউ হলে দ'মে যেত। বললেন—রগ ঘেঁষে জোরে একটা চড় মারলেও কপালের মাঝখানে আলো দেখা যায়—যাকে চলতি বাংলায় বলে সরষের ফুল। জীবু দমবার ছেলে নয়, হেসে বললে—ও আলোটালো কিছু নয় তাহলে—অ্যাঁ, কি বলেন। নাছোড়বান্দা

লোকটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে সাধু বললেন—এসব জানবার আপনার এত আগ্রহ কেন। জীবু একটু আশান্বিত হল। তারপর একটু ইতস্তত: ক'রে বলে ফেলল—কেউ যদি পথ দেখিয়ে দিত সাধনা করতাম।

কিসের সাধনা করতেন? উদ্দেশ্যটা কি?

সত্যি কথাটা জীবু মুখ ফুটে বলতে পারলে না। আমতা আমতা ক'রে বললে—শুনেছি ওতে শক্তি বাড়ে।

কিসের শক্তি—

মনের—

তা না হয় বাড়ল। কি করবেন সে শক্তি নিয়ে?

থতমত খেয়ে জীবু এমন একটা কথা বলে ফেললে যা সে কোনদিন কল্পনাও করে নি।

বললে—ভগবানকে খুঁজব।

সাধু হেসে উত্তর দিলেন—ভগবানকে খোঁজবার দরকার নেই। তিনি সর্বত্রই আছেন, চেয়ে দেখলেই হল।

জীবু নির্বাক।

সাধু চলে গেলেন।

জীবুর মনে হ'ল এখনও বোধ হয় সময় হয় নি তাই ঠাকুর মশাই ধরা দিচ্ছেন না। নানারকম সাধুর গল্প সে শুনেছিল, সেই সব কথাই ভাবতে লাগল। কেউ নানারকম গন্ধ বার করতে পারে, কেউ ফল মাছ সন্দেশ রসগোল্লা নানারকম ভাল ভাল খাবার যে কোন মুহূর্তে আনিয়ে দিতে পারে, সোনা পর্যন্ত তৈরি করতে পারে কোনও কোনও সাধু, দুরারোগ্য অসুখের ওষুধ জানে অনেকে। এর একটা কোনও বিদ্যা সে যদি আয়ত্ত করতে পারে, বাস্, তাহলে আর ভাবনা কি। জীবুর দৃঢ় বিশ্বাস, এ সাধুটিরও অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তার সময় হয়নি বলেই বোধ হয় ধরা দিচ্ছেন না। গভীর জলের মাছ। সহজে ধরা দেনও না এঁরা। প্রতীক্ষা করতে হবে। জীবু প্রতীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ সুযোগ ঘটে গেল একদিন।

ডাক্তারবাবু একদিন দূরের গ্রামে একটি কঠিন রোগী দেখতে বেরুচ্ছেন। জীবুও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে। জীবুর যাবার কারণ, জীবু কিছুদিন আগে উক্ত গ্রামে

হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস করতে বসেছিল, রোগীর বাড়ির লোকেরা জীবুকে যাবার জন্যেও অনুরোধ করেছেন। তাঁরা বেরুতে যাবেন এমন সময় সাধুটি এসে হাজির হলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—আপনিও চলুন না। বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে গল্প করতে করতে।

এই দীর্ঘপথ একা জীবুর সঙ্গে যাবার সম্ভাবনায় ডাক্তারবাবু একটু বিব্রতবোধ করছিলেন। ভাই হলেও জীবুকে তিনি দু' চক্ষে দেখতে পারতেন না।

সাধু রাজী হয়ে গেলেন।

রোগীটি বৃদ্ধ। নিউমোনিয়া হয়েছে। অত্যন্ত সঙ্গিন অবস্থা। ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। একটু যা ভরসা রোগীর জ্ঞান আছে। ডাক্তারবাবু জ্ঞানবুদ্ধিমতো যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলেন। জীবুও এক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দিলে যদি লেগে যায় ভেবে। কিন্তু একটু পরে আর এক কাণ্ড হল। রোগী কি ক'রে জানতে পেরে গেল যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটি সাধুও এসেছেন। খবরটা শোনামাত্র রোগীর মনে অদ্ভুত বাসনা জাগল একটা। ডাক্তারবাবুকে সে অনুরোধ জানালে,—ওই সাধুর পায়ের ধুলো এনে আমার বুকে মাখিয়ে দিন তা'হলেই আমার বুকের ব্যথা কমে যাবে। আকুল অনুরোধ। জীবু বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ডাক্তারবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে সাধুকে বললেন। সাধু এরকমটা প্রত্যাশা করেন নি। বিব্রত কণ্ঠে শুধু বললেন—সে কি!

ডাক্তারবাবু হেসে জবাব দিলেন—তা আপনিই জানেন। আমাকে বলতে বলল বললাম। একটু দিন না, ক্ষতি কি।

না, না সে হয় না—

জীবু না-ছোড়।

সাধু ক্রমাগত প্রতিবাদ করতে লাগলেন—না, না, সে হয় না, আমার পায়ের ধুলোর কি মূল্য থাকতে পারে। উনি প্রবীণ লোক, ওঁর বুকে পায়ের ধুলো দেবার কি অধিকার আছে আমার। পাগল না কি—"

জীবু বলল—সে সব কিছু শুনব না, পায়ের ধুলো আপনাকে দিতেই হবে।

সাধু বলতে লাগলেন—না, না, ভাল ক'রে ভেবে দেখুন আপনারা ব্যাপারটা। আপনারা চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক—

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক আলুলায়িত-কুন্তলা বৃদ্ধা। পাকা চুলে জলজল করছে সিঁদুর। এসে তিনি লুটিয়ে পড়লেন সাধুর পায়ের তলায়। বৃদ্ধটির স্ত্রী।

দয়া করুন, দয়া করুন বাবা, দিন একটু পায়ের ধুলো—

পা সরিয়ে নেবার আগেই বৃদ্ধা ছু'হাত বাড়িয়ে পা থেকে তুলে নিলেন ধুলো। সাধু অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। ছু'হাত তুলে নমস্কার করে বললেন—ছি, ছি, এ বড় অন্যায় করলেন আপনারা। অবিচার করলেন আমার উপর—

ঘণ্টা কয়েক পরে যা ঘটল তা আরও নাটকীয়। ঘাম দিয়ে বৃদ্ধের জ্বর ছেড়ে গেল। কমে গেল বুকের ব্যথা। সকাল নাগাদ বৃদ্ধ প্রায় সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। জয়জয়কার পড়ে গেল সাধুর। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল জীবু। ছুটে বেরিয়ে পড়ল সে পাড়ায়। ডাক্তারবাবু বললেন—নিউমোনিয়ার ক্রাইসিস এই রকমই হয়। তবে এত চট ক'রে হবে এটা আশা করিনি। আপনার পায়ের ধুলোর গুণ আছে ঠাকুর মশাই।

সাধু অপ্রতিভ মুখে বললেন—কি যে বলেন আপনি!

ডাক্তারবাবু আর যদিও কিছু বললেন না কিন্তু মনে মনে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনিও একটু। বাড়ির লোকেরা তো শ্রদ্ধায় গদগদ। হাত জোড় করে' দাঁড়িয়ে আছে সবাই। বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন আবার। সাধুর দিকে চেয়ে শ্রদ্ধা-স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বললেন—বাবা একবার ভিতরে আসুন।

আবার কেন!

জল খাবার দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তারবাবুও বললেন—চলুন। খিদে পেয়েছে।

উঠলেন সবাই। সাধু ভিতরে গিয়ে দেখেন বিপুল আয়োজন। ক্ষীর, দই, ছানা, রাবড়ী, সন্দেশ, ফল-মূল এত দেওয়া হয়েছে যে, একজনের পক্ষে খাওয়া অসম্ভব। বললেন সে কথা।

গৃহিণী উত্তর দিলেন—আপনি যা খাবেন খান। বাকিটা প্রসাদ পাব আমরা। প্রসাদ পাবার জন্যে ভীড় ক'রে এসেছে পাড়ার লোক।

সসঙ্কোচে একটু হেসে সাধু বললেন—আমাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন, আমি আপনাদেরই মতো একজন সাধারণ লোক—

সশ্রদ্ধ আনতচক্ষে সবাই এমন ভাব প্রকাশ করলেন যার অর্থ—আপনি তো ও কথা বলবেনই।

সাধু কুন্ঠিত ভাবে যা পারলেন খেলেন একটু। তারপর হাত ধুয়ে বাইরে এলেন। বাইরে এসে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বহুলোক সমবেত হয়েছে সামনের মাঠে। অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, যক্ষ্মা, হাঁপানি, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা—বহুভাবে আর্ত বিপুল জনতা। ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জীবু।

বললে—পায়ের ধুলো দিতে হবে সকলকে।

জীবুর মুখের দিকে চেয়ে সাধু ঘাবড়ে গেলেন। ভক্তি আশা আনন্দের উদ্দীপনার সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা মিলে মুখের এমন একটা ভাব হয়েছে যা অবর্ণনীয়। ব্যাপারটাকে লঘু ক'রে দেবার চেষ্টায় তবু তিনি একটু হেসে বললেন—কি ছেলেমানুষি করছেন আপনারা—

জীবু দৃঢ়স্বরে বললে—পায়ের ধুলো আপনাকে দিতেই হবে।

সত্যি কি আপনারা বিশ্বাস করেন আমার পায়ের ধুলোতেই উনি সেরে গেছেন?

অকম্পিত কণ্ঠে জীবু উত্তর দিলে—করি—

তারপর কম্পিত কণ্ঠে বললে—কোনও ছলনায় আর ভোলাতে পারবেন না আমাকে—

সাধু তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—এত লোককে পায়ের ধুলো দেওয়া সম্ভবই বা হবে কি করে! আমার পায়ে এতো ধুলো আছে কি—

জীবু বললে—সে কথা আমি ভেবেছি, ব্যবস্থাও করেছি। রাস্তা থেকে ঝুড়ি ক'রে ধুলো তুলে আনা হবে, আপনি পা দিয়ে সেটা ছুঁয়ে দেবেন খালি, তারপর আমি সেটা বিতরণ করব।

কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে সাধু বললেন—বেশ তাই ব্যবস্থা করুন তাহলে। আমি ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি ততক্ষণ—

বেশ বেশ—

ভিতরের দিকে একটি ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হল। জীবু ধুলো সংগ্রহ করতে বেরুল। অনেক ধুলো চাই। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরল সে। সঙ্গে গোটা চারেক কুলি। প্রত্যেকের মাথায় এক ঝুড়ি ধুলো।

ডাক্তারবাবু এই সব বখেড়ার মধ্যে পড়ে একটু বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ফিরে যাওয়া, অথচ সাধুকে এখানে রেখে যেতেও মন সরছিল না তাঁর।

জীবু বললে—তোমার কাজ থাকে তুমি যাও না, আমি ওঁকে নিয়ে যাব এখন এরপর। ঠাকুর মশাই কোথা ?

তিনি পায়খানা গেছেন—তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করি—

যে গাড়োয়ানটা তাঁদের এনেছিল সে এতক্ষণ তার গরু দু'টিকে চরাচ্ছিল। পুকুর থেকে জল খাইয়ে সবে ফিরেছে সে। ডাক্তারবাবুর কথা শুনে সে বললে —আরে তিনি তো চ'লে গেছেন অনেকক্ষণ। আমি যখন গরু দুটোকে জল খাওয়াতে যাই তখন দেখলাম তিনি মাঠ দিয়ে চলে যাচ্ছেন হনহন ক'রে। আমি একবার ডাক দিলাম—ও ঠাকুর, চলেছ কোথায় ঠাকুর,—আমার দিকে একবার পিছু ফিরে চেয়ে ছুটতে লাগলেন !

সাধু আর ফিরলেন না।

ও অঞ্চলে আর ফেরেন নি তিনি।

জীবুর কিন্তু আশা আছে। এখনও সে অপেক্ষা করছে।

দুই খেয়া

দুই বন্ধু যখন নদীতীরে এসে দাঁড়াল তখন খেয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। খেয়া চ'লে গেছে অনেকক্ষণ। বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল তারা নদীর দিকে। পার হতেই হবে যেমন করে হোক, কালই যে শেষ দিন। অনেক কষ্টে সুপারিশ যোগাড় ক'রে মেডিকেল কলেজে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছে তারা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন কালই ভরতি হবার শেষ দিন। কাল যদি তারা পৌছতে না পারে তাদের জায়গায় অপর ছেলে নেওয়া হবে। উমেশ নবীন দু'জনেরই বাড়ি পাড়াগাঁয়ে। রেল-লাইন থেকে বেশ দূরে। কয়েক ক্রোশ হেঁটে নদী পার হয়ে তবে ট্রেনে চড়তে হয়। বাড়িতে টাকার যোগাড় করতে এসেছিল তারা। অতগুলো টাকা চট্ ক'রে যোগাড় হয়ে ওঠেনি। দেরি হ'য়ে গেছে। খেয়ার নৌকো চলে গেছে অনেকক্ষণ। নদীর দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। সামান্য একটা নৌকোর অভাবে মেডিকেল কলেজে ঢোকবার আশা বিসর্জন দিতে হবে?

উমেশ। সাঁতার জানিস তুই?

নবীন। না।

উমেশ। আমিও জানি না, মহা মুশকিল হল তো।

উমেশের পরিধানে খাকি হাফপ্যান্ট হাফশার্ট। তার দূর-সম্পর্কের এক দাদার কাছ থেকে ধার ক'রে এনেছে। নবীনের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, সাধারণ বাঙালী পোশাক। উমেশের চেয়েও নবীন বেশি গরীব। সাহেবী পোশাক ধার দেবার মতো দাদাও নেই।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজন। কাল সকালের আগে খেয়ার নৌকো নেই। সে-নৌকোয় গেলে ট্রেন ধরা যাবে না। নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছিল একটা বটগাছ কিছুদূরে। তার দিকে চেয়ে উমেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল হঠাৎ। আশায় আনন্দে চোখের দৃষ্টি ঝলমল ক'রে উঠল।

উমেশ। ওই গাছটার নীচে একটা ডিঙি বাঁধা আছে রে।

নবীন। হ্যাঁ, আছে তো। কার ডিঙি?

উমেশ। চল্ খোঁজ করা যাক।

এগিয়ে গেল দু'জনেই। মাঝি বললে কোন এক দারোগা সাহেবের জন্য পাঠিয়েছেন ওপারের এক জমিদার। উমেশ বুদ্ধিমান ছেলে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

উমেশ। চিনিস তুই সে দারোগা সাহেবকে ?

মাঝি। না হুজুর।

উমেশ। আমিই সেই দারোগা সাহেব। চল্।

তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে বসল উমেশ। নবীন কিন্তু উঠল না, দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে।

উমেশ। আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

নবীন। না, আমি যাব না।

উমেশ। কেন ?

নবীন। আমি তো দারোগা সাহেব নই।

উমেশ। দারোগা সাহেবের সঙ্গী তো বটে। আয়।

নবীন। না, আমি যাব না।

উমেশ। কি মুশকিল, আয় না।

নবীন। না।

উমেশের ভয় হচ্ছিল বেশি দেরি করলে আসল দারোগা না এসে পড়ে। সব ভেস্তে যাবে তা হলে। আরও দু-চার বার অনুরোধ ক'রে উমেশ একাই শেষে চ'লে গেল। নবীনের গোঁয়াতু´মির জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রতে পারে না সে। নৌকো যখন মাঝ নদীতে তখন একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—অচল প্রস্তরমূর্তিবৎ নবীন তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

দুই

পঁচিশ বছর কেটে গেছে।

সেই নদীতীরে এক অন্ধকার রাত্রে আবার এসে দাঁড়াল উমেশ। এখন আর সে সে-উমেশ নেই। এখন সে মেজর ইউ. সি. চ্যাণ্ডা। পরিধানে খাকি মিলিটারি পোশাক। বাড়ি থেকে জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটি নিয়ে এসেছে সে। একমাত্র

ছেলে টাইফয়েডে মুমূর্ষু। সেদিনও পারের খেয়া ছেড়ে চলে গেছে। টর্চ ফেলে ফেলে সেদিনও সে হঠাৎ দেখতে পেলে একটা ছোট নৌকা একধারে বাঁধা রয়েছে। এগিয়ে গেল।

"এই—কার নৌকো—"

একটি জীর্ণ শীর্ণ গোছের লোক ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

"আমার নৌকা—"

"পার ক'রে দিবি ?"

"না"

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলে লোকটি। কিছুদিন আগেই তাদের গ্রামে মিলিটারি 'রেড' হয়ে গেছে। খাকি পোশাক দেখলেই সমস্ত মন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তার। ভয়ে নয়, ঘৃণায়। ভয় তার আর নেই। অতিব্যথা নির্ব্যথা ক'রে দিয়েছে মনকে।

"যাবি না কেন ?"

"আমার অন্য কাজ আছে।"

"ভাড়া দেব। যা ভাড়া চাস দেব।"

"না, আমি যেতে পারব না"

পাঁচ—দশ—বিশ—পঞ্চাশ—একশ' টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলে উমেশ। লোকটা অবিচলিত। কিছুতেই যাবে না সে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল উমেশের।

"আমি মিলিটারির লোক জানিস"

লোকটা নিরুত্তর।

"ইচ্ছে করলে তোকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যেতে পারি জানিস ?"

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে লোকটা উত্তর দিলে—"আমি কিছুতেই যাব না।"

"দেখি তুই কেমন না যাস !"

উমেশ ঠিক ক'রে ফেললে থানায় গিয়ে স্বয়ং দারোগাকে নিয়ে এসে এই ত্যাঁদড় লোকটাকে যেতে বাধ্য করবে সে। থানার দারোগাও মেজর ইউ. সি. চ্যাণ্ডার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে না নিশ্চয়। থানা কিন্তু নদীর ঘাট থেকে প্রায় একক্রোশ দূরে। তা হোক—তবু যাবে সে। অন্য উপায়ও তো নেই। গট গট ক'রে অন্ধকারে এগিয়ে গেল সে থানার দিকে।

● দ্বিতীয় শতক ●

…একটু পরে অন্ধকার নদীতীরে আর একজন এসে দাঁড়াল। শুধু পা, পরনে হাঁটু পর্যন্ত গুটানো খদ্দরের কাপড়, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। নবীন। তাকেও ওপারে যেতে হবে। কিন্তু খেয়া চলে গেছে। ছোট নৌকোর মাঝিটি যেন তারই অপেক্ষা করছিল।

"দাদাঠাকুর এলে নাকি ?"

নবীন এগিয়ে এল!

"কে, আরে বিশু যে হঠাৎ এখানে—"

"আমি এপারে মাছ ধরতে এসেছিলাম দাদাঠাকুর। মধুর কাছে শুনেছিলাম তুমি ওপারে গেছ সালিসির বৈঠকে। আমার সামনেই খেয়ার নৌকোটা গেল বেরিয়ে। ভাবলাম, একটু অপিক্ষে করে যাই, দাদাঠাকুর যদি এসে পড়েন, ফাঁপরে পড়ে যাবেন এই রাত্তিরে—"

"তা বেশ করেছিস। চল্—"

"জান দাদাঠাকুর, এই একটু আগে এক ব্যাটা মিলিটারি এসে তম্বি শুরু করেছিল—"

গল্পটা বলতে বলতে নৌকো ছেড়ে দিলে সে।

নবীন ডাক্তার হতে পারেনি।

হয়েছিল দেশ-সেবক।

ঘটনা

আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি।

তখনও মড়া কাটা চলছে। হাত, পা, পেট, বুক হয়ে গেছে, গলা এবং মাথা বাকি। আমাদের নিয়ম ছিল কোন অংশ ব্যবচ্ছেদ করার পূর্বে সেই অংশটির অস্থিগুলির সম্বন্ধে সম্যকরূপে জ্ঞানার্জন করতে হ'ত। না করতে পারলে সেই অংশটি ব্যবচ্ছেদ করবার অনুমতি কর্তৃপক্ষরা দিতেন না। অস্থি-বিষয়ক একটা পরীক্ষা দিতে হ'ত—তাতে পাস করলে তবে পার্ট পাওয়া যেত। গ্রের অ্যানাটমি খুলে গলার কয়েকটা হাড় এবং মড়ার মাথা নিয়ে সন্ধ্যা থেকেই তাই পড়তে বসেছিলাম সেদিন। ডাক্তার বসাক বড় কড়া পরীক্ষক, তাঁর কাছে ফাঁকি চলবে না। মড়ার মাথাটাও দিন দুই পরে মুন্না ডোমকে ফেরত দিতে হবে। কলেজের সম্পত্তি। বক্‌শিশের লোভে লুকিয়ে আমাকে দিয়েছিল। মাথায় এমন অনেক পাতলা কাগজের মত হাড় আছে যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ঠিক পাঠোপযোগী করা দুঃসাধ্য, সে সব হাড় তাই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য। আমরা অনেকেই তা কিনতে পারতাম না। কলেজে প্রফেসারের পড়াবার জন্য অবশ্য একাধিক 'সেট' থাকত মুন্না ডোমের জিম্মায়। আমরা তাকে বক্‌শিশ দিয়ে সেই সব হাড় একদিন কিম্বা দু'দিনের কড়ারে মেসে নিয়ে এসে পড়তাম। মড়ার মাথাটা মুন্নাই দিয়েছিল। বেশি বড় নয়, ছোট্ট মাথাটি।

সে দিন পড়া আরম্ভ করবার আগেই কেন জানি না—রেণুকে মনে পড়ল। প্রায় বছর ছয়েক পূর্বে রেণু মেয়েটি আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। রেণুর বাবা যোগেনবাবু কি একটা আপিসে চাকরি করতেন। কোথা থেকে যেন বদলি হয়ে এসে আমাদের প্রতিবেশী হয়েছিলেন অল্প কিছুদিনের জন্য। তখন আমরা পাটনায় থাকি—আমি সবে তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছি। বয়স মাত্র পনের বছর। কিন্তু সেই বয়সেই বেশ মনে আছে রেণুর প্রেমে পড়েছিলাম। রেণুর বয়সও তখন দশ-এগারোর বেশি নয়, কিন্তু আমার মনে হয়, রেণুও আমার প্রেমে পড়েছিল। কারণও ছিল একটু। যোগেনবাবু আমাদের

স্বজাতি এবং পালটি ঘর ছিলেন, আমার সঙ্গে না কি রেণুর বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি বাবার কাছে। তাই আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রেমের উদ্ভব হয়েছিল। একটু রোগা কালো ছিপছিপে ধরনের চেহারা ছিল রেণুর। ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ দু'টি। জানালার গরাদ ধ'রে সে প্রায়ই আমাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকত, আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলেই পালিয়ে যেত। বিয়ের প্রস্তাব অবশ্য বেশি দূর এগোয় নি—বাবা আমল দেন নি বিশেষ। উপার্জনক্ষম না হলে ছেলের বিয়ে দেবেন না এই তাঁর মত ছিল। কিছুদিন পরে যোগেনবাবু বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। রেণুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আর কোন সম্পর্ক রইল না। রেণুকে কিন্তু অনেকদিন ভুলতে পারিনি আমি। তার রোগা মুখের বড় চোখ দুটো অনেকদিন পর্যন্ত আমার মনে ছিল, পরে অবশ্য ভুলে গেছি। সেদিন পড়তে বসার আগে এবং অনেকদিন পরে অকারণে রেণুকে মনে পড়ল আবার। কেন জানি না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। বেশিক্ষণ কিন্তু নয়। মিনিট দুই পরেই তোয়ালে কাঁধে শিবু-দা প্রবেশ করলেন। ঘর্মাক্ত কলেবর। ডন বৈঠক সেরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। বললেন, "আমি স্লাইডটা পরীক্ষা ক'রে দেখলাম হে। প্রচুর গনোকক্কাস। ও ব্যাটাকে আর রাখা চলবে না—" বলেই বেরিয়ে গেলেন। সেদিন সকালে আমাদের মেসের ঠাকুরটা শিবু-দার হাতে মার খেয়েছিল খুব। আমরা সকালে স্নান করতে গেছি নীচের কলতলায়—শিবু-দা দেখি ঠাকুরটাকে ঠেঙাচ্ছেন।

কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন গনোরিয়া হয়েছে ব্যাটার।

মাধববাবু—(শিবু-দার সহপাঠী—তিনিও স্নান করছিলেন) বললেন—"গনোরিয়া হয়েছে আগে সেটা প্রমাণ কর। আগে থাকতেই মারছ কেন ব্রাহ্মণকে—"

"গল গল করে পুঁজ বেরুচ্ছে—আর অন্য কি হবে। আচ্ছা একটা স্লাইড নিচ্ছি আমি—"

শিবু-দা একটা স্লাইডে পুঁজ মাখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরীক্ষার ফলটা আমাকেও জানিয়ে গেলেন। ঠাকুরটা যে দুশ্চরিত্র তাতে আর সন্দেহ রইল না।

বাজে চিন্তা মন থেকে সরিয়ে পড়া শুরু করলাম। অনেক পড়তে হবে। রাত্রি প্রায় বারোটা পর্যন্ত পড়লাম। তবু সবটা শেষ হল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। বাধ্য হয়ে অ্যানাটমি বন্ধ ক'রে মড়ার মাথাটা শেলফের উপর তুলে রেখে শুয়ে পড়তে হ'ল। মনে ক্ষীণ আশা নিয়ে শুলাম যে ভোরে উঠে বাকিটা প'ড়ে ফেলতে পারব। আশা কিন্তু অতিশয় ক্ষীণ। কারণ আমি কোনদিনই ভোরে উঠতে পারি না। আমার রুম-মেট জিতেন রোজ আমাকে আটটার সময় টেনে তোলে। জিতেনও বাড়ি গেছে, সুতরাং ভোরে ওঠার আশা কম। তবু শুয়ে পড়লাম।

সেদিন কিন্তু খুব আশ্চর্য কাণ্ড হল—রাত দু'টোর সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করে দু'টো বাজল স্পষ্ট শুনতে পেলাম। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি—কিছুতেই ঘুম আসে না। একবার মনে হল ঘুম যখন আসছে না তখন উঠে পড়তে আরম্ভ করি—কিন্তু কুঁড়েমি করে উঠতেও ইচ্ছে করছে না—উঠি উঠি ক'রে চোখ বুজেই প'ড়ে আছি বিছানায়। এমন সময় গাড়িবারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ পেলাম। মনে হল কে যেন আমার ঘরের দিকে আসছে। আমার ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটা কুঁজোয় গ্লাস ঢাকা জল থাকত। শিবু-দা পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে জল খেতে আসতেন। আমরা থাকতাম দোতলায়। রাত্রে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ থাকত খালি—আমাদের সকলের ঘরের দরজা খোলা থাকত। মনে করলাম শিবু-দাই আসছেন বোধ হয় জল খেতে। প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যাশা করছি এইবার কুঁজোর ভক্ ভক্ শব্দটা শুনতে পাব। কোন শব্দ হল না। পায়ের শব্দটা যেন আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে থেমে গেল। কে এসেছে দেখবার জন্যে উঠে বসলাম। দেখি কলেজ স্কোয়ার থেকে এক ঝলক আলো এসে আমার দরজার সামনে পড়েছে আর সেই আলোয় শ্বেতবসনা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলাম না যদিও কিন্তু সে যে মেয়ে তাতে সন্দেহ ছিল না। মনে হল নির্নিমেষে আমারই দিকে চেয়ে আছে যেন।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—কে ?

কথাটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র মেয়েটি ঘরের ভিতর ঢুকে অপর দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমার ঘরের সামনা-সামনি দুটো দরজা ছিল—একটা

গাড়িবারান্দার দিকে আর একটা বাথরুমের দিকে। মনে হল মেয়েটি বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ঠাকুরটা তার প্রণয়িনীকে ডেকে আনেনি তো! তৎক্ষণাৎ আলো জেলে অনুসরণ করলাম।

বাথরুমে কেউ নেই। সিঁড়ির দরজা খিল লাগানো। তেতলার ছাদে উঠে গেলাম সেখানেও কেউ নেই। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজলাম কোথাও কারও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সিঁড়ির দরজা খুলে নীচে নেমে গেলাম। দেখি ঠাকুরটা নিজের ঘরে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওঠালাম তবু তাকে।

"এই, কে এসেছিল এখন?"

"কই কেউ তো না বাবু"

চোখ মিট মিট ক'রে বিস্মিত ঠাকুর চেয়ে রইল আমার দিকে। মুখ দেখে মনে হল সত্যিই সে কিছু জানে না।

আশ্চর্য! কোথা গেল মেয়েটা। স্বচক্ষে স্পষ্ট দেখলাম অথচ—। নানারকম ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল মড়ার মাথাটা। শূন্য অক্ষি-কোটর দুটো যেন নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে। গা ছম ছম করতে লাগল। শিবু-দার ঘরে গিয়ে তাঁর লেপের তলায় ঢুকে পড়লাম। শিবু-দা জিগ্যেস করলেন—কে, যতীন নাকি—

"হ্যাঁ। ওঘরে ভয় কচ্ছে একা—"

শিবু-দা 'হুঁঃ' জাতীয় একটা শব্দ ক'রে স'রে শুলেন একটু।

ভোর হতে না হতেই মড়ার মাথাটা নিয়ে হাজির হলাম মুন্না ডোমের কাছে।

"এটার বদলে আর একটা মাথা দে আমাকে।"

তার নিজস্ব বাংলায় মুন্না বললে—"কেন বাবু, এ তো বেশ ভাল স্কাল আছে। আপনাদের জন্যে আলিদা বানিয়ে রেখেছি—"

"প্রফেসার যেটা থেকে পড়ান সেইটে দে আমাকে"

"উ হোবে না বাবু। নির্মলবাবুকে উঠো দিয়েছিলাম। সাহেব কি করে টের পেয়ে গেলেন। হামার পাঁচ টাকা জোরমানা ক'রে দিলেন। একটা ফিমেল বডি থেকে তাই এ মাথাটা আপনাদের জন্যে আলিদা বানিয়ে রেখেছি—"

"ফিমেল বডি থেকে?"

"হাঁ বাবু। মোটর এক্‌সিডেণ্টের একটা বেওয়ারিশ বডি মর্গে এসেছিল—তাই থেকে বানিয়েছি—"

চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

মুন্না বলতে লাগল—"খুব মেহন্নতসে ভাল করে বানিয়েছি আপনাদের জন্যে। মার্কিং তো খুব ভাল আছে বাবু—"

"না, এটা চাই না, আর একটা দে—"

দাঁত বের ক'রে মুন্না বললে—"আর একঠো টাকা লাগবে বাবু। খুবি জরুরৎ হুজুর—"

সেলাম করলে একবার।

"আচ্ছা দেব। এটা বদলে দে তুই।"

মুন্না ডোম আর একটা মাথা বার করে দিলে।

পরীক্ষায় যথাসময়ে পাস হলাম—পার্ট পেলাম।

মাসখানেক পরে মায়ের চিঠি এল একটা।

নানা কথার পর মা লিখেছেন—"রেণুকে মনে আছে তোর? আহা বেচারীর কি শোচনীয় মৃত্যুই হয়েছে। কোলকাতায় কোথায় নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল তার। যোগেনবাবু তাঁর অফিসের একজন লোকের সঙ্গে তাকে কোলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। কথা ছিল যোগেনবাবুর এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠবে। সেখানেই তাকে বরপক্ষের লোকেরা দেখতে আসবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই পারেনি বেচারী। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি ক'রে যাচ্ছিল, মোটরে মোটরে ধাক্কা লাগে। রেণু এবং সেই লোকটি দুজনেই অজ্ঞান হয়ে যায়। পুলিশে তাদের নাকি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। রেণু সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, অপর লোকটি দশদিন অজ্ঞান হয়েছিলেন, তারপর ক্রমশ ভাল হন। রেণু বেচারীর সৎকার পর্যন্ত হয়নি—ডোমেরা নাকি ফেলেছে। যোগেনবাবু চিঠি লিখেছেন, তুই যদি একটু খোঁজ করিস—"

চিঠিটা পেয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। রেণুর মুখখানা মনের উপর ফুটে উঠল আবার।

বিবেকী শিবনাথ

সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিবনাথ বিপদে পড়িয়া গেল। কলেজের অধ্যাপক ও সহপাঠিগণের প্রশংসা তাহাকে যে স্বর্গে তুলিয়াছিল, পাশ করিবার পর সে স্বর্গ হইতে তাহার পতন হইল। অর্থাৎ কলেজ জীবন শেষ হইয়া গেল। এম. এ. পড়িবার সঙ্গতি ছিল না, সার্থকতাও নাই। বাবার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অবিলম্বে উপার্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপার্জন মানে, চাকরি কিম্বা 'বিজনেস'? 'বিজনেস' নামক ইংরাজী শব্দটি আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলের মানসলোকে যে মায়াজগতের ছবি ফুটাইয়া তোলে, যাহার রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি মাড়োয়ারির ঐশ্বর্যে, ভাটিয়াদের লক্ষ্মী-শ্রীতে, পারসীকদের চাকচিক্যে, কচ্ছিদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে, গুজরাটীদের মহিমাচ্ছটায়, তাহা শিবনাথকেও প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তাহার অধ্যাপকবর্গের সুপারিশের জোরে এবং তাহার শ্বশুরের প্রাণপণ চেষ্টায় সে একটা স্কুল-মাস্টারি যোগাড় করিতে পারিয়াছিল বটে কিন্তু বেতন মাত্র পঞ্চাশ টাকা শুনিয়া সে পিছাইয়া আসিল। ঠিক করিল 'বিজনেস'ই করিবে। কিন্তু কি 'বিজনেস'?

শিবনাথ ছেলেটি ধীমান এবং বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। ধীমান বলিয়াই সে স্বল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায়টি পত্তন করিয়াছিল কিন্তু বিবেকই শেষ পর্যন্ত তাহার সর্বনাশ করিল।

শিবনাথ ভাবিয়া দেখিল যে দুধ জিনিসটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পরিচিত প্রত্যেক পরিবারই প্রত্যহ কিছু-না-কিছু দুধ কিনিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা কিনিয়া থাকেন তাহা দুধ নয়, জল। সে যদি চেনা-শোনা প্রত্যেক পরিবারে খাঁটি দুধ সরবরাহ করিতে পারে তাহা হইলে যুগপৎ দেশের ও নিজের কাজ করা হয়। অনুসন্ধান করিয়া সে দেখিল যে একটু চেষ্টা করিলে সে এই শহরে প্রত্যহ একমণ দুধ অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারে। গ্র্যাজুয়েট শিবনাথ দুধের ব্যবসা করিতেছে শুনিয়া অনেক ভদ্রলোকই তাহাকে 'ব্যাক' করিতে রাজী হইয়া গেলেন। শহরে দুধ টাকায় দেড় সের। শিবনাথ দেহাতে গিয়া সেখানকার গোয়ালাদের সহিত

আলাপ করিয়া দেখিল যে টাকায় আড়াই সের দরে প্রত্যহ একমণ দুধ পাওয়া সম্ভব। তাহারা সামনে দুহিয়া দিতে রাজী আছে। ওই দুধ শহরে দেড় সের দরে বিক্রয় করিলে অঙ্ক কষিয়া শিবনাথ উপলব্ধি করিল যে, ঠিকমত চালাইতে পারিলে খরচ-খরচা বাদ দিয়াও তাহার মাসে প্রায় দুই শত টাকা আয় হইবে। শিবনাথ লাগিয়া পড়িল। অর্থাৎ দৈনিক দুই টাকা বেতন দিয়া সে একটি চাকর রাখিল এবং দুইখানি 'মান্থলি' টিকিট খরিদ করিয়া ফেলিল। যে দেহাত হইতে দুধ আনিতে হইবে তাহা শহর হইতে কুড়ি মাইল দূরে। পনর মাইল ট্রেনে গিয়া এবং পাঁচ মাইল বাইক করিয়া সেস্থানে পৌছিতে হয়। সেখানকার গেয়ালারা দুধ দোহন করে ভোর পাঁচটায়। সেই সময় সেখানে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে হইলে রাত্রি দুইটায় যে ট্রেনটা ছাড়ে সেই ট্রেনে প্রত্যহ যাইতে হইবে। সকাল সাতটায় ফিরিবার ট্রেন আছে। সামনে দুধ দোহাইয়া তাহা লইয়া অনায়াসে ফেরা যাইতে পারে। অঙ্কে কিন্তু এক জায়গায় ভুল হইয়াছিল। এলার্ম ঘড়িতে যে ঘুম ভাঙ্গিবে না তাহা শিবনাথ কল্পনা করে নাই। চাকরটা অবশ্য স্টেশনে গিয়া শুইত এবং প্রত্যহ ট্রেন ধরিত। কিন্তু সদ্য-বিবাহিত শিবনাথের পক্ষে রোজ স্টেশনে গিয়া শোওয়া সম্ভবপর হইল না। সুতরাং ভুটকাই রোজ দুধ আনিতে লাগিল। খরিদ্দার-গণ নিয়মিতভাবে দুধ পাইতে লাগিলেন, কিন্তু শিবনাথের মনে সন্দেহ জাগিল। যাহা সে খাঁটি বলিয়া চালাইতেছে তাহা ঠিক খাঁটি তো! ভুটকাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেই সে পা ছুঁইয়া এমন সব কঠিন শপথ উচ্চারণ করিতে থাকে যে শিবনাথ আর বেশি কিছু বলিতে পারে না। ক্রেতাদের মধ্যে খুব যে একটা আলোড়ন হইল তাহাও নয়। তাঁহারা আজীবন জুয়াচুরিতেই অভ্যস্ত। শিবু যে অদ্ভুতরকম কিছু একটা করিয়া ফেলিবে এ আশা কেহ করেন নাই। তাঁহারা গোয়ালার জোলো দুধ যে মূল্য দিয়া পান করিতেছিলেন শিবুর জোলো দুধও সেই মূল্যে পান করিয়া যাইতে লাগিলেন। আলোড়ন জাগিল কিন্তু শিবুর মনেই। তাহার বিবেক তাহাকে বলিল, খাঁটি দুধের নামে জোলো দুধ বিক্রয় করিয়া অন্যায় করিতেছ। ঠিকমত খাঁটি দুধ যদি সরবরাহ করিতে না পার, এলার্ম ঘড়িতে যদি কিছুতেই তোমার ঘুম না ভাঙ্গে, ব্যবসা উঠাইয়া দাও।

তাহাই করিল। সে প্রত্যেক ক্রেতার নিকট গিয়া অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করতঃ দুগ্ধ-ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ব্যবসাটা চালাইতে লাগিল ভুটকা।

শিবনাথের এই ব্যবহারে ক্রেতাদের মধ্যে কেহ বিস্মিত হইলেন, কেহ বিদ্রূপ করিলেন, কেহ উপদেশ দিলেন। মুগ্ধ হইলেন কেবল একটি লোক। তিনি একজন রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার। তাঁহারই চেষ্টায় এবং সুপারিশে শিবু ইহার কিছুদিন পরে পুলিস লাইনে ঢুকিবার সুযোগ পাইল। সে সানন্দে দারোগা হইবার জন্য ট্রেনিং লইতে চলিয়া গেল। পূর্বেই বলিয়াছি শিবনাথ ছোকরাটি বিবেকী। অপবিত্র পুলিস লাইনে একটা পবিত্র আদর্শ-স্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া সে সত্যই পুলকিত হইয়া উঠিল।

প্রথম থানার চার্জ পাইবার সপ্তাহ খানেক পরে শিবনাথ উপর-ওলার নিকট হইতে একটি জরুরী পত্র পাইল। তাহার এলাকায় কোন্ জমিতে কত ফসল হইয়াছে তাহার একটি নিখুঁত বিবরণী যত শীঘ্র সম্ভব সদরে দাখিল করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, বৃষ্টিপাত কত ইঞ্চি হইয়াছে, বৃষ্টিপাতের প্রভাব বর্তমান ফসলের উপর কিরূপ, জল সেচনের কোথায় কি কি বন্দোবস্ত আছে, এসব খবরও দিতে হইবে। থানায় বৃষ্টি মাপিবার যন্ত্র ছিল না। যন্ত্রটি পাঠাইয়া দিবার জন্য একটি পত্র লিখিয়া শিবনাথ 'টুরে' বাহির হইয়া পড়িল। তাহার এলাকা দৈর্ঘ্যে প্রায় চল্লিশ মাইল, প্রস্থে কুড়ি মাইল। এই ভূখণ্ডের প্রত্যেকটি জমি মাপিতে হইবে এবং কোথায় কোন্ ফসল কিরূপ হইয়াছে তাহার ফর্দ করিতে হইবে। বিবেকী শিবনাথের মনে হইল গভর্ণমেণ্টের স্ট্যাটিস্‌টিকস্ এই সব হইতেই প্রস্তুত হয়, সুতরাং ভুল থাকিলে চলিবে না।

মাস দুই উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া শিবনাথ জরিপ শেষ করিল এবং একটি নির্ভুল বিবরণী প্রস্তুত করিয়া থানায় ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিল তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। দেখিল সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতেছে।

"আপনি কে?"—বিস্মিত শিবনাথ প্রশ্ন করিল।

"আমি এই থানার দারোগা।"

"বলেন কি! এ থানার দারোগা তো আমি।"

"ও আপনিই শিবনাথবাবু? আপনার তো আর চাকরি নেই। আমি আপনার জায়গায় এসেছি।"

"চাকরি নেই! কেন?"

"আপনি এতদিন ছিলেন কোথায়! ওপর থেকে রিমাইনডার আসছে ক্রমাগত, আপনার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দুটো খুন হয়ে গেছে এ এলাকায়, চুরি হয়েছে পাঁচটা, আপনার কোনও পাত্তা নেই। এস. পি. টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ করেও আপনার জবাব পান নি। চাকরি থাকবে কি ক'রে। আপনি ছিলেন কোথা বলুন তো?"

শিবনাথ সমস্ত ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া প্রৌঢ় দারোগাবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আপনি নিজে জমি মেপে বেড়াচ্ছিলেন? উফ্"—হাঁটু চাপড়াইয়া আবার তিনি হাসিতে লাগিলেন।

"এর থেকে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ তৈরি হবে কি না তাই ভাবলাম নিজে দেখে ঠিক ফিগারগুলো দেওয়া উচিত।"

"গবর্ণমেণ্টের এই সব স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের ফিগার কারা দেয় জানেন?"

"কারা?"

"চৌকিদারের বৌয়েরা। আমরা ফরমাশ করি চৌকিদারদের, আমার বিশ্বাস, তারা খবরটা সংগ্রহ করে তাদের বৌয়েদের কাছ থেকে। আমরা সেটা টুকে পাঠিয়ে দিই আগের দু'তিন বছরের ফিগারের সঙ্গে 'কম্‌পেয়ার' ক'রে। আপনি নিজে জমি জরিপ করতে গেছেন?"

দারোগাবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শিবনাথ অপ্রস্তুত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুই তীরে

শতজীর্ণ বাড়িটা। তবু কিন্তু চিনতে পারলাম। উঠোনে ঘাস গজিয়েছে। অধিকাংশ ঘর প'ড়ে গেছে। দক্ষিণ দিকের ঘরেই আলো জ্বলছে দেখলাম। এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। ঘরের কপাট নেই, ঝাঁপ রয়েছে একটা। কেরোসিনের ডিপে জ্বলছে ঝাঁপের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলাম।

"কেউ আছ এখানে ?"

"কে ?"

"আমি।"

ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এল সে।

"বিধুর কেউ আছে এখানে ?"

"আমি তার স্ত্রী।"

আমার বয়স তখন যদিও পঞ্চাশ তবু মনটা দুলে উঠল। বুড়ীর মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। পলিত কেশ, দাঁত নেই, মুখময় বলি-রেখা, কোটরগত চক্ষু। তবু তার দিকে চেয়ে দ্রুততর হ'য়ে উঠল হৃৎস্পন্দন। অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম। এই সেই ? চকিতে মানসপটে একটি ঢলঢলে মুখের আভাস যেন ভেসে উঠল। উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। পল্লীগ্রামের ঝিল্লি-মুখরিত অন্ধকারকে বিক্ষত ক'রে পেচকের কর্কশ কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠল সহসা।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—"বাড়ির পিছনে বিধু যে তালগাছটা লাগিয়েছিল সেটা এখনও আছে কি ?"

আমার আকস্মিক অভ্যাগমে এবং অদ্ভুত আলাপে এমনিই একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল সে। এই প্রশ্নে আরও একটু হ'ল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "আছে। বছর দুই আগে ঝড়ে প'ড়ে গিয়েছিল। বেঁকে চুরে বেঁচে আছে তবু এখনও।"

বারান্দা থেকে নেমে খিড়কি দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেলাম বাড়ির পিছনের পুকুর ধারে। দেখলাম ন্যুব্জদেহ তালগাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো।

ফিরে এসে বললাম, "আচ্ছা চললাম আমি।"

"কে তুমি পরিচয় তো দিলে না। হঠাৎ এলে হঠাৎ চ'লে যাচ্ছ—"

"আমি? আমি বিদেশী একজন। বিধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। এই নাও।"

গোটা কয়েক টাকা তার কম্পিত প্রসারিত হাতের উপর রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। আর দাঁড়ালাম না। সোজা চলে এলাম বিয়ে-বাড়িতে।

আমার বাল্যবন্ধু যতীনের ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী হ'য়ে যখন এসেছিলাম তখন কল্পনাও করিনি যে এই সোনাপুর গ্রামে এসে বিস্মৃতির যবনিকা এমনভাবে স'রে যাবে। স'রে যাওয়া যে সম্ভব তা-ও ভাবিনি কখনও। অসম্ভব কিন্তু ঘটল। স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ি চ'ড়ে কিছুদূর এসেই আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল এ সব যেন আমার চেনা। কিছুদূর গিয়েই সেই বিরাট বটগাছটা আছে, তারপর একটু গিয়েই বাঁ হাতেই আছে একটা পুকুর—পদ্ম-দীঘি—তার পাড়ে আছে বুড়ো শিবের মন্দির। ঠিক মিলে যেতে লাগল। সোনাপুর গ্রামের সমস্ত ছবিটা ফুটে উঠল চোখের সামনে। মাখন তেলির বাড়িটা, কোন দিক দিয়ে সেখানে যেতে হবে—সব।

"তুমি এসেই কোথা ডুব মেরেছিলে বল তো হে", যতীন প্রশ্ন করলে। বিয়ে বাড়ি থেকে হঠাৎ আমার অন্তর্ধানে সবাই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিল।

"গ্রামটা ঘুরে ফিরে দেখছিলাম"—অবিশ্বাস্য সত্য কথাটা বলতে পারলাম না।

"এই রাত্রে? আচ্ছা শখ তো। অন্ধকারে পথ চিনলে কি ক'রে!"

"টর্চ ছিল।"

এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে কন্যাপক্ষীয় একটি যুবক বললেন—"কাল সকালে সব দেখিয়ে আনব আপনাকে। সেকেলে গড় আছে এখানে একটা। আরও দ্রষ্টব্য জিনিস আছে কিছু কিছু। যেমন ধরুন…"

দ্রষ্টব্য জিনিসের তালিকা ব'লে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছিল না। বিধুর স্ত্রীর চেহারা আর কথাগুলোই মনে হচ্ছিল আমার বারবার।

"বংশে তো কেউ বেঁচে নেই। নিজের কাজ করবার সামর্থ্যও গেছে। ভিক্ষে করি, কি আর করব।"

অথচ আমি এখন লক্ষপতি।

সেই গুহাটা ভেসে উঠল মানস-পটে। আর সেই সাধুর চোখ ছুটো।……সে অনেক দিনের কথা। তখন আমি স্কুলে পড়ি। একদিন শুনলাম গঙ্গার ধারের গুহাটায় একজন সাধু এসেছেন। তখন জটাধারী সাধু-মাত্রকেই ভণ্ড ব'লে মনে করা শিক্ষিত-সমাজের রেওয়াজ ছিল। সুতরাং খবরটা শুনে বিশেষ বিচলিত হইনি। তাকে দেখতে যাবার প্রবৃত্তিও হয়নি। অশিক্ষিত জনতা অবশ্য ভীড় ক'রে তাঁকে দেখতে যেত। একদিন শুনলাম সাধুর নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তবু আমি যাইনি। আমি বোর্ডিংয়ে থাকতাম, বোর্ডিংয়ের ছু-চারজন ছেলে গেল, আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছা হ'ল না তবু। আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল একদিন অপ্রত্যাশিত-ভাবে। সেদিন রবিবার। গঙ্গার ধারে লুকিয়ে মাছ ধরতে গেছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম জটাধারী সাধু স্নান করছেন। মনে হ'ল সেই-সাধুই বোধ হয়। স্নান করতে করতে সাধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছু-একবার চাইলেন আমার দিকে। যদিও অস্বস্তি হচ্ছিল তবু আমি বসেই রইলাম।

স্নান শেষ ক'রে আমার দিকে ফিরে সাধু বললেন, "উঠে আয়—"

আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না।

গুহার ভিতর ঢুকে সাধু আমার দিকে ফিরে বললেন, "পূর্বজন্মের সুকৃতির জোরে তেলি থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিস। মাছ ধরছিস কেন? পরের জন্মে জেলে হবার শখ হয়েছে নাকি!"

"তেলি ছিলাম?"

"হ্যাঁ, পূর্বজন্মে তুই সোনাপুর গ্রামে তেলি ছিলি। তোর নাম ছিল বিধু, তোর বাপের নাম ছিল মাখন।"

হেসে ফেলেছিলাম মনে পড়ছে।

দুর্লভ

রাজকন্যা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করবেন।

তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজ্যে বিপুল সাড়া পড়েছে। রাজা-রানী সেনাপতি পাত্র-মিত্র প্রজাবৃন্দ সকলেই এই শুভদিনটিকে সার্থক করবার আগ্রহে আকুল হয়ে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বসবে সভা। এই বিশেষ দিনের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণীয় ক'রে তুলতেই হবে। জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রার আয়োজন হবে সর্বত্র। বিচিত্র-বর্ণদীপ্ত আলোকোৎসবের জল্পনা চলছে সারা দেশ জুড়ে। সজ্জিত হবে গ্রাম, অলঙ্কৃত হবে নগরী। নানাবর্ণের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে দশদিক। লক্ষ লক্ষ আতসবাজী মূর্ত ক'রে তুলবে রাজকন্যার যৌবনশ্রীকে বিস্ময়কর উর্ধ্বোৎক্ষেপে অন্ধকার আকাশে।

তৃপ্তি-ভোজনের ব্যবস্থা হবে অমিত প্রাচুর্যে। দীনদুঃখীরা পাবে মিষ্টান্ন, পরিধেয়, পুরস্কার। সম্মানিত হবেন পূজনীয়গণ। সর্বশ্রেণীর পুরবাসিগণের অপরিমেয় আনন্দ লাভের আয়োজনে উন্মুক্ত থাকবে রাজকোষ।

কবিরা রচনা করবেন কাব্য, চিত্রকর খুলে বসবে রঙের পসরা। মুখরিত হয়ে উঠবে গায়কের কণ্ঠে সপ্তসুর, বাদকের হস্তে বাদ্যযন্ত্র। হর্ম্য-শিল্পী, পথ-শিল্পী, আলোক-শিল্পী, সভা-শিল্পী আমন্ত্রিত হবেন সকলেই। প্রতিভার উৎসমুখ হবে অবারিত। অর্থসচিব আশ্বাস দিয়েছেন উদ্দীপ্ত প্রতিভার মর্যাদা রক্ষিত হবে রাজকীয় বদান্যতার অকুণ্ঠিত ঔদার্যে।

রাজকুমারীর জন্মদিনটি রূপে রসে রঙে সার্থক হয় যেন।

রাজ-অন্তঃপুরের একটি বিশেষ কক্ষে ছোট একটি মন্ত্রণা সভা বসেছে। রাজকন্যাকে সেদিন যে হার উপহার দেওয়া হবে সভার আলোচ্য বিষয় তাই।

রাজকবি ও রাজশিল্পী পরামর্শ ক'রে ঠিক করেছেন হারটি হবে সূর্য-হার। ষোলটি স্বর্ণ-সূর্য গাঁথা থাকবে সাতনরী রত্নহারে। রাজ্যের ষোলজন বিখ্যাত কবি এই উপলক্ষে রচনা করবেন ষোলটি দ্বিপদী। সেগুলি লেখা থাকবে প্রত্যেকটি স্বর্ণ-সূর্যের উপর বিচিত্রবর্ণ রত্নঅক্ষরে। নিযুক্ত হবেন ষোল-জন নিপুণ শিল্পী—প্রত্যেকে প্রস্তুত করবেন এক একটি স্বর্ণ-সূর্য।

মন্ত্রী বললেন—এত কাণ্ড এত অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে উঠবে কি ?

মৃদুহাস্য ক'রে উত্তর দিলেন অর্থ সচিব—দক্ষিণার কার্পণ্য করব না আমরা, সম্ভব হবে নিশ্চয়ই।

রাজকবি ও রাজশিল্পীর এ পরিকল্পনা সমর্থন করলেন সবাই। একটি বিষয়ে কেবল মতভেদ হল দুজনের। হারের মধ্যমণি কি হবে? রাজকবির মতে হীরক নির্মিত একটি শঙ্খ হওয়া উচিত। রাজ-শিল্পীর মতে পদ্মরাগ মণির তৈরি একটি পদ্ম হলেই বেশি মানাবে।

ধৈর্যসহকারে উভয় পক্ষের যুক্তি শ্রবণ ক'রে রাজা বললেন—রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করুন। তার যা পছন্দ তাই হোক।

রাজকন্যা ছিলেন সে সভায়। আনত-নয়নে শুনছিলেন সব। পিতার কথায় আরক্তিম হয়ে উঠল তাঁর কর্ণমূল।

রাজকবি বললেন—আপনার কি ইচ্ছা বলুন রাজকন্যা।

রাজশিল্পী বললেন—হাঁ, বলুন।

ক্ষণকাল নীরব থেকে রাজকন্যা বললেন—আমার ইচ্ছা একটু অন্য রকম—

কি বলুন,—সমস্বরে বলে উঠলেন কবি ও শিল্পী।

রাজকন্যা বললেন—আমার ইচ্ছা রত্ন না দিয়ে আমার বাগানে যে চাঁপা গাছটি আছে তারই একটি ফুল দু'লিয়ে দেওয়া হোক মাঝখানে,—

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কেউ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর রাজা শেষে বললেন—বেশ তাই হোক।

নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত রাজ্য মেতে উঠল উৎসবে।

নগরে গ্রামে জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রা বেরুল আনন্দ কলরবে, ভাট-বৈতালিক-গায়কগণ নিজেদের অন্তর উজাড় ক'রে দিলেন বিবিধ বন্দনার বিচিত্র সুরে। তোরণে তোরণে বাজল নহবত, মণ্ডপে মণ্ডপে বসল সভা। নৃত্যপরা হলেন নর্তকী, অভিনয় করলেন নট, প্রশস্তি পাঠ করলেন পুরোহিত, ছন্দে ভাবে বিগলিত হলেন কবি। আনন্দ-ধ্বনি করে উঠল অভাব-মুক্ত দরিদ্রগণ, আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন পূজনীয়বর্গ। পথে ঘাটে নদীতে প্রান্তরে পর্বতে সমুদ্রে মূর্ত হয়ে উঠল রাজৈশ্বর্যের অনবদ্য মহিমা-লীলা।

স্বর্ণহারের প্রত্যেকটি স্বর্ণ জলজল ক'রে উঠল বিচিত্র শিল্পীদের অক্লান্ত চেষ্টায়।

একটি জিনিস কিন্তু হল না। চাঁপা ফুলটি ফুটল না। কারণ অর্থের লোভে বা প্রয়োজনের তাগিদে ফুল ফোটে না। ফোটে সময় হলে আপন খুশিতে।

গভীর রাত্রি।

পূর্ণিমার আলোয় আকাশ বাতাস স্বপ্নাতুর। থেমে গেছে জনতার কোলাহল, নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর। ধীর মন্থর পদে রাজকুমারী এসে বসলেন চাঁপা গাছটির তলায়। অঙ্গে নেই অলঙ্কারের ঝনৎকার, সাধারণ কাপড়-পরা, সাধারণ মেয়ে যেন। সামান্য উদ্ভিদ্‌টি তুচ্ছ করেছে সমস্ত ঐশ্বর্য-আড়ম্বরকে আজ। রাজকন্যা ভিখারিনীর মতো এসে বসলেন গাছতলায়। ধীরে ধীরে মাথা নত হল, নিমীলিত হল আঁখি-পল্লব। উদ্ভিদের নিগূঢ় সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাটি মেলাবার আকুল আগ্রহ স্তব্ধ করে দিলে তাঁর বাইরের চাঞ্চল্যকে। স্তব্ধ হয়ে নতশিরে বসে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কতক্ষণ তা খেয়াল নেই। টুপ ক'রে উপর থেকে কি যেন পড়ল। চেয়ে দেখেন কোলের উপর পড়ে আছে একটি চাঁপা ফুল।

…কাঠের গুদামের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু দিশাহারা হইয়া পড়িতে হইল।

"মুক্তেশ্বরবাবু বাড়ি আছেন? মুক্তেশ্বরবাবু—"

কয়েকবার এই ধরনের চীৎকার করাতে ফল ফলিল। গুদামের পশ্চাৎভাগ আলোকিত হইল এবং একটু পরেই কেরোসিনের ডিবা হস্তে প্রায়-উলঙ্গ একটি শীর্ণকায় বালক বাহির হইয়া আসিল।

"কাকে খুঁজছেন?"

"মুক্তেশ্বরবাবুকে।"

"তিনি বাড়িতে নেই।"

"কোথা গেছেন?"

"নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।"

"সে কি! কেন?"

"পাওনাদারের তাগাদার চোটে।"

(আপনাদের মনে কৌতুকরস সঞ্চারিত হইল বোধ হয়!)

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?" বালকটি প্রশ্ন করিল।

আমি হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহসা কোনও জবাব দিতে পারিলাম না। সহসা দেখিতে পাইলাম, ছেলেটির পিছনে একটি নারীও আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং সম্ভবত লজ্জা নিবারণার্থেই বুকের সামনে একটা গামছা ধরিয়া আছেন। পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন।

"ওঁর কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো?"

কম্পিত নারী-কণ্ঠে এই উক্তি শুনিয়া আমি বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

"না। আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল, তাই খবর নিতে এসেছি।"

"আসুন।"

না গেলেই বোধ হয় ভাল করিতাম। গিয়া দেখিলাম, একশত টাকার ধাক্কা। একঘর ছেলে-মেয়ে। প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত, কাহারও অঙ্গে কাপড় নাই। দুইজন জ্বরে শয্যাশায়ী। কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। ক্ষীণভাবে একটু অনুতাপ হইল। তখনই যদি পাঁচ টাকা দিয়া দিতাম, এত হাঙ্গামায় পড়িতে হইত না।

* * *

এই পর্যন্ত শুনিয়াও যদি আপনাদের মনে কৌতুক-সঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর একটু শুনুন।

গলি হইতে বাহির হইয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃদ্ধের সহিত দেখা করিলাম এবং বলিলাম—"যা দেখলাম তা তো ভয়ঙ্কর মশাই।"

বৃদ্ধ মাত্র দুইটি কথা বলিলেন।

"সব সাজানো।"

"অ্যাঁ, বলেন কি!"

"আজকাল লোকে চালাক হয়েছে, চাইলেই ভিক্ষে দেয় না। ভিক্ষুকরাও চালাক হয়েছে। আপনার মতো দু'একজন দয়ালু বিবেকী লোক খোঁজ-খবর নিয়ে ভিক্ষে দিতে চান। মুক্তেশ্বর তাই কতকগুলো রেফিউজিকে তার কাঠের গুদামের পিছনটায় আশ্রয় দিয়েছে আর শিখিয়ে রেখেছে যে, কেউ খোঁজ করতে এলে যেন বলে যে, দেনার দায়ে সে বিবাগী হয়ে গেছে।"

"বলেন কি?"

বৃদ্ধ স্বল্পভাষী। আর একটি কথা মাত্র বলিলেন।

"কোকেন"

তাহার পর স্মিতমুখে কপাটটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

* * *

এখনও কি আপনাদের মনে কৌতুক উপজে নাই? যদি না উপজিয়া থাকে আসল ব্যাপারটা শুনুন তাহা হইলে। গল্প যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা গল্পই। আসল ঘটনা এই। লোকটি যখন দেখিল আমি কিছুতেই তাহাকে সাহায্য করিব না, তখন সে পকেট হইতে একটি হোল-লাইফ শেফার্স্ বাহির করিয়া বলিল—"এই কলমটা রেখে তাহলে পাঁচটা টাকা দিন।"

বুঝিলাম চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাহাকে পুলিশে দিলাম না। নিজ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম এবং মনে করিতে চেষ্টা করিলাম সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি। কলমটি সত্যই চমৎকার। ওই কলম দিয়াই আজকাল চোরাবাজারের বিরুদ্ধে চুটাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছি।

গহিন রাতে

সেদিন ট্রেনটি লেটও ছিল। পুরন্দর টর্চ জ্বালিয়া রিষ্ট ওয়াচ দেখিল। বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বেশ একটু কাতর হইয়া পড়িল। কেবল বিরহে নয়, দুই মাইল দীর্ঘ মাঠটির কথাও তাহার মনে পড়িল। এই রাত্রে একা অন্ধকারে ওই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জানে না যে সে যাইবে। শ্বশুরবাড়ির কর্তৃপক্ষকে সে ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই। বিবাহিতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যেও গোপন অভিসার করার মধ্যে একটু মজা আছে বই কি। তা ছাড়া তাহার শ্বশুরবাড়ির লোকগুলি কেমন যেন একটু কাঠখোট্টা বেরসিক গোছের। তাহারা ধনী এবং ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃই আরও ধনী হইয়া উঠিতেছে এই তাহাদের একমাত্র পরিচয়। লেখাপড়ার ধার কেহ ধারে না। শ্বশুরের বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও একটা দৈত্য যেন। বড় ওজনের আড়াই সের খাঁটি মহিষের দুধ প্রত্যহ হজম করেন। দাঁত একটিও পড়ে নাই। জুলফি এবং গুম্ফ সহযোগে মুখের উপর এমন একটা কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন যে স্বয়ং সিংহও তাহা দেখিলে ভড়কাইয়া যাইবে। তাহার পুত্রগুলিও (অর্থাৎ পুরন্দরের শালারা) পিতৃপথ অনুসরণ করিতেছেন। প্রত্যেকেরই বিদ্যা গ্রামের পাঠশালা পর্যন্ত। ডন কুস্তি লাঠি খেলার চর্চাই তাহারা অধিক পরিমাণে করিয়া থাকেন। প্রত্যেকেরই বড় বড় গোঁফ। বেশ বড় গৃহস্থ। হাজার বিঘা জমি আছে। কিন্তু বাহিরে কোনও বড়মানুষী চাল নাই। এরোপ্লেন কিনিবার সামর্থ্য রাখেন। কিন্তু মোটরটি পর্যন্ত কেনেন নাই। খান কয়েক মহিষের গাড়ী আছে। মহিষের গাড়ী ছাড়া অন্য কোনও প্রকার যান ও সব রাস্তায় অচলও।

পুরন্দর ঘড়ি দেখিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। ঘোর অন্ধকার। এখনও দুইটি স্টেশন বাকী। ব্রাঞ্চ লাইনেরও ব্রাঞ্চ লাইন এটি, ধাপধাড়া গোবিন্দপুর ইহার নিকট শিশু, এই ধরনের দুই চারিটি অসংলগ্ন চিন্তা করিবার পর সুভদ্রার কথাই তাহার মনে স্থায়ী হইল আবার। সুভদ্রা নিশ্চয়ই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। হয়তো বাতায়ন পার্শ্বেই। বিবাহের পর সুভদ্রাকে সামান্য বাঙলা লেখা-পড়া সেই শিখাইয়াছিল চিঠিপত্র লিখিবার জন্য। সুভদ্রার বড় বড় চিঠিগুলি কি

মধুর। এবার পুরন্দর এক কাণ্ড করিয়াছে। সহজবোধ্য কবিতায় চিঠি লিখিয়াছে সুভদ্রাকে। তাহার আসিবার খবরটি এমন কি তারিখটি সময়টি পর্যন্ত কবিতায় গাঁথিয়া দিয়াছে।

দিন কাটে হায় প্রিয়ে মিনিট গুনে
যাইব গহিন রাতে আটাশে জুনে।

আর একবার সে হাত ঘড়ি দেখিল। হায় কবে যে সে সুভদ্রাকে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিতে পারিবে! বি-এ পরীক্ষাটা পাস করিয়া ফেলিতে পারিলে তাহার বাবা তাহাকে একটা চাকরি নিশ্চয় যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন, কারণ তিনি নিজে একজন বড় চাকুরিয়া। কিন্তু বি-এ'টা সে কিছুতেই পাস করিতে পারিতেছে না। আর বাবারও ধনুর্ভঙ্গ পণ উপার্জনক্ষম না হইলে কিছুতেই সুভদ্রাকে তিনি বাড়ি আনিবেন না। হস্টেল হইতে পলাইয়া কাঁহাতক আর এ এভাবে শ্বশুরবাড়ি আসা যায়।

স্টেশনে নামিয়া পুরন্দর দেখিল একটা বাজিয়াছে। দুই মাইল দুস্তর মাঠটি এইবার পার হইতে হইবে। স্টেশনের বাহিরে কোনপ্রকার যান-বাহনও নাই। সুতরাং হাঁটিয়া পার হইতে হইবে। টর্চটা অবশ্য আছে আর আছে ধ্রুবতারা সুভদ্রা। স্টেশন হইতে নামিয়া বেশ হন হন করিয়াই চলিতে শুরু করিয়া দিল সে।

...একাগ্র চিত্তে সুভদ্রার মুখ ধ্যান করিতেছিল বলিয়াই হউক কিম্বা তমিস্রার সূচীভেদ্যতার জন্যই হউক তাহার যে প্রাণ-সংশয় হইয়া আসিয়াছে ইহার আভাস ঘুণাক্ষরে সে পূর্বে জানিতে পারিল না। পারিলে ছুটিত কিংবা চীৎকার করিতে পারিত। লাঠিটা হাতে লাগিয়া যখন টর্চটা পড়িয়া গেল তখন আর কিছু করিবার সময় ছিল না। কারণ পরমুহূর্তেই একজন তাহাকে পিছন হইতে ধরিয়া মুখটা বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর নিমেষের মধ্যেই চার পাঁচজনে মিলিয়া যে কাণ্ডটা করিল তাহা অর্থনীতির দিক দিয়া শোচনীয় তো বটেই, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও ভয়ানক। তাহার হাত ঘড়ি, সোনার আংটি, সোনার বোতাম, সিল্কের পাঞ্জাবি, এমন কি ধুতিটা পর্যন্ত তাহারা খুলিয়া লইল। লোকগুলি খুবই তৎপর। নিমেষের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

স্বপ্ন নয় তো? কিংকর্তব্যবিমূঢ় উলঙ্গ পুরন্দর এই ধারণাটাকে আঁকড়াইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইল। তাহার পর সহসা তাহার মনে

হইল সময় নষ্ট হইতেছে। মুখে যে কাপড় বাঁধা ছিল তাহা খুলিয়া ফেলিল। বিস্তৃত করিয়া সেটাকে একটা গামছা বলিয়া মনে হইল। সেইখানা কোমরে জড়াইয়া সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। সুভদ্রার কাছে আবার লজ্জা কি!

সুভদ্রা বাতায়পার্শ্বেই ছিল সম্ভবত। পুরন্দরের ফিস ফিস ডাকেই সাড়া দিল। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া সুভদ্রার চক্ষু কপালে উঠিল।

"এ কি!"

"ডাকাতদের হাতে পড়েছিলাম। চট্ করে একখানা কাপড় নিয়ে এস দেখি। ছি, ছি। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নিশ্চয়। দাদারা কোথায়, সব ভাল তো।"

"দাদারা বাড়ি ছিলেন না, তাঁরাও একটু আগে ফিরেছেন।"

"কাপড় আন আগে একখানা। উঃ কি কাণ্ড!"

পুরন্দর কথায়-বার্তায় স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিতেছিল। সুভদ্রা বাহির হইয়া গেল এবং বারান্দায় দড়িতে যে কাপড়টা ঝুলিতেছিল সেইটাই পুরন্দরকে আনিয়া দিল।

কাপড়টা পরিতে গিয়া পুরন্দর বিস্মিত হইল।

"এ কি, এ কাপড় এখানে কোথা থেকে এল! এই কাপড় পরেই যে আমি এসেছিলাম। এখানে আসব বলেই শখ ক'রে জরিপেড়ে শান্তিপুরীখানা কিনেছি একবার মাত্র ধোপার বাড়ি দিয়েছি, দেখি, আরে, আমাদের ধোপার ছাপ রয়েছে"—

সুভদ্রার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল।

"পর। পরে খেয়ে নাও। ওই তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে—"

"আরে কাপড়টা এখানে কি ক'রে এল তাই বল আগে।"

সুভদ্রার মুখভাব পরিবর্তিত হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল, "গোল করো না। এরা সবাই ডাকাতি করছে আজকাল। বাবা দাদা সবাই। আগে গুজব শুনতাম, এখন দেখচি সত্যি। তুমি খেয়ে থানায় চলে যাও।"

"সে কি!"

"এরা ভয়ানক লোক, যদি জানতে পারে, ওদের ভিতরের খবর তুমি জেনে ফেলেছ তাহলে খুন করে ফেলবে তোমাকে। এদের অসাধ্য কিছু নেই। পরশু

যে খুনটা হয়ে গেছে তা এরাই করেছে বোধ হয়। তুমি চট্ করে খেয়ে থানায় চলে যাও। থানার রাস্তাটা চেন তো ?"

"চিনি।"

"আর দেরি কোরো না তাহলে।"

থানায় উপস্থিত হইয়া প্রথমেই যাহা পুরন্দরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দারোগাবাবুর হাতে যে রিস্টওয়াচটি রহিয়াছে সেটি তাহারই। ব্যাণ্ডের উপর শখ করিয়া সে যে 'পি' অক্ষরটি লিখিয়াছিল সেটিও তাহার নজরে পড়িল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিয়া বলে—'ওরে হারামজাদা চোর', কিন্তু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল 'ধর্মাবতার'! সে হাত জোড় করিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।*

---

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

তার কথা

তার কথা মনে হ'লে এখনও দুঃখ হয় আমার। মনে হয় যদিও আমরা নিজেদের সভ্য বলে আস্ফালন করি (ওই আস্ফালনটার মধ্যে অসভ্যতা নিহিত নেই কি ?) তবু আমরা এখনও ঠিক—মানে, এখনও আমরা গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে ফুলদানি সাজাই এবং পরের দিন যখন সেটা ফেলে দিই তখন একটুও দুঃখিত হই না।

…তার কথা মনে হলে—'তার কথা' বলছি, কারণ ওই শবদেহটা সে নয়—সে চলে গেছে। এসেছিল চলে গেছে। ফুলের দল যে দেশ থেকে আসে এবং এসেই চলে যায় সেই দেশেরই লোক সে। পথ ভুল ক'রে এসেছিল, এসেই চলে গেছে। ওই শবদেহটা 'সে' নয়, ওটা তার বাসা ছিল। আমি, অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার একজন, আমি বলছি যে ওটা বাসা মাত্র। ওটা ছোট জানলা একটা, যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে ক্ষণকালের জন্য।

…আমার ডাক্তারি জীবনে এ কথাটা আরও বহুবার মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। আজ মনে হচ্ছে।…ডাক্তার হিসেবেই প্রথম পরিচয় আমার সঙ্গে। তখন আমি প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। (সরকারী ডাক্তারদের একাধারে সবরকমই হতে হয়, কখনও প্যাথোলজিস্ট, কখনও ধাত্রী-বিদ্যা-পারঙ্গম, কখনও সার্জন, কখনও চক্ষু-বিদ্যাবিশারদ, কখনও কেরানী, কখনও অ্যানিসথেটিস্ট্, কখনও সিভিল সার্জন !) প্যাথোলজিস্ট হিসাবেই প্রথম পরিচয় তার সঙ্গে। সে আমার কাছে রক্ত পরীক্ষা করাবার জন্যে এসেছিল। যে চিকিৎসকটি তার চিকিৎসা করছিলেন তিনি জানতে চেয়েছিলেন ওর রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে কি না। আমরা, মানে ডাক্তারেরা যখন হালে পানি পাই না, তখন সিফিলিস সন্দেহ করি। রোগী বা রোগিণীর অস্বীকৃতিকে অবিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি আতুর মাংসপিণ্ডটার চিরন্তন দুর্বলতার উপর। মানুষের যে মহত্ত্ব, সংযম বা শ্লীলতা থাকতে পারে এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে মানা। আমরা সেটা যাচিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই—তাও হই না অনেক সময়, কারণ আমাদের কষ্টিপাথরটাও নিখুঁত নয়।

তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কারণ এত রূপ সচরাচর দেখা যায় না। খুব যে ফরসা ছিল তা নয়। কিন্তু তার আঁখিপল্লবে, গ্রীবাভঙ্গীতে, তনুদেহের লাবণ্যলীলায় এমন একটা সলজ্জ মাধুরী ছিল যা দুর্লভ। বর্ণ, ছন্দ এবং লালিত্যের এমন সমন্বয় চোখে পড়ে নি আমার কখনও। ক্ষুব্ধ হলাম সে বাইজি শুনে। স্বচ্ছ জলটা ঘোলা হয়ে গেল যেন সহসা। রক্ত নিলাম। পরীক্ষা করে যা পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে আগে থাকতেই নিঃসংশয় হয়েছিলাম। পরীক্ষা ক'রে কিন্তু সংশয় কমল না। বাড়ল। রক্তে সিফিলিসের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না! বিস্মিত হলাম একটু। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল—আমাদের পরীক্ষাগুলোও তো খুব নির্ভরযোগ্য নয়। সিফিলিস নিশ্চয়ই। হয়তো—। খানিকটা 'সিরাম' বেশী ছিল, আবার পরীক্ষা করলাম। আবার নেগেটিভ হল। সব চেয়ে বিস্মিত হলাম সে যখন রিপোর্ট নিতে এল। রক্তে সিফিলিসের বিষ পাওয়া যায় নি এ কথা শুনে সাধারণতঃ লোকে আনন্দিত হয়, সে কিন্তু দুঃখিত হল। সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। রিপোর্ট নিয়ে চলে গেল নিঃশব্দে। যিনি তার চিকিৎসা করছিলেন তিনি নিশ্চয়ই রিপোর্টটা বিশ্বাস করেন নি। আমিও করি নি। তার কোমর ব্যথার কারণ যে সিফিলিস অথবা গনোরিয়া—অথবা দুইই—এ সম্বন্ধে আমারও কোনও সন্দেহ হল না। 'কুসুমে-কীট' জাতীয় কয়েকটা সস্তা উপমা মনে এল। তারপর ভুলে গেলাম সব।

...ছ'মাস পরে আবার সে এল আমার কাছে। রূপ তার তখনও অম্লান। বাইরের ঐশ্বর্য কিন্তু কিছু কমেছে মনে হল। ওড়নাখানা যেন তত সুন্দর নয়, শাড়ীটা আধ-ময়লা। গায়ে গয়নার অভাবও লক্ষ্য করলাম। তার কোমরের ব্যথা তখনও সারে নি। বহু ডাক্তারের কাছে ঘুরেছে সে। দিল্লী, বম্বে, কোলকাতা, পাটনা ঘুরে আবার এসেছে সে এখানে। এখানে এক বিলেত-ফেরত ডাক্তারের খুব নাম-ডাক শুনে তাঁর কাছে গিয়েছিল। তিনি আবার রক্ত পরীক্ষা করতে বলছেন।

করুণ কণ্ঠে বললে—"একটু ভাল ক'রে দেখুন· ডাক্তারবাবু, রক্তে যদি কিছু থাকে···।"

এবারও রক্তে কিছু পাওয়া গেল না। সিফিলিসের বিষ তার শরীরে নেই।

"নেই ?"

"না"

"কিছু পাওয়া গেল না ?"

"না"

চোখ দুটি ছল ছল করতে লাগল তার।

আমি না জিগ্যেস ক'রে আর পারলাম না—"এর জন্যে দুঃখ কেন তোমার এত ? ও বিষ শরীরে নেই এটা ত ভালই"

"সব ডাক্তারবাবুই বলেছেন যে কোমরের ওই বেদনাটার কারণ যদি সিফিলিস হয় তাহলে সারাবার আশা আছে। সিফিলিস না হলে ও আর সারবে না। আমি সেইজন্যে প্রায় সর্বস্বান্ত হ'য়ে বহু জায়গায় রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি—কিন্তু সকলেই বলছে নেগেটিভ। একজন ডাক্তারবাবু আমাকে কয়েকটা ইন্‌জেকসন দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু কিছু হল না। কি যে করব—"

"কোমরে ব্যথাটা কি খুব বেশী ?

"এমন খুব বেশী নয়, কিন্তু ও নিয়ে নাচা চলবে না। নাচাই যে আমার পেশা ডাক্তারবাবু। এ পেশা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাকে—"

লজ্জায় মুখ নীচু করলে সে। চোখ থেকে জল ঝ'রে পড়তে লাগল।

প্যাথোলজিস্ট হিসাবে তার উপরোক্ত ইতিহাসটুকু জানতাম। পুলিস সার্জন হিসাবে কিছুক্ষণ আগে তার শবদেহ থেকে তিনটে বুলেট বার করলাম। শুনলাম দুজন যুযুধান প্রণয়ীর মাঝখানে প'ড়ে তাদের কলহ থামাতে গিয়ে সে প্রাণ দিয়েছে।

স্বপ্ন-কাহিনী

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন।

আণবিক যুগের এক অদ্ভুত যানে চড়িয়া যেন আকাশ-যাত্রা করিয়াছি। কোন-রূপ অসুবিধা হইতেছে না! মনে হইতেছে যেন নিজের বৈঠকখানায় সোফায় বসিয়া আছি। বিজ্ঞানের সহায়তায় বাংলাদেশের আবহাওয়াকেই যেন আমার চতুর্দিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। পাশে বাতায়নটি খোলা আছে। নানাবিধ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে নানা আকৃতির নানা আকৃতির নানা বর্ণের মেঘ ভাসিতেছে। ক্রমশ মেঘলোকও ছাড়াইয়া গেলাম। তাহার পর একটু অন্ধকার, একটু পরে সহসা আবার সর্বাঙ্গ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। চন্দ্রলোকের কাছাকাছি আসিয়াছি। যে চন্দ্রকে দূর হইতে ছোট একটা থালার ন্যায় দেখিতাম সহসা তাহার বিরাট মূর্তি দেখিতে পাইলাম। সমস্ত দৃষ্টিমণ্ডল আবৃত করিয়া তুষারাবৃত প্রকাণ্ড একটা গোলক আবর্তিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রলোকও পার হইয়া গেলাম। তাহার পর আবার অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে বাতায়ন দিয়া দেখিলাম অতি দ্রুতবেগে আমরা আর এক জ্যোতির্ময় লোকের সমীপবর্তী হইতেছি।

চালক বলিলেন, "নীচের দিকে দেখুন।" দেখিলাম সবুজাভ গোলকের ন্যায় কি যেন একটা আকাশপটে শোভা পাইতেছে। এমন শ্যামোজ্জ্বল বর্ণ ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই।

"কি ওটা?"—প্রশ্ন করিলাম।

চালক বলিলেন, "আমাদের পৃথিবী। আরও খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকুন, আর একটা জিনিস দেখিতে পাইবেন।"

চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম জ্যোতির্ময়লোক হইতে মাঝে মাঝে এক একটা কিরণ-রেখা আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে। স্পর্শ করিবামাত্র

সেই শ্যামগ্রহের অঙ্গে যেন শিহরণ জাগিতেছে, তাহার শ্যাম দ্যুতি প্রতি স্পর্শে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম,—"ব্যাপার কি, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

চালক বলিলেন, "আমরা ওই যে জ্যোতির্ময়লোকের নিকটবর্তী হইয়াছি তাহার নাম সম্ভবলোক। যে কিরণ-রেখা আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে তাহার নাম জন্মধারা, ওই আলোকধারা বাহিয়া অসংখ্য জড় ও জীবের সম্ভাবনা পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। কালক্রমে তাহারা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে মূর্ত হইবে।"

"আমরা কি সম্ভবলোকেই যাইতেছি?"

"না, আমরা চলিয়াছি মহাকালের উদ্দেশে।"

শুনিয়া একটু ভীত হইলাম।

"মহাকাল তো ধ্বংসের দেবতা। আমরা কি ধ্বংসের অভিমুখে চলিয়াছি?"

"ধ্বংসই তো নবজীবনের ভূমিকা। ভয় পাইতেছেন কেন?"

"সম্ভবলোকটা একটু দেখিয়া গেলে হয় না!"

সানুনয়ে অনুরোধ করিলাম।

"বেশ, আপনার কৌতূহল থাকে, চলুন। আমার কৌতূহল নাই। আমি তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিলেই বাঁচি!"

চালক সুইচ টিপিলেন। আমাদের যান সম্ভবলোক অভিমুখে দ্রুততর বেগে ছুটিতে লাগিল।

"ওই দেখুন।"

দূর হইতে যাহাকে সূক্ষ্ম কিরণ-রেখা মনে হইতেছিল তাহারই বিস্তৃততর রূপ দেখিতে পাইলাম। একটা আলোকের প্রপাত নিঃশব্দে অবতরণ করিতেছে এবং সেই আলোক-নির্ঝরে ক্ষুদ্রায়িত রূপে নিখিল বিশ্বের সব কিছুই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে নামিতেছে। ভবিষ্যৎ-হিমালয়-ভ্রূণকে বল্মীক-স্তূপের আকারে দেখিলাম; বিরাট বিরাট জীবজন্তু, ওষধি বনস্পতি যেন ছোট ছোট পুতুলের মতো, সম্পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র, মানুষের চিহ্ন কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ কোটি কোটি আরও কি যেন সব ভাসিয়া চলিয়াছে, উহারাই হয় তো মানুষ।

—দেখিতে দেখিতে সেই আলোক-প্রপাতকে দূরে রাখিয়া আমরা আরও অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সন্তবলোক।

অবতরণোন্মুখ আর একটি আলোক-প্রপাত বিরাট নিস্তরঙ্গ তরঙ্গিণীবৎ দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহার দুই তীরে শুভ্র কুজ্ঝটিকার প্রাকার। অসংখ্য কাশ ফুল যেন আকাশ পর্যন্ত স্তূপীকৃত রহিয়াছে। মনে হইতেছে পুঞ্জীভূত হইয়া কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। এক অত্যুজ্জ্বল আলোক-পরিমণ্ডলী সমস্ত জ্যোতির্ময়লোককে বেষ্টন করিয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। সেই বিশাল পরিমণ্ডলীর একপ্রান্তে আমাদের যান ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গের ন্যায় মহাশূন্যে স্থির হইয়া আছে। আমার দৃষ্টিও স্বপ্নাতুর। রূপকথালোকের রূপসাগরে সমস্ত মন যেন ডুবিয়া গিয়াছে। অবতরণোন্মুখ আলোক-প্রপাতের আরও নিকটবর্তী হওয়াতে অতি ক্ষুদ্র মানব-শিশুদেরও এবার দেখিতে পাইতেছি। অসংখ্য পশু-পক্ষী, হস্তী-ব্যাঘ্র, অরণ্য-পর্বত জনপদ-মহাদেশ আরও স্পষ্টভাবে নয়নগোচর হইতেছে। সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া মানবশিশুদের আনন্দ কলরব মর্মরধ্বনির মতো শুনিতে পাইতেছি। আলোক-প্রপাত তখনও গতিহীন, তখনও তাহার অবতরণ আরম্ভ হয় নাই। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছি কখন কি ঘটে।

সহসা মহাশূন্য যেন কথা কহিয়া উঠিল। গম্ভীর মধুর কণ্ঠে কে যেন কহিল —"সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তোমার এইবার সময় হইয়াছে, তোমাকে এইবার মর্ত্যলোকে অবতরণ করিতে হইবে। তোমার জীবনব্যাপী সাধনায় পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার অকৃত্রিম দেশপ্রেমে প্রীত হইয়া তিনি তোমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। তোমার সাধ ছিল—যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেই হয়, বাংলা দেশেই আবার যেন ফিরিয়া আসি। আদিজনক চতুরানন তোমার সে সাধ পূর্ণ করিবেন। তুমি যে রূপে যে গৃহে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাও, বল, সেইরূপে সেই গৃহেই তোমাকে প্রেরণ করা হইবে। তোমার কর্মফলে প্রীত হইয়া ভগবান ব্রহ্মা এ স্বাধীনতাটুকুও তোমাকে দিয়েছেন। তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।"

শুভ্র কুজ্ঝটিকা-জাল ভেদ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের, আমাদের সেই অতি পরিচিত সুরেন্দ্রনাথের, সৌম্য জ্যোতির্ময় মূর্তি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমি আর বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাহি না।" আকাশবাণী পুনরায় ধ্বনিত হইল—"তুমি না চাহিলেও তোমাকে বঙ্গদেশেই যাইতে হইবে। পিতামহের বিধান অমোঘ। তোমাকে কেবল এই স্বাধীনতাটুকু দেওয়া হইয়াছে, তুমি যে রূপে যেখানে যাইতে চাইবে সেই রূপেই তোমাকে সেখানে পাঠানো হইবে। অভিমত ব্যক্ত করিতে বিলম্ব করিও না, জ্যোতির্ময়ী জন্মধারা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কি রূপে সেখানে যাইতে চাও, বল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্বরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—"পাথর।"

চালক স্বইচ টিপিলেন।

আমাদের যান আবার দ্রুতবেগে মহাকালের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

একজন উৎসাহী যুবক টেবিলের উপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বললেন "নিশ্চয়ই, বিজ্ঞানেরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত।"

কর্নেল মুখার্জি এতক্ষণ কিছু বলেন নি। তিনি ঘরের কোণে একটি চেয়ারে বসে সিগার টানতে টানতে পৌত্র ও দৌহিত্রদের তর্কটা উপভোগ করছিলেন। এইবার তিনি কথা বললেন। সিগারে মৃদু একটি টান দিয়ে বললেন, "সব সময়ে হয় না। আমি অন্তত একটা ঘটনা জানি হয় নি, বিজ্ঞানকে হার মানতে হয়েছিল।"

"কি রকম?" তাঁর বি-এসসি পাস নাতিটি প্রশ্ন করলে।

"তাহলে গল্পটা শোন, গল্প নয়, সত্যি কথা।"

সিগারের ছাইটি সন্তর্পণে ঝেড়ে শুরু করলেন কর্নেল মুখার্জি।

"তখন বাংলায় ডাক্তারী পড়া হত, বুঝলে, অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন সবে আই. এম. এস পাস ক'রে সার্ভিসে ঢুকেছি। সদরে কাজ করা ছাড়া আমাদের আর একটা কাজ ছিল, মফঃস্বলের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলোর তদারক করা। স্টেশনের কাছে-পিঠে যে সব ডিস্‌পেনসারি থাকতো সেগুলোতে যথারীতি যেতাম আমরা। কিন্তু স্টেশন থেকে যেগুলো অনেক দূর সে সব জায়গায় প্রায়ই যাওয়া ঘটতো না। সেখানে ডাক্তারবাবুরাই রাম-রাজত্ব করতেন।"

সিগারে একটি টান দিয়ে কর্ণেল মুখার্জি সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল স্মিতমুখে। যেন তিনি অতীতের ঘটনাটাকে প্রত্যক্ষ করছেন আবার।

"তারপর?"

পৌত্রের উগ্র প্রশ্নে স্বপ্নলোক থেকে নেমে এলেন আবার।

"বলছি। আমি একবার ঠিক করলাম যে স্টেশনে থেকে যে সব ডিস্‌পেনসারিগুলো অনেক দূরে আছে সেগুলোতে হানা দিতে হবে। অন্তত একবার ক'রে। ডিস্‌পেনসারির নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিরণপুর, না হিরণপুর, যাই হোক, ঠিক করলাম যাব সেখানে। তিন বছরের মধ্যে সেখানে যায় নি কেউ। স্টেশন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। কিছু দূর যেতে হবে নৌকায়, কিছুদূর ঘোড়ায় চ'ড়ে। দুর্গম

মেঠো পথ। যাইহোক ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। ডিস্পেনসারিতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা বারোটা। গ্রীষ্মকাল। ডাক্তারবাবু দেখি ডিস্পেনসারিতে নেই। দেখলাম একটু দূরে একটা বিরাট বটগাছের নীচে খুব ভীড় হয়েছে। শুনলাম ডাক্তারবাবু ওখানেই আছেন। কম্পাউণ্ডারবাবু খবরটা দিলেন। তিনি ডাক্তারখানায় ছিলেন। ভীড়ের দিকে অগ্রসর হলাম আমি। গিয়ে দেখি ডাক্তারবাবু খালি গায়ে বসে আছেন। ভদ্রলোকের পিঠে বুকে প্রচুর চুল, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কাঁচা পাকা এক ঝুড়ি গোঁফ। আমি ভীড় ঠেলে যখন তাঁর কাছে গেলাম তখনও তিনি আমাকে লক্ষ্য করলেন না। তন্ময় হয়ে তিনি প্রেসক্রপশন লিখে যাচ্ছিলেন। আমার কোটপ্যান্ট-পরা চেহারা দেখে একজন রুগী তাঁর কানে কানে কি বললে। বলতেই তিনি চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন আমার দিকে।

"কি চান?"

"ইন্স্পেক্শন। আমি সিভিল সার্জন এ জেলার।"

শুনেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন এবং লম্বা এক সেলাম করলেন আমাকে।

"ইনেস্পেক্শন করতে চান চলুন দেখাই আপনাকে। এই এরা সব আমার পেশেণ্ট।"

"চলুন ডিসপেনসারিতেই যাওয়া যাক।"

এলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

ডিসপেনসারিতে গিয়ে সার্জিকাল যন্ত্রপাতি যে আলমারিটায় থাকে সেইটে খুলতে বললাম। হঠাৎ নজরে পড়ল এককোণে থার্মোমিটার রয়েছে একটি।

বললাম—"ওটা এখানে কেন? ব্যবহার করেন না?"

"আজ্ঞে না"

"কেন"

"দরকার হয় না"

কেমন যেন সন্দেহ হল ভদ্রলোক এর ব্যবহার জানেন না ঠিক। থার্মোমিটার জিনিসটার তখনও ছড়াছড়ি হয় নি এমন।

"ও জিনিসটা কি তা জানেন আশা করি"

"জানি। তাপমান যন্ত্র"

"ও দিয়ে কি করা হয়"

"শরীরের তাপ নিরূপণ"

"সাধারণ মানুষের শরীরের তাপ কত"

"কার"

"এই ধরুন, আপনার"

"আটানব্বই"

"আপনার স্ত্রীর?"

"আশী"

"আপনার ছেলের?"

"ওর আর কত হবে—ষাট।"

বুঝলাম এ বিষয়ে ভদ্রলোক কিছুই জানেন না। শরীরের তাপ সম্বন্ধে আমি যা যা জানতাম বুঝিয়ে বললাম। থার্মোমিটারের ব্যবহার কি তাও বুঝিয়ে দিলাম। চুপ করে ভদ্রলোক সুবোধ বালকের মত আমার প্রত্যেকটি কথা ঘাড় নেড়ে নেড়ে শুনলেন। আর দু'চার কথার পর আমি বললাম—"কই আপনার ভিজিটার্স বুক বার করুন। আমার মন্তব্য লিখে দিয়ে যাই এবার"

একটু কড়া মন্তব্যই লিখলাম।

লিখলাম—"ডাক্তার অত্যন্ত সেকেলে। আপ-টু-ডেট্ চিকিৎসার তেমন কিছু জানেন না। মাইনে দিয়ে এরকম লোক রাখার অর্থ গভর্ণমেন্টের পয়সার অপব্যয় করা।"

ইংরেজীতে লিখছিলাম। লেখা শেষ করতেই ডাক্তারবাবু বললেন—"কি লিখলেন, বলুন, আমি ইংরেজী জানি না।

তর্জমা করে শুনিয়ে দিলাম।

শুনেই ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখও লাল হল। চোখের দৃষ্টি থেকে স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে লাগল যেন।

"আমি ঐ কাঁচের কাঠিটার বিষয়ে তেমন কিছু জানি না দেখেই আপনি ঠিক করলেন যে চিকিৎসার আমি কিছু জানি না? কত হাজার হাজার রোগী আমার হাতে ভাল হয়েছে, কত বড় বড় অপারেশান আমি করেছি তা জানেন? দু'শ' রোগী উপস্থিত আছে তাদের কথা তো আপনি কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না? আমার পরিচয় তো তাদের কাছেই পাবেন। ঐ কাঁচের তাপমান যন্ত্র দিয়েই কি

আপনি আমার বিদ্যাটাও মেপে ফেল্‌লেন? কেটে দিন ওটা, পাতাটা ছিঁড়ে ফেলুন"

"তার মানে? কি ছিঁড়ব!"

"ঐ যা লিখেছেন ছিঁড়ে দিন। তারপর ঐ রোগীদের কাছে গিয়ে আমার কথা জান্থন, ওরা যা বলবে তাই লিখে যান"

"আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনার স্পর্ধা দেখে"

"আমি যা বলছি তা যদি না করেন এখান থেকে যেতে পারবেন না। ওরে কে কোথায় আছিস আয় এদিকে—"

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক ছুটে এসে ঘিরে ফেলল আমায়। গতিক খারাপ দেখে আমি খাতার পাতাটা ছিঁড়েই ফেললাম। ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলাম ডিসপেন্সারি থেকে। আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না ক'রে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে সরে' পড়লাম।

"তারপর"

"তারপর সদরে ফিরে গিয়ে ডিস্‌মিস্ করলাম সে ডাক্তারকে, পাঠালাম আর একজন। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না সে ডাক্তারের। সে পাশেই ডিস্‌পেনসারি ফেঁদে শুরু করল প্র্যাক্‌টিস। দুর্দান্ত প্র্যাক্‌টিস। আমি যে ডাক্তার পাঠিয়েছিলাম তার নামে দরখাস্ত আসতে লাগল ঘন ঘন। শেষকালে তাকে ধরে মার দিল একদিন সবাই। পালিয়ে গেল ছোক্‌রা"

"তারপর?"

"তারপর আর কি, বিজ্ঞানের হার হল, জিত হল মান্থষের।"

হরবিলাসের মৃত্যুরহস্য

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে। এ মৃত্যু সুখের অথবা দুঃখের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন। একদল নীতিবিদ্ বলিবেন, যে পাষণ্ড পর-স্ত্রী হরণ করিয়া কেবল টাকার জোরে সমাজের বুকে এতদিন বসিয়া তাহার দাড়ি উপড়াইতেছিল, তাহার মৃত্যুতে ভূ-ভার লাঘবীকৃত হইয়াছে। আর একদল বলিবেন (ইহারাও নীতিবিদ্) যে, আইনতঃ ললিতা হয়তো পর-স্ত্রী ছিল, কিন্তু ধর্মতঃ হরবিলাসই তাহার স্বামী, কারণ ললিতা যতদিন জীবিত ছিল, হরবিলাস নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়াছে। আইনতঃ যিনি ললিতার স্বামী ছিলেন, তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব। ললিতার পিঠের উপর তাঁহার কত জোড়া জুতা যে ছিঁড়িয়াছে, তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই; রাখিলে তাহা নিঃসন্দেহে ভদ্রলোকমাত্রেরই চিত্তে বিস্ময়, আতঙ্ক ও সহানুভূতির উদ্রেক করিত। বস্তুতঃ ললিতার স্বামী বক্কেশ্বর বক্সী অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রূর ও নীচমনা ব্যক্তি ছিলেন। ইহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এই সৎকর্মের জন্য কেহই তাঁহাকে বাহবা দেন নাই, আজীবন তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কর্মটি যে একটি অসাধারণ-রকম সৎকর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজসংস্কারের জন্য হরবিলাসের মতো সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কি। লোকটা কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোসমেজাজে কত রকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি হইল! অসুখের কোনও লক্ষণই তো তাহার মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই। ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষতঃ হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন: "ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি, তার কিছুদিন পরে বক্কেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন।

কি লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন,—এর প্রতিশোধ আমি নেবই। জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ ক'রে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি। কিন্তু ও কুলটার মুখদর্শন করবার ইচ্ছা নেই। ওকেও আমি শাস্তি দেব, দেখে নেবেন!"

হরবিলাসের ম্লান হাসিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। ভীত ম্লান হাসি। সহসা তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটাও ঠিক স্বাভাবিকভাবে হয় নাই। কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেরা হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। সত্যই কি তাহার কলেরা হইয়াছিল? সেই সন্ন্যাসী যে বঙ্কেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়তো প্রসাদের সহিত বিষ ছিল...

বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাকুল হইয়াছিল, এসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিতও হইল। তাহার মনে হইল ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবার কথা, কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু হরবিলাসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খট্‌কা লাগিয়াছে, তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়িবে না। হরবিলাসের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনা-ভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যু-সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল: তুই যা, আমি আসছি এখনি। বাড়িতে আর কোনও লোক যেন না ঢোকে। বুঝলি?"

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল থানায়।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারদের অভিমত। হরবিলাসের হৃদ্‌যন্ত্র যে দুর্বল ছিল, তাহা আর একজন ডাক্তারও বলিয়াছিল। ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিরও অন্ত ছিল না, সামান্য একটু কিছু হইলেই তাহার বুক ধড়ফড় করিত। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদ্‌যন্ত্র লইয়াই সে বেশ বাঁচিয়াছিল। সহসা এমন কি হইল...। থানার দারোগা হরবিলাসের মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার

করিতে পারিলেন না। সিদ্ধেশ্বরের কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"তুই প্রথমে কি ক'রে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন?"

"বাবু রোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন যখন বেলা দশটা পর্যন্ত উঠলেন না, ডাকাডাকি ক'রে সাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই ফোকরটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম—"

"ও—"

ফোকরটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হরবিলাসের দেশ হইতে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন তখন তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল। ভদ্রলোক ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিনসাতেক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি নাকি লক্ষ্য করেন যে, ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাস ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই, ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তারই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনও মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: "সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এখানে। ইনি পশ্চিমে প্র্যাকটিস করেন, এখানে একজন মাড়োয়ারী রোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই এঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। তুমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে! রাত্রে ঘুমের ঘোরে যে রকম কর, ভয় হয়—"

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন: "আপনার হার্ট খারাপ তাই শ্বাসকষ্ট হয়,—"

হরবিলাস বলিল: "আমি তো তেমন টের পাই না!"

"আর কিছুদিন পরে পাবেন।"

"কি করব তাহলে?"

"মাথার কাছের জানলাটা খুলে শোবেন। সাফ হাওয়া দরকার—"

"ও বাবা, আমি ভীতু মানুষ, তা পারব না মশাই।"

"জানলা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা ফোকর করিয়ে নিন জানলায়। বাইরের অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।"

হরবিলাস চুপ করিয়া ছিল।

আত্মীয়টি বলিলেনঃ আচ্ছা, সে আমি করিয়ে দিয়ে তবে যাব।"

হরবিলাসের মাথার শিয়রের জানলায় গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিস্ত্রী ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে তিনি অন্য কাজ করেন। তাহার পর বেশী দিন তিনি ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসে নাই তো! কিন্তু কিরূপে?

"আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর আর কেউ কি এসেছিল?"

"আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।"

"পাঞ্জাবী জ্যোতিষী? কবে?"

"দিন পনর আগে"

"কি বললে সে?"

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিল। উইলে ছিল যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। 'ললিতা বৃত্তি' নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী-শিক্ষা-প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাঁহার বিষয় প্রভৃতি বিক্রয়ের ভার লইবেন। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকেন, গবর্ণমেণ্টের উপর এই ভার অর্পিত হইবে।

বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহসা কতকগুলি ডায়েরি তাঁহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখিত, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছে।

ডায়েরির পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে একস্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। একস্থানে লেখা ছিল : 'আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসিয়াছিল। সে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। খানিকক্ষণ আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল—"আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না তো ?"

বলিলাম না রাগ করিব কেন, কি জানিতে চান বলুন।

সে বলিল, আপনি কি কখনও পর-স্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন ?

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, ধরুন যদি করিয়াই থাকি···। জ্যোতিষী বলিল, তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সর্পাঘাতে আপনার মৃত্যু হইবে। এমন স্থানে কখনও যাইবেন না, যেখানে সাপ থাকিতে পারে।

এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণীটি তুচ্ছ করিবার মতো নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানেই আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক এসিড আনাইব। শুনিয়াছি, ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।···

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাস যে কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক এসিড আনাইয়া ঘরের চতুর্দিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাহার এ খেয়াল হইল কেন, জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল, কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র। সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল, জানালার ওই ছিদ্রপথে সত্যই কি সাপ ঢুকিয়াছিল ? সর্পাঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়িত না ? সিদ্ধেশ্বর ডায়েরি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সোজা তাঁহার কাছে চলিয়া গেল।

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি, না?"

"তা পারতাম বই কি। হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে?"

"না, এমনি—"

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙ্গিল না।

"হার্টফেল ক'রে মারা গেছেন ভদ্রলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কি?"

"তা বটে।"

একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

মাসখানেক পরে।

হরবিলাসের বসতবাটি বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহদ্দিটি মাপিতেছিল। সেই সময় একটি জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। হরবিলাস যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের পাশেই একটি ঝোপের ভিতর বাক্সটি পড়িয়াছিল। খালি বাক্স, ভিতরে কিছুই নাই। তবে বাক্সের উপর একটা নম্বর এবং একটা দোকানের ঠিকানা লেখা ছিল। রোদে জলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পড়া যাইতেছিল। কি মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি তুলিয়া লইল।

কি ছিল এ বাক্সে? নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাক্সের গায়ে যে ঠিকানাটা লেখা আছে, বাক্সটা সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি লেখা যায় যে, এই বাক্সে যাহা ছিল ঠিক তেমনি একটি জিনিস ভি. পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে কি হয়? হয়তো কিছুই হইবে না। কিংবা হয়তো একটা গেঞ্জি বা কয়েক জোড়া মোজা বা ওই ধরনের কিছু একটা আসিয়াও পড়িতে পারে। দেখাই যাক না কি হয়।...

সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি প্যাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই যে সে এ কার্য

করিল, তাহা নয়, কেমন যেন নিগূঢ়ভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই বাক্সটির সহিত হয়তো হরবিলাসের মৃত্যুর কোনও সংস্রব আছে।

দিন দশেক পরে সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে গিয়া জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করিতেছিল। সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"আপনার নামে একটা ভি. পি. আছে বাবু।"

"ভি. পি. ? ক'টাকার ?"

"দশ টাকা পনের আনা।"

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল সেই দোকান হইতেই ভি. পি. আসিয়াছে। ভি. পি. ছাড়াইয়া লইল। পিওন চলিয়া যাইবার পর সহর্ষে স্বগতোক্তি করিল : "দেখা যাক কি এসেছে।" অবিকল সেইরকম কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্স খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিল। বাক্সের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোণে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠিটা আনিয়া দূর হইতে সাপটাকে সে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না। তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং স্প্রিং-এর একটা কারসাজি, তাহা বুঝিতে সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোক্ষুর !

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যুরহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই আত্মীয়, সেই ডাক্তার, সেই জ্যোতিষী সকলেই বক্কেশ্বর বক্সীর লোক। সহসা একটা শব্দে সিদ্ধেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

ভুতি সাণ্ডেলের ছেলে অপূর্ব সানিয়েল সত্যই অপূর্ব ব্যক্তি। অভিব্যক্তি বলিলে আরও লাগ-সই হয়। শোনা যায় ভুতি সাণ্ডেলের পত্নী এই পুত্ররত্নকে দশ মাস দশদিন গর্ভে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই, সাত মাসেই প্রসব করিয়া ফেলিয়ছিলেন। এমন তেজীয়ান সন্তানকে সাত মাসই যে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের পূর্বসঞ্চিত পুণ্যবশতই, কারণ এমন ছেলে সাধারণতঃ বাঁচে না। অপূর্ব কিন্তু বাঁচিয়া গেল। অপূর্বর বাল্যলীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার যাঁহারা মিল দেখিতে পান (বলা বাহুল্য, তাঁহাদের অধিকাংশই অপূর্বর মাসি পিসি ঠাকুমা-দিদিমার দল) তাঁহারা অপূর্ব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি ধরিতে পারেন নাই। বাড়িতে ননীর অভাব ছিল না, কিন্তু অপূর্ব চুরি করিত সিগারেট। বাজারে নানারকমের বাঁশি চিরকালই আছে, অপূর্ব কিন্তু 'সিটি' মারিত ; গোপীদের বস্ত্রহরণ করিবার চেষ্টা সে করে নাই, স্কুল কলেজের মেয়েদের জুতার ফিতা কিন্তু সুবিধা পাইলেই সে চুরি করিত ; নাগকেও সে দমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা কালীদহের সর্পরূপী দানব নহে, বেলতলার নাগ পণ্ডিত, তাহার প্রাইভেট টিউটার। অভিনবত্বই অপূর্ব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাল্যকাল হইতেই এ পরিচয় সে দিয়া আসিতেছে।

অভিনব উপায়ে পরীক্ষাগুলিও সে পাস করিয়া ফেলিল। আর কিছুই নয়, হাত-সাফাই। একবার প্রশ্নপত্র চুরি করিল, আর একবার পরীক্ষার খাতা বদল করিল। তৃতীয়বারে পরীক্ষককে ঘুষ দিবার সময় সে অভিনব হাত-সাফাইয়ের যে পরিচয় দিল তাহা সত্যই অপূর্ব। সোজা পরীক্ষকের নিকটে গিয়া সে দশখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল—"যোগেন বাবু আপনার পাওনা টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললেন কোনও রসিদ দিতে হবে না।"

"যোগেনবাবু ? কোন্ যোগেনবাবু ?

বিস্মিত পরীক্ষক প্রশ্ন করিলেন।

অপূর্বর দন্তপাঁতি আরও বিকশিত হইল।

"তাতো জানি না স্যর। তিনি আমাকে ডেকে আপনার বাড়িটা দেখিয়ে বললেন এই একশ' টাকা ওঁকে দিয়ে এস তো বাবা। অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম শোধ দিতে পারি নি। নিজে লজ্জায় তাই যেতে পারছি না। তুমি গিয়ে বল যোগেনবাবু দিলেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন উনি।"

বিস্মিত পরীক্ষক আরও বিস্মিত হইলেন। তিনি নিজেই বহুলোকের নিকট ঋণী হইয়া আছেন। পাওনাদার এড়াইতে গিয়াই কলিকাতার বহু গলির নাম তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি আবার উত্তমর্ণ হইলেন কবে! কে এই রহস্যময় যোগেনবাবু? আশ্চর্য কাণ্ড!

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম অপূর্ব সানিয়াল। এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি, রোল নম্বর বাহাত্তর।"

এক নিশ্বাসে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল! ফল যে ফলিয়াছিল তাহা সকলেই জানে। অপূর্ব সত্যই সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই অপূর্বতাই অপূর্ব সানিয়েলের বৈশিষ্ট্য।

অপূর্ব দুই চোখেই সমান দেখিতে পায় কিন্তু বাঁ চোখটা সর্বদাই এমন কায়দা করিয়া বুজিয়া থাকে যে মনে হয় বাঁ চোখে কিছু পড়িয়াছে বুঝি! সকলে যাহাতে হাসে অপূর্ব তাহাতে হাসে না। যাহা শুনিয়া সকলের মুখ গম্ভীর হইয়া যায়, অপূর্ব সেখানে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। বিবাহ না করাটাই আজকালকার ফ্যাসন বলিয়া অপূর্ব বিবাহ করিয়াছে, একটা নয়, দুইটা। দুইটাই গোপনে, কারণ প্রকাশ্যে বিবাহ তো সকলেই করে, তাহাতে আর অপূর্বতা কি!

এই যুগ্ম বিবাহের চাপেই কিন্তু অপূর্বকে শেষে চিরাচরিত পথে পা বাড়াইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও সে নিজের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে ছাড়িল না।

চ্যানাচুরর—

দোকানের নাম বড় অক্ষরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে। চানাচুরের দোকান নয়, ধর্মগ্রন্থের দোকান। বলাবাহুল্য, দোকানের স্বত্বাধিকারী অপূর্ব সানিয়াল। তাহার ধারণা সত্যযুগ আসন্ন, তাই সকলের মধ্যেই ধর্মভাব প্রবল হইয়াছে। এখন ধর্মগ্রন্থেরই চাহিদা বেশী হইবে। অপূর্ব বলে—একটি কথা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না।

ধর্মভাব প্রবল হইলেও লোকে তাহা এখন প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত। পূর্বে লোকে কাম-বিষয়ক পুস্তক যেমন গোপনে খরিদ করিত, এখন ধর্ম-বিষয়ক পুস্তকও তেমনি গোপনে খরিদ করে। সুতরাং দোকানের নাম "ধর্মগ্রন্থালয়" বা "ধর্মমন্দির" রাখিলে প্রকৃত খরিদ্দার সেখানে আসিতে ইতস্ততঃ করিবে। লোকে কোকেন খাইতে চায়, কিন্তু পানের ভিতর লুকাইয়া। তাই কোকেনখোরদের ভীড় ঔষধের দোকানে হয় না, হয় পানের দোকানে। দোকানের নাম "চ্যানাচুররর—" রাখিলেই ধর্মপ্রাণ খরিদ্দারেরা হু হু করিয়া আসিবে ইহাই অপূর্ব সানিয়ালের বিশ্বাস।

ঢিলা পাজামা, বুশ শার্ট, নীল চশমা, ফ্রেঞ্চকাট গোঁফদাড়ি লইয়া অপূর্ব দোকানে দিনের পর দিন বসিয়া থাকে খরিদ্দারের আশায়। প্রথমে কয়েকদিন ছোট ছেলে মেয়ে আসিয়াছিল চানাচুর কিনিবার জন্যই। কিন্তু অপূর্ব যখন চানাচুরের বদলে "শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য" আগাইয়া দিল তখন তাহারা অবাক হইয়া গেল। এমন কি "বৃহদারণ্যক" অথবা "গীতা-রহস্য" দেখাইয়াও তাহাদের মুগ্ধ করা গেল না। তাহারা মুচকি হাসিয়া সরিয়া পড়িল। অপূর্ব সানিয়ালও মনে মনে মুচকি হাসিল— "ঠিক লোকে সন্ধান পায়নি এখনও, যখন পাবে তখন তাদের ঠেকাবার জন্যেই লোক রাখতে হবে আমাকে হয়তো। পাবলিসিটিটা দরকার—!"

"চ্যানাচুররর"—বিদ্যুতায়িত হইয়া উঠিল একদিন রক্তবর্ণ আলো বিকীর্ণ করিয়া। একবার নেবে, আবার জ্বলিয়া ওঠে। জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে শব্দ হয় "চ্যানাচুররর—"।

ঠিক লোকেরা কিন্তু সন্ধান পায় না তবু। ধর্মপিপাসুদের সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরির দিকেই লক্ষ্য! আশ্চর্য!

অপূর্ব কিন্তু দমিবার ছেলে নয়। সে বিদ্রোহী, সে দুর্দম, সে অপূর্ব, সে অভীক। দেখা গেল ঠিক লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সে যাহা শুরু করিয়াছে তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধন আখ্যা না দিলে সংস্কৃত ভাষার মান থাকে না! দেখা গেল সে তাহার বুশ শার্টের একটি হাত সম্পূর্ণ কাটিয়া ফেলিয়াছে। আস্কন্ধ তাহার রোমশ দক্ষিণ বাহুটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বাম বাহুতে কেবল হাতা আছে। মাথায় পরিয়াছে মৌলবীর টুপি, মুখে ঝুলিতেছে পাইপ। বাম চক্ষুটি বুজিয়া টেবিল চাপড়াইয়া গান ধরিয়াছে—একলা চলরে।

দোকানের সামনে ভীড় করিয়া লোক দাঁড়াইল। পুলিস আসিল। আসিল না

কেবল খরিদ্দার। ঠিক লোকেরা বেঠিক পথেই চলিতে লাগিল এসব সত্ত্বেও। আশ্চর্য!

হঠাৎ একদিন অপূর্ব একদিকের গোঁফটা কামাইয়া ফেলিল। বাকি সব পূর্ববৎ। এবারও লোক জমিল, হৈ হল্লা হইল, কিন্তু ধার্মিক ক্রেতারা আসিল না।

"কোথায় তারা কোথায় তারা"—গানই বাঁধিয়া ফেলিল অপূর্ব। তবু তারা আসে না। আশ্চর্য!

অবশেষে একদিন সকলে চমকিত হইয়া দেখিল অপূর্ব সানিয়াল তাহার বৃদ্ধ পিতা ভুতি সাণ্ডেলকে ধরিয়া জুতাইতেছে। তাঁহার টাক বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে, মারের চোটে বৃদ্ধ মুক্তকচ্ছ হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন।

সকলে অপূর্বকে বলিল—"ছি ছি, একি করছ তুমি! বাপকে জুতো মারছ কেন?"

অপূর্ব অট্টহাস্য করিয়া উত্তর দিল—"কেউ মারে না ব'লে মারছি। আমার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ব'লে মারছি। তারা আসছে না কেন, আমার দিকে ফিরে চাইছে না কেন। এইবার আমি ল্যাংটো হয়ে নাচব রাস্তায়, চরম পাবলিসিটি কোরব, চ্যানাচুররর—"

সত্যসত্যই উদ্বাহু হইয়া অপূর্ব সানিয়াল অপূর্ব ভঙ্গীতে ফুটপাতের উপর দাঁড়াইয়া নাচিতে লাগিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

উক্ত অপূর্ব সানিয়াল আমাদের 'বায়ুদমন' ঔষধ সেবন করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঠিকানা—বায়ুদমন কার্যালয়।

বড়াখাম্বা রোড,

নিউ দিল্লী

দেশ-দরদী কেনারামের রোজনামচা

৮-৭-৫০

আপনারা কখনও দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়াছেন কি না জানি না। হয়তো করেন নাই, হয়তো করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে আমি ভাবি, আমি যেভাবে দেশের দুঃখ প্রত্যহ অনুভব করি তেমনভাবে আর কেহ করে কি না। আমি প্রত্যহ তিনখানি সংবাদপত্র আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিচলিত হই, বিগলিত হই, বিহ্বল হই। ইচ্ছা করে চীৎকার করিয়া কাঁদি। কিন্তু কাঁদিতে পারি না। মনে হয় আমার অশ্রুর উৎস বোধ হয় শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু না, সেদিন চোখে কাঁকর পড়িয়াছিল, অনেক জল তো বাহির হইল! তাহা হইলে বোধ হয় দেশের দুর্দশার কথা ভাবিবামাত্র অশ্রু জমাট হইয়া যায়, ঝরিয়া পড়িতে পারে না। হয়তো আমার মর্মলোক উত্তর-মেরু হইয়া গিয়াছে। কে জানে···।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে সত্যই অন্যমনস্ক হইয়া যাই। আজ সহসা লক্ষ্য করিলাম চা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, চা-য়ে একটি মাছি পড়িয়া ছটফট করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা উপমা জাগিল। মনে হইল স্বাধীনতা-কাপে পড়িয়া দেশও ওইরূপ হাবুডুবু খাইতেছে। দেশও মাছি হইয়া গিয়াছে। মনটা হু হু করিয়া উঠিল।

চাকরকে আর এক কাপ চা আনিতে বলিলাম।

তাহার পর আর এক কাপ।

তাহাতেও শানাইল না, তৃতীয় কাপের ফরমাশ দিয়া পায়ের পাতা নাচাইতে নাচাইতে পুনরায় সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলাম। ইচ্ছা হইল সম্পাদকের পদধূলি চাঁছিয়া আনিয়া সর্বাঙ্গে মাখি। আহা, কি লেখাই লিখিয়াছে! বাসনা জাগে· সম্পাদক হইব। কিন্তু হায় পরক্ষণেই মনে হয় বামন হইয়া চাঁদে হাত কি করিয়া দিব? তাহা যে অসম্ভব!

যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম।

মনে হইল দেশ গেল যে, আমি কি করিতেছি!

এক কাপ কফি প্রস্তুত করিতে বলিলাম।

১০-৭-৫০

সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যাইতেছিলাম। পথে দেখিলাম একটি বালিকা ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল নিশ্চয়ই দুখিনী, নিশ্চয়ই পাকিস্তান হইতে আসিয়াছে। আমার হৃদয়-গামছাকে কে যেন নিঙড়াইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল কিছু অর্থসাহায্য করি। পয়সা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছি এমন সময়ে বিবেক বলিল—পয়সা দিয়া কি তুমি উহার দুঃখ দূর করিতে পার? ভিক্ষা দিলে উহাকে অপমানই করা হইবে। বেচারী যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছে, আর কেন! পয়সা বাহির করা হইল না, তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলাম না। গটগট করিয়া সোজা ক্লাবে চলিয়া গেলাম। গিয়াই প্রথমে ভূতনাথের সহিত দেখা হইল। ভূতনাথ বলিল, "কেনারামবাবু, আপনার গা থেকে চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে তো! সেন্ট মেখেছেন না কি?"

সত্য কথাই বলিলাম।

"হ্যাঁ, ইভনিং ইন প্যারিস।"

বিশ্বনাথ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

সে বলিল—"আপনার আদ্দির পাঞ্জাবিটিও চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে—"

কম্পিতকণ্ঠে আবেগভরে বলিলাম—"ভাই বিশ্বনাথ, আমাদের দেশেই এককালে ঢাকাই মসলিন হ'ত সে কথা ভুলে যেও না। এ আদ্দি তার কাছে চট। আমি চট পরে বেড়াচ্ছি ভাই। আমার দুঃখ তোমরা বুঝবে না।"

"চলুন, এক হাত ব্রীজে বসা যাক"—ভূতনাথ বলিল। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ব্রীজ খেলার ফাঁকে ফাঁকেও দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। উদ্বাস্তুদের অসীম দুর্দশা, ঘন ঘন ট্রেন কলিশন, খাদ্য সঙ্কট, কর্তৃপক্ষদের অপটুতা, অসাধুতা প্রভৃতি চিত্তকে এমন উদ্বেলিত করিল যে উপর্যুপরি দুইবার হারিয়া গেলাম।

বাসায় ফিরিয়া মাংসের কোর্মা-সহযোগে লুচি আহার করিতে করিতে বারম্বার মনে হইতে লাগিল আহা, কত লোক যে অনাহারে আছে। খাদ্য-মন্ত্রীর সম্বন্ধে

সংবাদপত্রে যে সব মন্তব্য বাহির হইয়াছে সেগুলি মনে পড়িল। অমন একটা নামজাদা লোকের এই ব্যবহার? ছিঃ ছিঃ! অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অন্যমনস্ক ভাবে অনেকগুলি লুচি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। নেটের মশারি-আবৃত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে গিয়া আরও কাতর হইলাম। মনে পড়িল কত লোক ফুটপাথে শয়ন করিয়া আছে। শিয়ালদহের দৃশ্য মনে পড়িল। তাহারা কি আমার ভাইবোন নয়? চক্ষু সজল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইল না। একটা চাপা কষ্টে যেন দম বন্ধ হইবার মতো হইল! অনেকক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর নজরে পড়িল আমার বালিশের উপর প্রত্যহ যে রোমশ তোয়ালেখানি বিছানো থাকে, তাহা নাই। গৃহিণী সেকেণ্ড শো-য়ে সিনেমায় গিয়াছেন, আমার বালিশের উপর তোয়ালে দেওয়া হইয়াছে কি না দেখিবার অবসর পান নাই। এই দেশেই কি সীতা-সাবিত্রী ছিল? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন দিয়া যে চাকরটিকে নিযুক্ত করিয়াছি সে-ও আমার বালিশের উপর তোয়ালেটি বিছাইয়া দিবার অবসর পায় নাই। খাদ্যমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া সামান্য চাকর পর্যন্ত সব ফাঁকিবাজ। এ দেশের কি কোনও দিন উদ্ধার হইবে? মনের কষ্ট মনে চাপিয়া স্বহস্তেই বালিশের উপর রোমশ তোয়ালেটি বিছাইয়া লইলাম।

১২-৭-৫০

সকালে বাগানে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা একটি কালো জিনিস নজরে পড়িল। তুলিয়া দেখিলাম আমসি! আমসি!! একদিন আম ছিল, আজ আমসি হইয়াছে। মনে হইল আমাদের দেশের অবস্থাও কি এইরূপ নয়? আমাদের দেশও একদিন আম ছিল, আজ আমসি হইয়াছে। মনে হইবামাত্র হৃদয়বাল্তি দুঃখবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া দেশের কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেদিন রাস্তায় যে ম্লানমুখী বালিকাটিকে দেখিয়াছিলাম তাহার কথা মনে পড়িল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। বিব্রত হইয়া খিলি দুই পান এবং একটু জরদা মুখে দিলাম। কাশীর জরদা পূর্বে কত ভালো ছিল, কৌটা খুলিলে কি চমৎকার গন্ধই

ছাড়িত, এখন কিছু নাই। হায় হায়, দেশ কোন্ পথে চলিয়াছে? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল!

১৪-৭-৫০

প্রতিটি খবরের কাগজের স্তম্ভে স্তম্ভে ক্রমাগত দুঃসংবাদ পড়িয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে হইতেছিল বুঝি পাগল হইয়া যাইব। কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য অবশেষে তাই সিনেমায় গেলাম। খুব ভীড়। অতি কষ্টে একটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিতে পারিলাম। প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া কিন্তু ভারী আনন্দ হইল। যখনই সিনেমা দেখিতে যাই, তখনই এই ধরনের আনন্দ হয়। এক সঙ্গে দেশের এতগুলি লোক আনন্দ লাভের আশায় একত্রিত হইয়াছে ভাবিলেই আমি রোমাঞ্চিত হই। রোমাঞ্চিত কলেবরে গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলাম। আমার বাম পাশের আসনটি দেখিলাম তখনও খালি রহিয়াছে। একটি সিগারেট ধরাইয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম বাম পাশের আসনটিতে কে বসিবে? নারী না পুরুষ? কোন্ বয়সের? স্বদেশী না বিদেশী? বেশীক্ষণ কিন্তু এ চিন্তা করিবার অবসর মিলিল না, প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হইয়া গেল, চিত্রপটে একের পর এক বিজ্ঞাপনের ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিবার পর বড়ই বিষণ্ণ বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল বিদেশী বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি কি সুন্দর, দেখিলেই জিনিসটি কিনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ওই প্যাঁচামুখীকে দেখিবার পর কি আর স্নো কিনিতে ইচ্ছা করিবে? আমাদেরই যদি স্বদেশী জিনিস কিনিতে অনিচ্ছা জন্মে, স্বদেশী ব্যবসায় চলিবে কি করিয়া? স্বদেশী ব্যবসায় যদি না চলে···আর ভাবিতে পারিলাম না। মনে হইল সীমাহীন বেদনা-সমুদ্রে অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয়-শোলা দিশাহারা হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ছবির পর ছবি আসিতে লাগিল, আমি বেদনা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। তাহার পর আসল ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। দশটি যুবতীর নৃত্য-ভেলা আঁকড়াইয়া ধরিয়া গজল শুনিতে শুনিতে বেদনা-সমুদ্র পার হইতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ পরে সান্ত্বনা-সৈকতও দেখা গেল, কিন্তু হায়, আবার ঝটিকা আসিল। মনে হইল বাম পার্শ্বের আসনটিতে একটি মহিলা আসিয়া উপবেশন করিলেন। আমি কেনারাম ঘোষ, চিরকালই ভীতু স্বভাবের লোক। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে সাহস করিলাম না। অন্ধকারও

ছিল। দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া বোম্বাই-মার্কা নৃত্য দেখিতে লাগিলাম। ইন্টারভাল হইল। তখন অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম সেই ম্লানমুখী বালিকাটি বসিয়া আছে—সেদিন যাহাকে পথে দেখিয়াছি! প্রখর বিদ্যুতালোকে দেখিলাম বালিকা নয়, যুবতী। আমার ভয় যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গেল, কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। একটু ইতস্তত করিয়া প্রশ্ন করিলাম—"মাপ করবেন, আপনার বাড়ি কি পাকিস্তান?" মেয়েটির ম্লান মুখ যেন আরও ম্লান হইয়া গেল। যদিও সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "না, আমার বাড়ি এখানেই" কিন্তু আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না। দেশের দুঃখ-অনলে জলিয়া জলিয়া আমার দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। আমি তাহার বেদনা প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহার মুচকি হাসি তাহার বেদনাকে আরও যেন স্পষ্ট করিয়া তুলিল। আমি ইহাও বুঝিলাম যে তাহার বাড়ি পাকিস্তান বলিলে পাছে আমি তাহার প্রতি অনুকম্পাশীল হই তাই সে সত্য গোপন করিতেছে। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কর্তব্যবোধেই আমিও তখন চাতুরী অবলম্বন করিব স্থির করিলাম। বলিলাম, "কিছু মনে করবেন না, আমার একজন অত্যন্ত নিকট আত্মীয়া পাকিস্তানে ছিল, সে ঠিক আপনার মতো দেখতে। আপনাকে দেখে তার কথা মনে পড়ছে।" মেয়েটি আর একটু মুচকি হাসিল। চানাচুরওলাকে ডাকিয়া দুই ঠোঙা চানাচুর কিনিলাম।

"আপনি খাবেন? নিন না। আমার যে আত্মীয়াটির কথা বলছিলাম, সে চানাচুর খেতে খুব ভালবাসত। জানি না সে এখন কোথায়।"

"বেশ, দিন"

মেয়েটি হাত বাড়াইয়া ঠোঙাটি লইল এবং যেভাবে খাইতে লাগিল তাহাতে আমি অবাক হইয়া গেলাম। আমার বিস্ময় ক্রমশ কষ্টে রূপান্তরিত হইল। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম বেচারী অনাহারে আছে। মনে হইল আমি যেন দময়ন্তীকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুনরায় চাতুরীর আশ্রয় লইলাম।

বলিলাম, "আমার সেই আত্মীয়াটি ফিরপোতে খেতে খুব ভালবাসত। আপনার যদি অসুবিধা না হয় চলুন না ফিরপোতে যাই।"

"বেশ, সিনেমার পর যাওয়া যাবে।"

পাছে আমি তাহাকে গরীব এবং অসহায় মনে করিয়া কৃপা-পরবশ হই সেইজন্য বোধ হয় খুব সপ্রতিভভাবে কথাগুলি বলিল। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

[illegible] দুর্দশা যে কত [illegible] গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] লাভ করিয়াছি তাহা যে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না। [illegible] [illegible] করিতে লাগিলাম। [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] রওনা হইয়া গেলাম।

* * * *

কেশবতী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible]। কেশবতী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

জীবন-দর্শন

স্বাধীনতা দিবসে নিজের বাটির সম্মুখভাগ সুসজ্জিত করিবার বাসনা সকলেরই হয়, ভুবন মাইতিরও হইল। ভুবন মাইতির পিতা জীবন মাইতি সামান্য কেরানী মাত্র, বহুকালাবধি দশটা-পাঁচটা আপিস করিয়াছেন, কোনও হুজুগে মাতিবার মতো মানসিক তারুণ্য তাঁহার আর নাই। কিসে চাকুরিটি বজায় থাকে ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। বাটির সম্মুখভাগ সুসজ্জিত করিলে যদি চাকুরির কোনও সুবিধা হইত জীবন মাইতি নিশ্চয়ই তাহা করিতেন। কিন্তু তিনি জানেন বাটির সম্মুখভাগ লতাপাতা দিয়া সাজাইয়া 'জয় হিন্দ' টাঙাইয়া দিলে বর্তমান বড়বাবুর চিত্তে বিশেষ কোনও সুপ্রভাব বিস্তার করা যাইবে না। বিপরীত ফল হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করেন নাই। নূতন ধরনের একটা চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় প্রত্যুষেই তিনি বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র ভুবন মাইতি কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের সম্মান রক্ষা করিতে উৎসুক। সে শিক্ষিত লোক, কবি লোক। সুতরাং গতানুগতিক পন্থায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া, কিম্বা গোটাকতক লাল নীল বাতি জ্বালাইয়া এই মহদ্দিবসকে সংবর্ধনা করিবার প্রেরণা সে পাইল না। সে এমন কিছু করিতে চাহিল যাহা অনন্য, যাহা অনবদ্য, যাহা তাহার কবি হৃদয়ের পরিচায়ক। যে স্বাধীনতার জন্য সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, চিত্তরঞ্জন, নেতাজী…তাহার মগজের মধ্যে স্বাধীনতার সমস্ত ইতিহাসটা খলবল করিয়া উঠিল। "কি করা যায়…মানে,"—নিপুণভাবে একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রচুর ধূম উদগীরণ করত সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। তৃতীয় সিগারেটটি নিঃশেষ করিবার পর হঠাৎ তাহার মাথায় ঝড়াৎ করিয়া 'আইডিয়া' আসিয়া গেল একটা। ঠিক! উঠিয়া সিগারেটটি জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে মালকোঁচা মারিতে লাগিল। তাহাদের বাড়ি হইতে দুই ক্রোশ দূরে যে জঙ্গলটি আছে সেই জঙ্গল হইতে ফুল লতাপাতা আনিয়া সে বাড়ি সাজাইবে। ভারতের সভ্যতা একদিন অরণ্যের ক্রোড়েই লালিত হইয়াছিল, সেদিন বনমহোৎসবও হইয়া গিয়াছে। ঠিক! ভুবন মাইতি বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

* * * *

একগোছা হলুদ রঙের ফুল পাড়িয়া তাহার মনে হইল, ইহাই কি কর্ণিকার? যে কর্ণিকারের কথা কবি কালিদাস বলিয়াছেন, ইহা কি তাহাই? গ্র্যাণ্ড কিন্তু! ইহা যদি কর্ণিকার নাও হয় তাহা হইলেই বা কি আসে যায়। আমি ইহাকে কালিদাসের কর্ণিকার ভাবিয়াই তুলিব, কালিদাসের কর্ণিকার ভাবিয়াই ঘর সাজাইব। কালিদাস ভারতীয় সংস্কৃতির অলঙ্কার, আজ স্বাধীনতা দিবসে··· সমস্ত গাছটা সে মুড়াইয়া ফেলিল।

তাহার পর তাহার নজরে পড়িল একগোছা লালফুল। উর্ধ্বমুখী শাখায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটিয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ। রডোডেনড্রন কি রকম ফুল? লাল, না, সাদা? পুনরায় সে জ্রূকুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। জ্রূকুঞ্চন করার ফলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক একটা নূতন কথাও মনে হইল তাহার। ওগুলো অশোক ফুল হইতেই বা বাধা কি! অগস্ট মাসে কি অশোক ফুল ফোটে? কে জানে! কিছুক্ষণ জ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া সে স্বগতোক্তি করিতে বাধ্য হইল—আরে ছ্যাৎ, ওসব লইয়া বৃথা মাথা ঘামাইতেছি। আমি নিজে যদি উহার নূতন নামকরণ করি আটকায় কে। দুইজন ভারতীয় কবির ব্যবহৃত দুইটি ফুলের যদি সন্ধি করিয়া অশোকেনড্রন করিয়া দিই কি এমন ক্ষতি। স্বাধীনতা দিবসে এটুকু স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহা হইলে আর···!

এ গাছটাকেও সে মুড়াইয়া ফেলিল।

দুই রকম ফুল সংগ্রহ হইল! এইবার কিছু পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে। বনে পাতার অভাব ছিল না। দুই হাতে সে পাতা ছিঁড়িতে লাগিল। স্বাধীনতা দিবসটা চুটাইয়া পালন করিতে হইবে। সহসা কিন্তু তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। হাত ঘড়িটি কখন খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে সে টের পায় নাই। কি সর্বনাশ! চতুর্দিকেই ঝোপঝাড়, কোথায় সে খুঁজিবে। কিন্তু খুঁজিতেই হইবে।

···একটা ঝোপের ভিতর কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিয়া ভুবন মাইতি পুনরায় জ্রূকুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। অদূরে আর একটি ঝোপের অন্তরালে

আর একটি লোক ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে! ভাল করিয়া তাহার মুখটা যদিও দেখা যাইতেছে না কিন্তু তবু যেন চেনা-চেনা ঠেকিতেছে। জামার ছিটটা তো খুবই পরিচিত। ভুবন মাইতি বহুপ্রকার ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল। তাহার মাথার ভিতর দিয়া ঝড় বহিয়া গেল। একটা কথা কিন্তু সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না, এই ব্যক্তিটি কি করিয়া জানিতে পারিল যে সে আজ রোলড গোল্ড রিস্টওয়াচ পরিয়া এই জঙ্গলে ফুল সংগ্রহ করিতে আসিবে এবং অসাবধানতা বশত সেটি হারাইয়া ফেলিবে। সে কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে আধুনিক অনেক চোররা নাকি টেলিপ্যাথি বিদ্যাতেও পারদর্শী হইয়াছে। জ্যোতিষ বিদ্যাতেও। কিন্তু এরূপ কৃতবিদ্য চোর মুচিগ্রামের জঙ্গলে আসিয়া হানা দিবে ইহাও কল্পনা করা শক্ত। অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া ভুবন মাইতি অবশেষে একটা দুঃসাহসিক কার্য করিয়া ফেলিল। সে জানিত বেকায়দায় পড়িলে ইহারা আচমকা পিস্তল বাহির করিয়া বসে এবং পিস্তলের গুলি মোক্ষম স্থানে লাগিলে অক্কা পাওয়াও বিচিত্র নয়—মনে মনে এই কথাগুলি সে আবৃত্তিও করিল কিন্তু তথাপি পশ্চাৎপদ হইল না। তাহার মনে হইল আজ স্বাধীনতা দিবস, আজ অন্তত ভীরুতা প্রকাশ করিলে চলিবে না।...

"কে—"

সাহস সংগ্রহ করিয়া সে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল।

যিনি ঘাপটি মারিয়া বসিয়াছিলেন তিনি ঘাড় ফিরাইলেন। ভুবন মাইতি এবার সত্যই অবাক হইয়া গেল। সেই ঝোলা গোঁফ, নাকের পাশে সেই কালো আঁচিল—না, ভুল হইবার নয়, বাবাই। কিন্তু বাবা এখানে অমনভাবে বসিয়া আছেন কেন! জীবন মাইতি পুত্রের মুখের দিকে নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তিনিও তাঁহার একমাত্র তনয়কে এস্থানে দেখিবেন কল্পনা করেন নাই।

"তুমি এখানে কি করছ বাবা?"

গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

"আমি?"

ভুবন মাইতির কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হইয়া মুখে একটা অপ্রস্তুত ভাব ফুটিয়া

উঠিল। পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া সে তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল চলিত বাংলায় যাহাকে "ঢোঁক" বলে।

"তুমি এখন এখানে কেন বাবা?"

জীবন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

"স্বাধীনতা দিবসে বাড়িটা একটু সাজাব মনে করেছি তাই ভাবলাম ইয়ে মানে—"

"বুঝেছি। ফুল লতাপাতা সংগ্রহ করতে এসেছ। বুঝেছি। কিন্তু ওতে ভবি ভুলবে না বাবা।"

"ভবী?"

"হ্যাঁ। ও সব শৌখিন টুকিটাকিতে ভোলবার লোক বড়বাবু নয়। আমিও স্বাধীনতা দিবস করতেই বেরিয়েছি।"

ভুবন অসহায়ভাবে নির্নিমেষে পিতৃমুখ সন্দর্শন করিতে লাগিল। জীবন বলিলেন—"ব'স, বুঝিয়ে বলি তাহলে কথাটা। তোমাকে আমার অফিসে ঢোকাতে চাই। বড়বাবুর কাছে কথাটা পেড়েছিও, কিন্তু তিনি হুঁ হাঁ কিছুই করেন না। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন তাঁকে হুঁ হাঁ করাতে গেলে যে পরিমাণ রেস্ত থাকা দরকার, তা আমার নেই। আমাকে বিক্রি করলেও জুটবে কি না সন্দেহ। আমি প্রথম যখন চাকরিতে ঢুকি তখন যিনি বড়বাবু ছিলেন একছড়া কাঁচকলা মাঝে মাঝে দিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি ডিস্‌পেপসিয়ার রুগী ছিলেন, কাঁচকলা পেলে ভারী খুশী হতেন। তারপর যিনি এলেন তাঁকে ডালি দিতে হ'ত। অন্য কিছু নয়, পুজোর সময় ফলটা পাকড়টা, আমের সময় কিছু ল্যাংড়া আম। এর বেশী নয়। তারপর এলেন বিশ্বম্ভর গোঁসাই। তাঁকে কিছু দিতে হ'ত না, তাঁর কাছে কেবল বলতে হত যে তাঁর যিনি গুরুদেব—১০৮ শ্রীঅলখ অবধূত—তিনিই বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি নিজের ঢোল নিজে বাজাচ্ছেন না বলে' লোকে তাঁকে চিনতে পারছে না। এই বললেই গোঁসাইজি খুশী হতেন। গোঁসাইজির পরে এলেন মিস্টার পাকড়াশি। একের নম্বর হারামজাদা। কিন্তু একটি বোতল মদ দিলেই শিবটি। যা চাও তাই দেবে। এখন দেশের স্বাধীনতা হয়েছে। আমাদের বড়বাবু খদ্দর পরছেন। শুনলাম আমাদের নরেনের ভাইপোর চাকরিটি হয়েছে

একটি রেডিও দিয়ে। নগদ সাতশ' টাকা লেগেছে। বড়বাবুর এখন একটা রেফ্রিজারেটারের দিকে ঝোঁক হয়েছে না কি শুনলাম। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাব আমি। তাই শজারু খুঁজতে বেরিয়েছি।"

"শজারু? কেন?"

"বড়বাবুর পেটে কি এক ব্যথা হয়েছে, একজন হাকিম না কি বলেছে শজারুর মাংস খেলে ভাল হয়ে যাবে। বড়বাবু চারিদিকে শজারুর সন্ধান করছেন। ভৌমিক আমাকে বলেছিল এই বনে নাকি শজারু আছে। সেই খোঁজে আজ বেরিয়েছিলাম তাই। আজ স্বাধীনতা দিবসে বড়বাবুকে যদি একটা শজারু ধরে দিতে পারি হয়তো খুশী হবেন। ওই ঝোপের পাশে একটা গর্তর মতো দেখলাম, শজারুর কাঁটাও পড়ে আছে দু'একটা। চলতো দেখি একবার ভাল করে।"

পিতা ও পুত্র উভয়েই গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। ফুল ও পাতাগুলি শুকাইতে লাগিল।

কেডলী স্যুপ

নাম যদিও ব্রহ্মানন্দ আনন্দ পান কিন্তু মাংসে। মুরগিতে ষোল আনা লোভ। সেই জন্যেই বন্ধুত্ব হয়েছিল খলিলের সঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সত্ত্বেও। খলিলের বাড়িতে বিনা খরচায় ব্রহ্মানন্দ মুর্গ-মুসল্লমের যে আস্বাদ পেয়েছিলেন তা ভোলবার নয়। লীগ মিনিষ্ট্রির তিক্ততাও সে মাধুর্যকে কমাতে পারে নি এক তিল। খলিলের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের বন্ধুত্ব বরাবর অটুট ছিল। খবরের কাগজের সম্পাদকীয়-দুর্গ-নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি একটুও চিড় খাওয়াতে পারে নি তাতে। শুধু মুরগি নয়, আর একটা কারণও ছিল। লীগ মিনিষ্ট্রির কল্যাণে খলিল বন্দুক পেয়েছিল একটি। সেই বন্দুক দিয়ে ঘুঘু, শরাল, বুনো হাঁস প্রভৃতি শিকার করে' খলিল মিঞা যে সব মোগলাই ভোজ্য বানাত বন্ধু ব্রহ্মানন্দও তার অংশ পেতেন প্রচুর। সুতরাং গান্ধী-জিন্না প্যাক্ট বারবার বিফল হচ্ছিল যদিও, ব্রহ্মানন্দ-খলিল সৌহার্দ্য ঠিক ছিল। দৃঢ়তর হচ্ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু গড়বড়িয়ে গেল সব। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হল। খলিল হিন্দুপাড়ায় বাস করত। পালাতে হল তাকে। ভয়েই পালিয়েছিল সম্ভবত। বন্দুকটাও নিয়ে যেতে পারে নি। ব্রহ্মানন্দের কাছে থেকে গেল সেটা। অদৃষ্টের পাকে চক্রেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, তা না হলে মুসলমানের বন্দুক হিন্দুর হাতে পড়বার কথা নয়। বন্দুকের ঘোড়াটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল একটু। ব্রহ্মানন্দের পরিচিত একটি মিস্ত্রি থাকায় নিখরচায় বন্দুকটি মেরামত হয়ে যাবে বলে' খলিল বন্দুকটি ব্রহ্মানন্দকে দিয়েছিল। ঠিক তারপরই মার মার শব্দে দাঙ্গা বেধে গেল, পালাতে হল খলিলকে। ব্রহ্মানন্দ বেকায়দায় পড়ে গেলেন একটু। শুকতো, চচ্চড়ি, কলাইয়ের ডাল, বড়জোর মৌরলা মাছের টক্ কাঁহাতক আর খাওয়া যায়! মুরগির কথা কল্পনাও করা যায় না, প্রথমত দাম, দ্বিতীয়ত বাড়িতে ঢুকতে দেবে না পিসিমা। মাঝে মাঝে রেস্তোঁরায় ঢুকে চপটা কাটলেটটা খেয়ে আসেন ব্রহ্মানন্দ, কিন্তু জুত হয় না। এই ভাবেই দিন কাটছিল এমন সময় তাঁর সেই পরিচিত মিস্ত্রিটি খলিলের বন্দুকটা সারিয়ে দিল তাঁকে। ব্রহ্মানন্দ যেন অকূলে কূল দেখতে পেলেন। যদিও তিনি বন্দুক ছোঁড়েন নি কোন দিন (খলিলই বরাবর শিকার করত, তিনি দ্রষ্টা ছিলেন মাত্র) তবু তিনি অকূলে কূল পেলেন। তার বিশ্বাস হল চেষ্টা করলে তিনিও বন্দুক

ছুঁড়তে পারবেন। মানুষেই তো বন্দুক ছোঁড়ে, তিনিই বা পারবেন না কেন? পারতেই হবে। মৌরলা মাছের টক খেয়ে কাঁহাতক থাকা যায়! সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে তাঁর মেসোমশায়ের খুড়শ্বশুরের দ্বারস্থ হলেন। সেই খুড়শ্বশুরের সঙ্গে নাকি কংগ্রেস-ওয়ার্কার হরকালী নাগের খুব দহরম মহরম। নাগ মশাই যদি একটি চিঠি দিয়ে দেন তাহলে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নির্ঘাত ব্রহ্মানন্দ সাণ্ডেলকে বন্দুক ব্যবহারের যোগ্যপাত্র ব'লে বিবেচনা করবেন। তিনি যদি যোগ্যপাত্র ব'লে মনে করেন তাহলে বন্দুকের লাইসেন্স পেতে দেরি হবে না। আর বন্দুকের লাইসেন্স পেলে মৌরলা মাছের বদলে শরাল হাঁস, না হয় ঘুঘু, না হয় হরিয়াল, একটা না একটা কিছু জুটবেই। ব্রহ্মানন্দ অনন্যকর্মা হ'য়ে দিবারাত্রি তদ্বির করতে লাগলেন। দেখা গেল হরকালী নাগের সত্যিই কলমের জোর আছে। তাঁর একটি চিঠিতেই কাজ হ'য়ে গেল। ব্রহ্মানন্দ বন্দুকের লাইসেন্স পেয়ে গেলেন। টোটাও কিনে ফেললেন। একটি আপদ কিন্তু জুটল। ওই হরকালী নাগের ভাই শিবকালী। সে ছোকরা বলে' বসল—"শিকারে কবে বেরুচ্ছেন সাণ্ডেল মশাই। আমরা খবর টবর যেন পাই। একলাই খাবেন না—"

ব্রহ্মানন্দকে জিভ কেটে বলতেই হ'ল—"আরে না, না, সে কি কথা। পরশু দিন সকালেই শিকারে বেরুবো। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তুমি আমার বাসায় খেও"।

"আচ্ছা আসব"

দুই

সমস্ত দিন নাওয়া খাওয়া নেই। বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্রহ্মানন্দ। তিনটি ফায়ার করেছিলেন কিন্তু একটিও ব্রহ্মাস্ত্র হয় নি। একটি পাখীর একটি পালকও খসেনি। আশপাশের কাকগুলো সচকিত হ'য়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে কেবল। ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করলেন শরাল হাঁস মারা সহজ নয়, ঘুঘুও অত্যন্ত চালাক পাখী। রোক চড়ে গেল তাঁর, মারতেই হবে একটা কিছু। শিবকালী ছোকরা আবার সন্ধ্যাবেলা খেতে আসবে। ওই একটা ঘুঘু না? কলাগাছের ফাঁক দিয়ে ল্যাজটা দেখা যাচ্ছে না? কাদের বাগান এটা? গুঁড়ি মেরে মেরে অগ্রসর হতে লাগলেন ব্রহ্মানন্দ। গুড়ুম গুড়ুম—পর পর দুটো ফায়ারই করলেন একটু পরে। এবার ফল ফলল।

"কে বন্দুক ছুঁড়ছে!"

বাগানের গেট খুলে ঝাঁকড়া গোঁপওয়ালা এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি বেরিয়ে এল। কালো মুশকো চেহারা। মাথার চুল তো বটেই ভুরুগুলো পর্যন্ত খাড়াখাড়া।

"ঘুঘুটা পড়েছে নাকি"—

সপ্রতিভ হাসি হেসে এগিয়ে এলেন ব্রহ্মানন্দ।

"ঘুঘু? আপনি বন্দুক ছুঁড়েছেন?"

"হ্যাঁ"

"কি সর্বনাশ করেছেন দেখবেন আসুন"

"সর্বনাশ, মানে?"

"আসুন না স্বচক্ষেই দেখবেন।"

দুরু দুরু বক্ষে স্খলিত চরণে ব্রহ্মানন্দ বাগানে প্রবেশ করলেন।

"ওই দেখুন, কাঁদির প্রত্যেকটি কলা জখম হয়েছে"

ব্রহ্মানন্দ নির্নিমেষে ছররা-বিধ্বস্ত কলার কাঁদির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

"ঘুঘুটাকে মিস্ করেছি"

"কলার দামটা দিয়ে যাবেন অনুগ্রহ করে"

"দাম?"

আজ্ঞে হ্যাঁ, দাম। দাম না দিলে বন্দুকটি কেড়ে রেখে দেব। আমার নাম ভৈরব নিউগি—"

তিন

ব্রহ্মানন্দ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ঘি, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, হলুদ, ধনে, জিরেবাটা, তেজপাতা, গরম মসলা, এমন কি জাফরান পর্যন্ত। খেতে বসে শিবকালী একটু চেখে বললেন—"এ কিসের মাংস মশাই"

"খেয়েই দেখুন না"

শিবকালী আর একটু খেয়ে বললেন—"এ যে কাঁচকলার ঝোল মনে হচ্ছে? কি বলুন তো ব্যাপারটা"

"কেডলীস্যুপ"

"কেডলী? কদলীকে কেডলী করেছেন নাকি"

"আরে না, না, খেয়েই দেখুন না। গোয়ানিজ প্রিপারেশন—"

দেশী ও বিলাতী

তখন হাসপাতালে চাকরি করি।

মফঃস্বলের একটি কলে বাহিরে গিয়াছি। স্থানটি পল্লীগ্রাম, শহর হইতে বেশ কিছু দূরে। পাঁচ ক্রোশ পথ গোশকটের সাহায্যে অতিক্রম করিয়া গিয়া দেখি রোগটি অতিশয় সাংঘাতিক।

একটি শিশুর ডিপথিরিয়া হইয়াছে। শ্বাসনালিটি অবরুদ্ধ, নিশ্বাস প্রশ্বাসের খুবই কষ্ট হইতেছে। শ্বাসনালিতে অস্ত্রোপচার করিয়া শ্বাস কষ্টটা লাঘব করিলাম বটে, কিন্তু ডিপথিরিয়ার ইনজেকশন না দিলে যে ছেলেটির জীবন সংশয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

পল্লীগ্রামে ডিপথিরিয়া অ্যান্টিটক্সিন পাওয়া গেল না। আমাদের হাসপাতালের ভাণ্ডার পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। শহরের দোকানগুলিতে খুঁজিয়াও পাইলাম না। নিরুপায় হইয়া তখন কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিতে হইল।

প্রথমে একটি বিখ্যাত দেশী দোকানেই করিলাম। লিখিলাম, 'একটি মুমূর্ষু রোগীর জন্য ঔষধটি অবিলম্বে প্রয়োজন। টেলিগ্রাম পাইবামাত্র পাঠাইয়া দিবেন।' তাহার পর কি মনে করিয়া একটি বিলাতী দোকানেও করিলাম। মনে হইল কি জানি এক স্থানে যদি টেলিগ্রামের গোলমাল হইয়া যায়। যদি দুই স্থান হইতেই ঔষধ আসে ক্ষতি নাই। যাহা বাঁচিবে আমি হাসপাতালেই কিনিয়া লইব।

...পরদিন পোস্টাফিসে লোক বসাইয়া রাখা হইল। পার্সেলটি আসিবামাত্র ছাড়াইয়া আনিবে, অযথা দেরি যেন না হয়।...

...কিছুক্ষণ পরে লোকটি আমার বাসায় আসিয়া খবর দিল যে একটিও পার্সেল আসে নাই।

বড়ই হতাশ হইলাম। মুমূর্ষু শিশুটির জন্য দুঃখও হইতে লাগিল। আহা, ঔষধটা ঠিক সময়ে পড়িলে ছেলেটা বোধ হয় বাঁচিয়া যাইত।

অদৃষ্ট এবং ভগবানের ইচ্ছার দোহাই পাড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাহাই করিয়া হাসপাতাল অভিমুখে রওনা হইলাম।

হাসপাতালে আসিয়া দেখি একটি লোক আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

"আপনিই কি ডাক্তার মুখার্জি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"এই চিঠি আর এই ওষুধ নিন।"

দেখিলাম লোকটি সেই বিলাতী দোকান হইতে আসিয়াছে।

দোকানের কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন:

"প্রিয় ডাক্তার মুখার্জি,

আপনার টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন ডাকে পাঠাইবার সময় ছিল না। আপনি জানাইয়াছিলেন রোগীটি মুমূর্ষু, তাই লোক মারফত ঔষধটি পাঠাইতেছি। আশা করি ঔষধটি ঠিক মতো আপনি পাইবেন। ঔষধের বিলও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনার রোগী যদি অবস্থাপন্ন লোক হন, তাহা হইলে আমাদের কর্মচারীর যাতায়াতের ভাড়াটাও দিয়া দিবেন। ইতি..."

তাহার পর দিনও দেশী দোকান হইতে ঔষধ আসিল না।

তাহার পর দিনও না।

সাতদিন পরে তাঁহাদের একটি পত্র পাইলাম।

তাঁহারা লিখিয়াছেন—

"প্রিয় মহাশয়,

আজকাল নিম্নলিখিত হারে ডিপথিরিয়া অ্যাণ্টিটকসিনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্ধিত হারে আপনি ঔষধ লইবেন কি না জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি..."

ইহাদের আর পত্র লেখার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ আমার রোগীটি ভাল হইয়া গিয়াছিল।

সত্য

সত্য কথাটা ভুলে যাই আমরা বারবার। গল্পটা শুনুন তবে। সেদিন স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। একে জংশন স্টেশন, তার উপর তিন চারখানা ট্রেন লেট। হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, পেশোয়ারী, ফিরিঙ্গী সবরকম লোক কিলবিল করছে। ওয়েটিং রুমে স্থান নেই। প্লাটফর্মের উপর উপচে পড়েছে যাত্রীর ভীড়। শিশুর চীৎকার, ফেরিওয়ালার চীৎকার, এনজিনের শব্দ, কুলিদের কলহ মিলে একটা হট্টগোল চলেছে। আমি পুঁটুলিটি হাতে ক'রে একধারে দাঁড়িয়ে আছি। সমস্ত মন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে ইংরেজরা চলে গিয়ে কি দুর্গতিই হয়েছে আমাদের। ইংরেজদের আমলে দেশসুদ্ধ চোর যেন মুখোশ প'রে ছিল। তারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখোশ খ'সে প'ড়ে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে সকলের। চাষী, মজুর, চাকুরে ব্যবসাদার সবাই যেন পাল্লা দিয়ে জোচ্চুরি করছে। নেতারা পর্যন্ত ন্যাতা হয়ে গেল। আমার চিন্তাটা অবশ্য ঠিক যে একরঙা ছিল তা নয়। আমি এর অপর দিকটাও ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক অব্যবহিত পরে অন্যান্য দেশের অবস্থা কি আমাদের চেয়ে ভাল ছিল? সাধারণ লোকে কি আমাদের চেয়ে সুখে থাকত? ফরাসী বিদ্রোহের ঠিক পরের অবস্থা তো সাংঘাতিক হয়েছিল। বলশেভিকরা যখন রাজ্য অধিকার করল তখন সাধারণ লোকদের অবস্থা যা হয়েছিল তা—সহসা আমার চিন্তায় সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রং লাগল এক পোঁচ। জেনানা ওয়েটিং রুমে আমার স্ত্রীকে ঢুকিয়ে দিয়েছি, যা ভীড়, বেচারি বসতে পেয়েছে কিনা কে জানে। খোকাটাকে কোলে ক'রে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কোলে ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যা দামাল দুরন্ত···আমার এ চিন্তাকেও ছিন্নভিন্ন করে পরমুহূর্তে বেজে উঠল একটা ঘণ্টা—ঢননং ঢননং ঢননং ঢননং। সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠলাম কোন্ গাড়িটা আসছে। জানা গেল আমাদের কারও গাড়ী নয়। আগের স্টেশনে অনেক বাস্তুহারা এসে জমেছিল, তাদের নিয়েই স্পেশাল ট্রেন আসছে একটা, আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না, সমস্যা বরং জটিল হবে, কারণ ওই এক গাড়ী বাস্তুহারা এসে এই প্লাটফর্মেই নামবে। এমনিতেই তো তিল ধারণের স্থান নেই। তার উপর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম,

গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। মন্থর গতিতে বিরাট ট্রেনটা এসে দাঁড়াল একটু পরে। আর তার থেকে নামতে লাগল ভীত চকিত অসহায় মানুষের দল। মানুষ, না পশু? পর মুহূর্তেই মনে হল, না ওরা হিন্দু বাঙালী, এই ওদের একমাত্র অপরাধ! সমস্ত মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। চোখ বুজে ব'সে পড়লাম। মুদিত চোখের সামনে কৃতী হিন্দু বাঙালীরা যেন মিছিল ক'রে এল আর চ'লে গেল। এঁরাই না স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা? এঁদেরই উত্তরাধিকারী আমরা কোথায় তলিয়ে গেলাম! আমরা তবু কোনক্রমে টিকে আছি কিন্তু আমাদের বংশধরেরা কি পারবে? খোকার মুখটা সহসা মনে ভেসে উঠল আবার। এই প্রাদেশিকতা-সঙ্কীর্ণ স্বাধীন ভারতের আত্মকেন্দ্রিক জনতায় আমার খোকন কি আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে কোনদিন? চোখ বুজে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ চীৎকার চেঁচামেচিটা বেড়ে যাওয়াতে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। দেখলাম জনতার মধ্যে কলহ শুরু হয়ে গেছে।

কান পেতে শুনলাম—কে একজন তারস্বরে বলছেন—"আরে রেখে দিন মশাই, ওসব প্যাক্টের ভাঁওতায় ভোলবার ছেলে আমরা নই। ওসব কেবল আই ওয়াশ, মনকে চোখ ঠারা। বাঙালী হিন্দু মরছে মরুক তার জন্যে জহরলাল মাথা ঘামাতে যাবে কেন! কাশ্মীরে সোলজার পাঠিয়েছিল কেন জানেন? নিজে কাশ্মীরী যে। হায়দ্রাবাদ বাংলা দেশ হলে হায়দ্রাবাদেও সোলজার যেত না।"

আর একজন কে প্রত্যুত্তর করলেন শুনতে পেলাম। তাঁর গলার আওয়াজও কম নয়।

"দেখুন মশাই, আপনি যা বললেন তাতে আপনার বুদ্ধির পরিচয় পাচ্ছি না, পরিচয় পাচ্ছি নীচ মনের। পাকিস্তান একটা ডোমিনিয়ন সে কথা মনে রাখবেন। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে হয়তো থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বেধে যাবে। একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন যে পাকিস্তান হচ্ছে ইংরেজদের সৃষ্টি ভারতের স্বাধীনতাকে খর্ব করবার জন্যে। এরা তো চাইছেই যে আমরা যুদ্ধটা ঘোষণা করি।"

"কেন যুদ্ধ ঘোষণা করলে কি হ'ত?"

"পাকিস্তানের নামে আমেরিকান সুপার ফোর্ট্রেস এসে পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই আমাদের ঠাণ্ডা করে দিত। যাদের হাই তুলতে গেলে চোয়ালে খিল ধ'রে যায় তাদের বন্দুক কাঁধে করতে না যাওয়াই ভাল।"

"দেখুন মশাই, আমাদের আর সেদিন নেই—"

কোলাহল ক্রমশঃ এত তুমুল হয়ে উঠল যে আর কিছুই শুনতে পেলাম না। দু'জন বাঙালীই বোধ হয় তর্কটা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অবাঙালীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। অনুভব করলাম প্রো-জহরলাল এবং অ্যান্টি-জহরলাল দুটো দল হয়েছে এবং বাংলা, হিন্দী, ইংরেজি ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিচ্ছে। গালাগালি শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হ'ল। প্রায় সাতফুট লম্বা চাপ-দাড়ি একজন পাঞ্জাবী সরদার চক্ষু রক্তবর্ণ করে এমন আস্ফালন করতে লাগলেন যে মনে হ'তে লাগল বুঝি তিনি কাউকে মেরেই বসবেন বা।

এমন সময় আমার কাছায় টান পড়ল। ফিরে দেখি আমার স্ত্রী আলুথালু বেশে দাঁড়িয়ে আছেন।

"খোকনকে কোল থেকে নাবিয়ে দিয়েছিলুম, টুক ক'রে হামা দিয়ে কখন সে বেরিয়ে গেছে। আমি পাশের একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম একেবারে টের পাইনি।"

সর্বনাশ! এই ভীড়ে ওইটুকু শিশু একেবারে পিষে যাবে যে! অসহায়ভাবে জনতার দিকে চেয়ে দেখলাম। তাদের উষ্মা বেড়েছে বই কমেছে ব'লে মনে হ'ল না! পাঞ্জাবী সরদারের চোখ আরও রক্তবর্ণ হয়েছে।

"কোন দরজা দিয়ে বেরিয়েছে দেখতে পাওনি?"

"পেলে তো ধরেই ফেলতাম। তবে ওদিকের দরজাটাও খোলা আছে। প্লাটফর্মের দিকে বেরুলে ঠিক দেখতে পেতাম, ঠিক ওই দিকেই বেরিয়ে গেছে।"

প্লাটফর্মের এই বিরাট জনতায় খোকনকে খোঁজবার চেষ্টা করা মানে যে কি তা ভাবতেও হৃৎকম্প হচ্ছিল আমার। আগে বাইরের দিকটাই দেখে আসা যাক। বেরিয়ে গেলাম। কোথায় খোকন? তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম চারিদিক, এমন কি স্টেশনের বাইরে গাড়ির স্ট্যাণ্ড, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কোথাও খোকন নেই। যার সঙ্গে দেখা হ'ল তাকেই প্রশ্ন করলাম—'একটি ছোট ছেলেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখেছেন ওয়েটিং রুম থেকে?' কেউ দেখেনি। একজন অযাচিত উপদেশ দিলেন, "সাবধান মশাই, চারিদিকে ছেলেধরা ঘুরছে, পুলিসে খবর দিন যদি না পান।"

…প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকলাম আবার। এই ভীড়ে কি ক'রে যে খুঁজব! প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই কিন্তু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। গোলমাল থেমে গেছে। তর্কাতর্কি, কলহ, চীৎকার একদম নেই। মাঝে মাঝে হাসির আওয়াজ উঠছে বরং। ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একি, খোকন সবার কোলে কোলে ঘুরছে। আমি যখন কাছাকাছি এলাম সরদারজি তখন খোকনকে কোলে নিয়েছেন এবং খোকন দুহাত দিয়ে তাঁর চাপদাড়ি মুঠো ক'রে ধরেছে। হঠাৎ যেন এক ডিক্‌টেটার এসে থামিয়ে দিয়েছে সব গোলমাল। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। একটু আগেই মনে হচ্ছিল ভবিষ্যতে খোকনরা কি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে নিজেদের? এই তো এখনই পেরেছে! যা প্রাণবন্ত সজীব সুন্দর, তার আধিপত্যকে অস্বীকার করবে কে!

ছোট গল্পের গল্প

অদৃশ্য মানসিক টেলিফোনে বারম্বার 'রিং' করিবার পর অবশেষে ছোট গল্পের সাড়া পাইলাম।

"কি বলছেন ?"

"তোমার যে দেখাই পাই না আজকাল, ব্যাপার কি !"

"আজকাল পুজোর মরশুম যে ! সব লেখকই ডাকাডাকি করছেন। মোটে অবসর নেই। আপনার কলমের ডগাতেও হাজির হতে হবে নাকি !"

"হবে বই কি। আমারও তো পুজোর মরশুম—"

"বেশ যাব। কখন আপনার অবসর ? আগে তো রাত বারোটার পর লিখতেন।"

"এখন বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছি। এখন—"

"কখন যাব তাহ'লে বলুন"

"এখনই এস না"

"এখনই ?"

"কেন, কোনও অসুবিধে আছে কি ?"

"আচ্ছা যাচ্ছি"

অদৃশ্য ট্যাক্সি চড়িয়া ছোট গল্প আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। সেই তন্বী কিশোরীটি, যাহাকে আমি চিনিতাম, সে কোথায় ? এই ভীমকান্তি মহিলাটি তো সে হইতে পারে না ! তন্বী কিশোরীকেও ভীমকান্তি মহিলায় রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এত অল্প সময়ে তাহা তো হয় না। সেদিনই তো রাস্তার মোড়ে অন্ধ ভিখারীটির পাশে তাহার দেখা পাইয়াছিলাম। বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া মহিলাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিন থাক চিবুকের খাঁজে খাঁজে পাউডার, বৃত্তাকার সকজ্জল চক্ষু, সুপুষ্ট অধরোষ্ঠে সুস্পষ্ট রং, বিরাট দেহ ঘিরিয়া জমকালো একটা বেনারসী শাড়ী, ব্লাউসের হাতায় সোনার জরি, দৃশ্যমান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অলঙ্কারের বাহুল্য, আংটি গোটা তিনেক। রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেলাম।

"চিনতে পারছেন না নিশ্চয়—"

মহিলা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিটি ঠিক তেমনি আছে! দেহটা এমনভাবে বদল হইল কি করিয়া! ছিঃ, ছিঃ।

"সত্যি চিনতে পারছি না। অসম্ভব মনে হচ্ছে একেবারে। এ কি কাণ্ড!"

"প্রকাশকের বাড়ি থেকে সোজা চলে আসছি কিনা। "মেক-আপ'টা ছাড়া হয়নি এখনও। আমি এখন ছোট গল্প নই মশাই। আমি এখন উপন্যাস। আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সমন্বিত, পাঁচজন অধ্যাপক, তিনজন সমালোচকের প্রশংসাপত্র সম্বলিত জগদ্দল কাণ্ডকারখানা।"

মুখোশটা সহসা খুলিয়া ফেলিল। সেই লাবণ্যময়, চোখের দৃষ্টিতে সেই সকৌতুক হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।

"এত মোটা হলে কি করে!"

"খড় তুলো আর নারকোল ছোবড়ার সাহায্যে"

"এ রকম করবার মানে?"

"প্রকাশকদের কাছে ছোট গল্পের আদর নেই। ছোট গল্পের আদর মাসিকের পাতায়। প্রকাশকদের কাছে যেতে হলে তাই উপন্যাসের 'মেক-আপ' নিয়ে যাই! পাশের ঘরটা খালি আছে কি? এগুলো তাহলে ছেড়ে ফেলি"

"খালি আছে"

"ট্যাক্সি থেকে সুটকেসটা নিয়ে আসি তাহলে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেব কি? কতক্ষণ দেরি হবে আপনার?"

"ট্যাক্সি ছেড়ে দাও"

ক্ষণকাল পরে সুটকেস হস্তে ছোট গল্প প্রবেশ করিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া 'মেক-আপ' ছাড়িতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল স্বপ্ন নয় তো!

"একটা সাবান আর একটু জল পেলে ভাল হ'ত! দিতে পারেন?"

ঘরের ভিতর হইতেই সে বলিল।

"ঠিক পাশেই চানের ঘর। ঢুকে যাও সব পাবে"

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ছোট গল্প স্বস্থ হইয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এবার তাহার দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল। তাহার যে রূপ

আমাকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে, সেই অর্ধস্ফুট মাধুরী আবার প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার চোখের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা সকৌতুক হাসি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

"আপনার কি মনে হচ্ছে জানি, দোহাই আপনার, বলবেন না সেটা। আমার সময় নেই। আপনি কি চান বলুন।"

"তোমাকে চাই। ছোট গল্পকে—"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি 'মেক-আপ' চান বলুন। সামাজিক, রাজনৈতিক, তত্ত্বমূলক, তথ্যমূলক, দার্শনিক না ঐতিহাসিক, ধাঁচটা কি রকম হবে?"

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

"বুঝতে পারছি না ঠিক—গল্প চাই, মানে—"

"বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা, একটা মজা করি দাঁড়ান। আমি একজনের কাছে ম্যাজিক শিখেছি একটা। চোখ বুজুন, এখনই বুঝতে পারবেন।"

"চোখ? কেন, কি করবে?"

"চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দেব। তারপর আপনি—বুজুন না চোখ তুটো—দেখতেই পাবেন এখুনি।"

চোখ বুজিলাম। ছোট গল্প আমার চোখের পাতার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমশ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। খানিকক্ষণ পরে অনুভব করিলাম, আমার চোখের পাতায় আর কেহ হাত বুলাইতেছে না। ধীরে ধীরে চোখ খুলিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত।

দেখিলাম আমার টেবিলে বই, খাতাপত্র কিছু নাই, কেবল সারি সারি নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সাজানো রহিয়াছে। রুটি, পরোটা, লুচি, কচুরি, সিঙাড়া, নিমকি, খাজা, গজা, বালুশাই, পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, হালুয়া এবং ইহাদের পাশে (একটু বেমানান ভাবেই) এক-কড়াই ময়দার আঠা, বাংলায় যাহাকে লেই বলে। অবাক্ হইয়া গেলাম। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম ছোট গল্প নাই। কোথায় গেল সে? সহসা তাহার গিটকিরিভরা কলহাস্য বাতায়ন-পথে ভাসিয়া আসিল। বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশের পটভূমিকায় একটি সবুজ গমের শীষ বাতাসে ধীরে ধীরে তুলিতেছে।

…গমের শীষ কথা বলিতে লাগিল।

"...টেবিলের ওপরে যা দেখছেন ওর প্রত্যেকটি আমারই রূপান্তরিত অবস্থা। ঐ একধারে যে লেইটা আছে ওটাও। যে আমি একদিন উদার আকাশের তলায় শ্যামল মাঠে সবুজ গমের শীষ ছিলাম, সেই আমি নানা রকম 'মেক-আপ' নিয়ে ওই অত রকম হয়েছি। আমার প্রত্যেক 'মেক-আপ'টাই বাজারে চলছে। এইবার দেখুন—"

দেখিলাম, কেকের সহিত বিস্কুটের মারামারি বাধিয়াছে। সহসা দুইটা কাগজ শূন্য হইতে ভাসিয়া আসিল। দুইটি অদৃশ্য হস্ত কাগজ দুইটিতে খস্ খস্ করিয়া কি যেন লিখিয়া চলিয়াছে। লেখা শেষ হইলে দেখিলাম, দুইটি হস্তই নিজের নিজের কাগজে বেশ করিয়া লেই মাখাইয়া দুই দিকের দেওয়ালে সাঁটিয়া দিল। একটি কাগজে বিস্কুটের জয়গান, আর একটি কাগজে কেকের। আরও দেখিলাম, বিস্কুটের দিকে নিমকি, সিঙাড়া, কচুরি, পরোটা যোগদান করিয়াছে, কেকের দিকে লুচি, রুটি, হালুয়া, খাজা। গজা এবং পাঁউরুটি কোনদিকে যোগদান করে নাই, শান্তির বাণী আওড়াইতেছে, শূন্য হইতে ক্রমাগত কাগজ ভাসিয়া আসিতেছে আর অদৃশ্য হস্ত দুইটি ক্রমাগত লিখিয়া চলিয়াছে। দুই দিকের দেওয়াল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

গমের শীষ বলিল, "সবুজ গমের শীষ বাজারে কেউ চায় না আজকাল। নিছক ছোটগল্পেরও বাজার দর নেই। একটা ছাপ চাই। কি ছাপ নিয়ে আপনার কাছে আসব বলুন।"

"আমি ছাপ চাই না। আমি সবুজ শীষের গল্পটাই শুনতে চাই। তোমার কথা, তোমার ব্যথা, তোমার আনন্দ, তোমার কল্পনা—যা তুমি কাউকে কোনদিন বলনি,—কিন্তু যা তোমার মর্মে অহরহ জাগরূক হয়ে আছে সেইটি আমি চাই—"

"সে যে বড় ছোট হবে। একটি মুহূর্তের ঘটনা—"

"হোক ছোট, তাই বল তুমি—"

গমের শীষ ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার কথা শুনিতে পাইলাম।

"একদিন ভোরে আকাশ থেকে এক ঝলক রাঙা আলো এসে পড়েছিল আমার মুখে। আর ঠিক সেই সময়ে মৃদু একটি হাওয়া এসে দোল দিয়েছিল আমার সর্বাঙ্গে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ফড়িং লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। বিব্রত হয়ে পড়লাম

আমি। একটু পরে যখন সামলে নিলাম তখন দেখি তারা চলে গেছে। সেই রাঙা আলোর ঝলক আর মৃদু হাওয়ার পরশ আর আসেনি আমার জীবনে। আমার সমস্ত 'মেক-আপ'এর মধ্যে এ কথাটি কিন্তু আমি ভুলিনি যে তারা এসেছিল। এখনও আশা ক'রে আছি হয়তো আবার আসবে…

"হ'ল তো? চললুম।"

সুটকেস হাতে লইয়া ছোটগল্প বাহির হইয়া গেল।

উৎসব-দেবতা

স্বপ্ন নাকি সফল হয়েছে, উৎসবের ধুম প'ড়ে গেছে তাই।

বাজছে কাড়া-নাকাড়া, বাজছে জগঝম্প। লাফাতে লাফাতে ঢাকীগুলোর ঊর্ধ্বশ্বাস উঠছে, তবু থামবার উপায় নেই। উৎসব যে, থামলে চলবে না। লাফাতে লাফাতে বাজিয়ে চলেছে তাই ক্রমাগত। থামলেই চাকরি যাবে। বাঁশি-ওলা, সানাই-ওলা, সকলেরই ওই এক দশা।

শব্দ হচ্ছে ভয়ঙ্কর। সাধারণ লোকের কথাবার্তা শোনা যায় না। উৎসবের হট্টগোলে চাপা পড়েছে সব।

উৎসব-দেবতা স্থাপিত হয়েছেন উৎসব-মণ্ডপে। সাড়ম্বরে সজ্জিত করা হয়েছে তাঁকে—বহু বর্ণে, বহু অলঙ্কারে। বহু ঋত্বিক, বহু পুরোহিত, বহু অধ্বর্যু, বহু উদ্গাতা সমবেত হয়েছেন। উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ চলছে, আরতি হচ্ছে নানা ভঙ্গিতে, শঙ্খঘণ্টার রোলে দশদিক প্রকম্পিত হচ্ছে মুহুর্মুহুঃ।

কবি দাঁড়িয়ে ছিলেন নাটমন্দিরের প্রাঙ্গণে উৎসব দেবতার প্রতিমূর্তির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে। তিনি অনুভব করলেন, উৎসব-দেবতা আসেন নি। যাকে ঘিরে কোলাহল চলেছে, তা খড়-মাটি রঙ-রাংতার পিণ্ডমাত্র, উৎসব-দেবতা আবির্ভূত হয় নি ওর মধ্যে।

অভিমান হ'ল কবির। স্বপ্ন সফল হয়েছে, অথচ উৎসব-দেবতা এলেন না কেন? নিজের ঘরে গিয়ে তিনি সেতারে বাজাতে লাগলেন ভৈরবী। ভৈরবীর করুণ-মধুর সুরের পথ ধ'রে গেলেন তিনি উৎসব-দেবতার দ্বারে।

এস এস, কবি এস, তোমারই আশাপথ চেয়ে আছি।

উৎসব-দেবতা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন কবিকে। কবি বললেন, আমাদের উৎসবে গেলেন না কেন আপনি?

ডাক তো আসে নি। কোন সাড়াশব্দও তো পাই নি।

এত ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া বাজছে—

কই, শুনি নি তো!

তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখলেন।

হ্যাঁ, কতকগুলো লোক লম্ফঝম্প করছে বটে, কিন্তু উৎসবের বাজনা তো শোনা যাচ্ছে না!

কবিও এগিয়ে গিয়ে দেখলেন। ঠিকই তো, লাফালাফিটাই দেখা যাছে কেবল, স্বর শোনা যাচ্ছে না।

উৎসব-দেবতা মৃদু হেসে বললেন, আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ এতদূর পর্যন্ত এসে পৌছয় না। ও তোমাদের মণ্ডপেই নিবদ্ধ আছে। উৎসব কিন্তু জমেছে এক জায়গায়। চল, সেইখানে যাই।

কোথায়?

চলই না।

নিমন্ত্রণ পাই নি যে!

এখনই পাবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চারিদিক। একটা অদৃশ্য আনন্দ-সমুদ্র যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

হ'ল তো? কত সহজ সরল ওদের নিমন্ত্রণের ভাষা! চল, যাই।

এই বেশে?

এই বেশে কি যাওয়া যায়! বেশ পরিবর্তন করতে হবে। ওরা যেন বুঝতেও না পারে যে, আমরা গেছি। ওরা নিমন্ত্রণও করেছে অজ্ঞাতসারে, আমরা উৎসবে যোগও দেব ওদের অজ্ঞাতসারে। জানাজানির টানাটানিতে উৎসব যায় মাটি হয়ে।

গলির গলি, তস্য গলি। সেখানে নর্দমার ধারে খেলা জমেছে দুটি শিশুর। ধুলো স্তূপীকৃত ক'রে মন্দির তৈরি করছে তারা। ধুলোর মন্দির ধূলিসাৎ হচ্ছে বার বার। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি জমছে না একটুও, ভেসে যাচ্ছে অনাবিল হাসির তোড়ে। ঠিক তাদের পিছনে নামহীন এক বন্যগুল্মে ফুল ফুটেছে একটি, আর সেই ফুলকে ঘিরে গুঞ্জন ক'রে চলেছে এক মধুকর। গাছের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদের টুকরো এসে পড়েছে তাদের উপর।

স্বাধীনতার জন্ম

ডিমের ভিতরে ভ্রূণ একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বাধীনতার স্বপ্ন। আকাশে উড়িবে। আকাশ কি জানা ছিল না, কিন্তু আকাশের স্বপ্নটা ছিল। আকুলতা ছিল, আগ্রহ ছিল, একটা দুর্দম প্রেরণা সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল অসীম শূন্যে। কিন্তু বাধা দুস্তর। একটা লালার সমুদ্রে সে হাবুডুবু খাইতেছে। সে সমুদ্রও সীমাবদ্ধ। ঊর্ধ্বে নিম্নে দক্ষিণে বামে কঠিন অস্বচ্ছ প্রাচীরের পরিবেষ্টনী। প্রাচীর অতিক্রম করিয়াও স্বাধীনতা নাই। আছে পালকের জঙ্গল। পক্ষীমাতার কুক্ষিগত সে। স্বাধীনতা কোথায়?

সহসা বাহিরের বাতাস যেন তাহাকে স্পর্শ করিল। সহসা যেন সে অনুভব করিল, পক্ষপুটের আবরণ নাই। স্বপ্নের ঘোরেই সে প্রশ্ন করিল, আমি কোথায় আছি?

স্বপ্নের ঘোরেই শুনিল, আমার হাতের উপর।

কে তুমি?

মানুষ।

কোথায় লইয়া চলিয়াছ?

এখনই বুঝিতে পারিবে।

তুমি কি আমাকে স্বাধীনতা দিবে?

নিশ্চয়ই!

যে খোলা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাঙিয়া দিবে?

অচলায়তন ভাঙিয়া ফেলাই তো আমার কাজ।

ঠক ঠক ঠক ঠক……

ভ্রূণের অন্তরে শিহরণ জাগিল। প্রাচীর ভাঙিতেছে।

এ কি—এ কি—কি করিতেছ তুমি?

ফ্যানাইতেছি।

গেলাম—গেলাম—বাঁচাও—বাঁচাও—কি যন্ত্রণা!—তপ্ত কটাহের ফুটন্ত তৈলে ভ্রূণের আর্তনাদ থামিয়া গেল।

জ্রূণ মরিল, কিন্তু স্বপ্ন মরিল না।

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, এ কি করিলে?

ওম্‌লেট।

স্বপ্ন স্তম্ভিত হইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

তাহার পর নীত হইল জ্রূণান্তরে। আবার স্বাধীনতা-স্বর্গ রচনা করিতে লাগিল রূপকথালোকে।

আবার মানুষ আসিল।

কে তুমি?

মানুষ।

আবার স্বাধীনতা দিতে আসিয়াছ?

হাঁ।

তাহার ইচ্ছা হইল, বলে—যাইব না। কিন্তু প্রতিরোধ করিবার শক্তি তো নাই। পক্ষীমাতা সভয়ে সরিয়া গিয়াছে।

মানুষ অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া লইল।

ক্ষীণকণ্ঠে একবার শুধু সে আবেদন জানাইল, এবার আমাকে আর ওমলেট বানাইও না।

যদি ঘি দিয়া ভাজি?

না।

বেশ, ওমলেট বানাইব না।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। ওমলেট না বানাইয়া তরকারি বানাইল।

এইভাবে চলিতে লাগিল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

যুগের পর যুগ কাটিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

ডিমের স্বাধীনতা-প্রয়াস মূর্ত হইল নানারূপে নানা মানুষের প্রতিভায়। বিবিধ পাচক, বিবিধ মসলা, বিবিধ ফোড়ন।

কারি, পোচ, ডেভিল, চপ, দোলমার বিচিত্র সম্ভারে সুসজ্জিত হইল বহুবিধ মহার্ঘ প্লেট দেশে দেশান্তরে।

এ দেশের লোকেরা সুর তুলিল, স্বদেশের ডিমে স্বদেশী খাবার বানাইতে হইবে। তাহাই হইল। ভাতে সিদ্ধ করিয়া, বেসন দিয়া বড়া ভাজিয়া, দেশী

ভালনার মসলা দিয়া প্রস্তুত হইল বহুবিধ স্বদেশী ব্যঞ্জন। কচুসহযোগে একজন রঁাধুনী এমন ডিমের ঘণ্ট করিলেন যে, সকলের তাক লাগিয়া গেল।

তর্ক বাধিয়া গেল। কোন্‌টা ভাল, দেশী না বিদেশী।

তর্ক পরিণত হইল যুদ্ধে।

একটি ঘটনা কিন্তু ঘটিয়া গেল ইতিমধ্যে।

সুউচ্চ শাখায় ক্ষুদ্র একটি নীড়ে পক্ষীমাতার চঞ্চু-আঘাতে ডিমের খোলা ফাটিয়া গেল একদিন। পক্ষীশাবক বাহির হইয়া আসিল। কুৎসিত কদাকার। পালক নাই, রঙ নাই, স্বর নাই, গান নাই। ধনীর প্রাসাদে নয়, অলঙ্কৃত টেবিলে নয়, মহার্ঘ প্লেটের উপরে নয়, অতি-তুচ্ছ খড়-কুটার শয্যায় শুইয়া আছে। আশেপাশে দুলিতেছে কয়েকটা সবুজ ডাল, মাথার উপরে অনন্ত নীলাকাশ। নিতান্ত অসহায়। সর্প, শ্যেন, শিকারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য শত্রু চতুর্দিকে। ও কি বাঁচিবে?

মৃত্যুহীন স্বপ্নের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি, নিশ্চয় বাঁচিবে। ও-ই একদিন আকাশে উড়িবে। উহার মধ্যেই নিহিত আছে গরুড়ের শৌর্য, রাজহংসের মহিমা। উহারি পালকে জাগিবে ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্ভার, উহারই কণ্ঠে ফুটিবে অনবদ্য সঙ্গীত-মাধুরী। এখন কিন্তু কিছুই নাই। আছে কেবল অসংখ্য অভাব, অসহ্য ক্ষুধা, ব্যায়ত আনন। ক্ষুধার তাড়নায় ক্রমাগত হাঁ করিতেছে। পক্ষীমাতা, কোথায় তুমি, খাবার আন, খাবার আন, খাবার খাবার—খাবার—

পক্ষী-পুরাণ

সুবিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার 'পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, কি করিয়া পেঙ্গুইন পাখিরা মনুষ্যে রূপান্তরিত হইল এবং নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের কি পরিণতি ঘটিল। পাখিকে মানুষে পরিণত করিবার জন্য কোনও দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয় নাই। ভগবানের ইচ্ছা হইল—পাখিরা মানুষ হোক, অমনই তাহারা মানুষ হইয়া গেল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গদেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আনাতোল ফ্রাঁস বোধ হয় খবরটি টের পান নাই, পাইলে তাহা নিশ্চয় উক্ত পুস্তকের একটি অধ্যায় বৃদ্ধি করিত।

প্রাচীন আর্যগণ বাংলা দেশের তদানীন্তন অধিবাসীদের পক্ষীজাতি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সুধী-সমাজে এ কথা সুবিদিত। যে কথাটি সুবিদিত নয়, তাহাই আমি বর্ণনা করিতেছি।

পিতামহ ব্রহ্মা একদা নিভৃতে নীরবে মননশক্তি-সহযোগে দেবী সরস্বতীর সহিত নিরুক্ত-আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। সহসা একটা বেসুরা বিকট চীৎকারে আলোচনা বিঘ্নিত হইল। তিনি উঠিয়া আসিয়া একজন দেবদূতকে চীৎকারের কারণ নির্ণয় করিতে আদেশ করিলেন।

দেবদূত একটু পরে আসিয়া শুদ্ধ ভাষায় খবর দিল, কমলযোনি, বঙ্গদেশবাসী পক্ষীকুল কলরব করিতেছে। তাহাদের নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথা শুনিল না।

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো!

পিতামহ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীণাপাণির দিকে তাকাইলেন।

ওদের মানুষ ক'রে দিন। মানুষ হলে ওরা সভ্য হবে।

বীণাপাণি হাসিয়া অনুরোধ করিলেন।

পিতামহ বাংলা দেশের পক্ষীজাতিকে মানুষ করিয়া দিলেন।

মনুষ্যীভূত পক্ষীগুলি কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। পক্ষীরূপে তাহারা মন্দ ছিল না। এদিক ওদিক হইতে খুঁটিয়া আহার করিত, গাছের ডালে রাত কাটাইত, যৌবনকালে মনোমত সঙ্গী বা সঙ্গিনী জুটাইয়া প্রণয় করিত, খড় কুটা সংগ্রহ করিয়া নীড় বাঁধিত, ডিম পাড়িত, ডিমে তা দিত, শাবকগুলি বড় না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের প্রতিপালন করিত, তাহার পর তাহাদের পালক গজাইলে তাহারা উড়িয়া চলিয়া যাইত। সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল তাহাদের। মানুষ হইয়া তাহারা বিপদে পড়িয়া গেল। অত সহজে খাবার, বাসা, সঙ্গী, সঙ্গিনী কিছুই পাওয়া যায় না।

এখন যেমন আমরা কথায় কথায় প্রধান মন্ত্রীর কাছে দৌড়াই, তখন মর্ত্যবাসীরা তেমনই সোজা বিধাতার কাছে দৌড়াইতে পারিত। বিধাতাকে খুব বেশি বিরক্ত করার ফলেই বোধ হয় অধুনা আমরা এই সুবিধাটুকু হারাইয়াছি।

বঙ্গদেশ হইতে কান-ছোট সম্প্রদায়ের দলপতি নিখিল-নব-সৃষ্ট-মনুষ্যজাতির প্রতিনিধিরূপে একদা পিতামহের দরবারে গিয়া হাজির হইলেন। নব-সৃষ্ট মনুষ্য-সমাজও নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কান-ছোট, নাক-লম্বা চুল-কোঁকড়া, চোখ-কটা, চিরুন-দাঁত, নাদা-পেটা প্রভৃতি নানারূপ শ্রেণী-বিভাগ ছিল তাহাদের। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময় কান-ছোট সম্প্রদায়েরই খুব বাড়-বাড়ন্ত।

কান-ছোট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পিতামহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, প্রভো, আমরা মহা অসুবিধায় পড়িয়াছি। পক্ষীরূপে আমরা সুন্দর ছিলাম, মানুষ হইয়া আমাদের কষ্টের অবধি নাই। উপার্জন করিয়া খাইতে হইবে, কিন্তু কি করিয়া উপার্জন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অন্য-প্রদেশবাসীরা শুনিয়াছি ব্যবসায় করে, কিন্তু ধন না থাকিলে ব্যবসায় করা যায় না। আমাদের কিছু ধন দিন।

পিতামহ রেবতী নক্ষত্র-মণ্ডলীতে একটি নব সৌরলোকের পরিকল্পনায় তন্ময় ছিলেন। কল্পনা বাধা পাওয়াতে অষ্ট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্রকর্ণ খর্বকায় ব্যক্তিটির দিকে চাহিলেন। তাহার পর ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেককেই তো ধন দিয়েছি, আবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছ কেন?

প্রতিনিধিটি সভয়ে শুদ্ধ বাংলা বলিতেছিলেন। পিতামহের মুখে চলতি বাংলা শুনিয়া একটু অবাক হইয়া গেলেন। সাহসও পাইলেন।

বলিলেন, কই, আমরা তো কিছুই পাই নি পিতামহ!

আরে, কি আপদ! ধন মানে শক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই প্রচুর শক্তি দিই নি? যাও চ'রে খাওগে, বিরক্ত ক'রো না।

শুধু শক্তিতে কিছু হয় না পিতামহ। মনুষ্য-সমাজে ব্যবসা করতে গেলে মূলধন চাই। কিছু মূলধন দিন আমাদের।

তা হ'লে বিশ্বকর্মার কাছে যাও। বিশু, ও বিশু!—পিতামহের হাঁকাহাঁকিতে বিশ্বকর্মা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উঁকি দিলেন।

আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ, এ কি চাইছে একে দাও, যত সব আপদ জোটে এসে। মূলধন!

বিশ্বকর্মার ইঙ্গিতে প্রতিনিধিটি বিশ্বকর্মার কক্ষে গিয়া উপনীত হইলেন। বিশ্বকর্মা আলতো আলতো ভাবে গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে মনোযোগসহকারে তাঁহার সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত শুনিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, মুশকিল! একে ভাঁড়ারে মাল কম, তার উপর পিতামহ আবার একটা নূতন সৌরলোক নিয়ে মেতেছেন, অহরহ নানা রকম ফরমাশ করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেমন ক'রে হোক মাল যোগান দিতে হচ্ছে। দেখি, বাড়তি যদি কিছু থাকে দিচ্ছি আপনাকে। আপনি বসুন একটু।

বিশ্বকর্মা ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, দেখুন, কিছু রঙ, কিছু বাঁশ, কিছু কাগজ আর খানিকটা আগুন আপনাকে দিতে পারি। এ ছাড়া বাড়তি আর কিছু নেই।

ও-সবে কি আমাদের সমস্যার সমাধান হবে?

আপনারা ব্যবসা করতে চান তো? এর প্রত্যেকটি নিয়ে ব্যবসা করা যাবে। প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারবেন।

কিছু সোনা বা রুপো—

বাড়তি নেই। পিতামহ যদি বলেন, তা হ'লে দিতে পারি। কিন্তু তিনি যে সৌরলোক সৃষ্টি করছেন, তাতে সব রকম ধাতু অজস্র লাগছে। সোনার হিমালয়, রুপোর বিন্ধ্যাচল হচ্ছে সেখানে। পারদ-সমুদ্র হবে না কি। কোনও

রকম ধাতুই তিনি এখন ভাঁড়ার থেকে বাইরে যেতে দেবেন না; সেদিন স্বয়ং পার্বতীর এক জোড়া দুলের জন্যে স্বয়ং মহাদেব কিছু সোনা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, দিলেন না।

তবু চেয়ে দেখব?

দেখতে পারেন।

আলতো আলতো ভাবে গোঁফে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রতিনিধিটি ব্রহ্মার ঘরে গিয়ে দেখিলেন, চতুরানন নিমীলিত-নয়নে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে আর সাহস করিলেন না। বিশ্বকর্মা-প্রদত্ত রঙ, বাঁশ, কাগজ এবং আগুন লইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পর বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে।

সহসা পিতামহের একদিন খেয়াল হইল, বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁ হে বিশু, বাংলা দেশ থেকে সেই যে এক ছোকরা মূলধন চাইতে এসেছিল, তাকে কিছু দিয়েছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল ভাল জিনিসই দিয়েছিলাম। রঙ, বাঁশ, কাগজ আর আগুন। এর যে-কোনও একটা দিয়েই তারা বিশাল ব্যবসা করতে পারে।

নিশ্চয়ই, এত দিনে বোধ হয় ফেঁপে উঠেছে সব। উঁকি মেরে দেখ তো, কি তাদের অবস্থাটা।

বিশ্বকর্মা স্বর্গের বাতায়ন হইতে ঝুঁকিয়া বঙ্গদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখতে পাচ্ছ কিছু? খুব ধুমধাম বোধ হয়? অমন চারটে জিনিস নিয়ে গেছে, বড় বড় বাড়ি হাঁকড়েছে নিশ্চয়?

আজ্ঞে না, বাড়ি-টাড়ি তো তেমন দেখছি না।

কি দেখছ তা হ'লে? জিনিস চারটে নিয়ে কি করলে তা হ'লে ওরা?

ফানুস বানিয়েছে বোধ হয়।

ফানুস?

রঙ-বেরঙের ফানুসই তো উড়ছে দেখছি।

বল কি!

উপকরণ-সংগ্রহ (১)

আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে পুষ্টকান্তি গদাধর বলিলেন, "আইস ভাই রামতনু, এবার আমরা সাহিত্য-চর্চা করি।"

ক্ষীণকায় রামতনু মিটমিট করিয়া চাহিয়া উত্তর দিলেন, "কেন, রাজনীতি কি ছাড়িয়া দিবে?"

"দিব। কারণ, গলার জোর, পয়সার জোর কোনটাই নাই। ওপথে যাওয়াই আমাদের ভুল হইয়াছিল।"

রামতনু হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশিটি হইতে সন্তর্পণে একটু নস্য ঢালিয়া ছোট একটি টিপ দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মনোনিবেশ সহকারে সেটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"কোন জবাব দিতেছ না যে?"

"ভাবিতেছি"

নস্যের টিপটির প্রতি আর একবার চাহিলেন।

"কি ভাবিতেছ বল না"

"ভাবিতেছি, সাহিত্য-চর্চাও কি আমরা পারিয়া উঠিব? শুনিয়াছি এসব ব্যাপারে প্রতিভার প্রয়োজন। আমাদের কি তাহা আছে? রাজনীতিতে যেমন গলার জোর, পয়সার জোর চাই, এসব ব্যাপারে তেমনি কল্পনার জোর চাই"

সূক্ষ্মভাবে আলগোছে নস্য লইতে লাগিলেন।

উত্তেজিত গদাধর উত্তর দিলেন—"আমি কাল্পনিক সাহিত্য-চর্চা করিব না। ওসব সাহিত্যের দিন গিয়াছে। আমি প্রত্যক্ষ সাহিত্য-চর্চা করিতে চাই। যাহাদের দিকে ভাল করিয়া কেহ চাহিয়া দেখে নাই তাহাদের আমরা দেখিব, যাহাদের কথা ভাল করিয়া কেহ শোনে নাই তাহাদের কথা আমরা শুনিয়া পাঁচজনকে শুনাইব—"

"কাহাদের কথা?"

"যাহারা বড়লোক নয়, যাহাদের মোটর গাড়ি নাই, যাহারা চকচকে জামাকাপড় পরিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় না, যাহারা মাঠে ধান কাটে, বাজারে মোট বয়, বাড়িতে বাসন মাজে—"

"ও! তুমি গণ-সাহিত্যের কথা বলিতেছ? বেশ তো। কি করিবে ঠিক করিয়াছ?"

রামতনুর উৎসাহ-অগ্নি সহসা যেন প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

"উহাদের সত্য পরিচয়, উহাদের জীবনধারার খুঁটিনাটি প্রথমে জানিতে হইবে। প্রথমে উপকরণ-সংগ্রহ করা দরকার। ওঠ, বাহির হইয়া পড়ি"

"এখনই?"

"হ্যাঁ, শুভস্য শীঘ্রম্"

"বেশ, চল"

রামতনু সজোরে নস্যর টিপটি নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া চক্ষু আরক্ত করিয়া ফেলিলেন, গদাধর ধরাইলেন একটি মোটা সিগার।

"একটি খাতা আর পেন্সিল লওয়া দরকার"

"কেন!"

"যাহা দেখিব সঙ্গে সঙ্গে টুকিয়া ফেলিব"

"হাঁ হাঁ, ঠিক। লও—"

"কিছু খাবার সঙ্গে লইলে কেমন হয়"

"উত্তম হয়। কতক্ষণ ঘুরিতে হইবে স্থিরতা নাই"

"চিঁড়া আছে। কিছু গুড়ও লইতে পারি"

"খাসা হইবে"

দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িলেন।

গদাধর ঈষৎ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রখর রৌদ্র। মেঠো পথ। সহসা তিনি ভিন্নমুখী হইয়া যদু মিত্রের প্রাচীর পরিবৃত বাগান-বাড়ির দিকে সবেগে পদচালনা করিতে লাগিলেন।

রামতনু: ওদিকে যাইতেছ কেন?

গদাধর: ওই দেয়ালটার পাশে একটু ছায়া আছে। আইস প্রথমে একটু বিশ্রাম করিয়া লই। ভাই রামতনু, এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু তো চোখে পড়িল না।

রামতনু: পড়িবে, ব্যস্ত হইও না। জিরাইয়া লইতে চাও, লও।

উভয়ে গিয়া প্রাচীর-সন্নিহিত ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

গদাধর: খাওয়াটা শেষ করিয়া লইবে কি ?

রামতনু: [সবিস্ময়ে] ইহার মধ্যেই ক্ষুধা পাইয়া গেল ? একটু আগেই তো একতাল হালুয়া খাইয়া আসিয়াছ।

গদাধর: [কান চুলকাইয়া] না, ক্ষুধা পায় নাই, কাজটা সারিয়া রাখিব ভাবিতেছিলাম

রামতনু গদাধরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই গদাধর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারিলেন না, সন্তর্পণে ঘাড় ফিরাইয়া আড়চোখে রামতনুর দিকে আবার চাহিলেন। রামতনুকে তাঁহার বড় ভয়। কথায় কথায় মাথা খোঁড়ে, আত্মহত্যা করিতে যায়। রামতনুকে না হইলে তাঁহার চলেও না। বাল্যবন্ধু এবং অক্লান্তকর্মী। রামতনুর মুখের দিকে চাহিয়া গদাধর দেখিলেন তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছেন।

গদাধর: ভাই রামতনু, ক্ষমা কর, আহার-প্রসঙ্গ আর তুলিব না।

রামতনু: চুপ, চুপ, শুনিতে পাইতেছ না ?

গদাধর ঘাড় কাৎ করিয়া উৎকর্ণ হইলেন এবং শুনিতে পাইলেন, নারীকণ্ঠের চাপা ক্রন্দন।

গদাধর: [আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে] ভাই রামতনু, আর তো বসিয়া থাকা যায় না। চল, ওঠ, কারণ-নির্ণয় করি।

রামতনু: চল। কিন্তু সাবধানে যাইতে হইবে। তাড়াহুড়া করিও না। আস্তে আস্তে হাঁট। তোমার পামসু বড় বেশি মসমস শব্দ করিতেছে।

দেওয়ালের ওপাশ হইতে ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। দেওয়ালের ধারে ধারে গুঁড়ি মারিয়া উভয়ে অগ্রসর হইতে গেলেন। কিছুদূরে গিয়া দেওয়ালটা বাঁকিয়া গিয়াছিল। সেই বাঁকের মুখে দাঁড়াইয়া উভয় বন্ধু উঁকি দিয়া দেখিলেন একটি ফরসাগোছের লোক উবু হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহার পাশে একটি কৃশাঙ্গিনী নারী শতছিন্ন মলিন আঁচলে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। সম্মুখে একটি ছোট শিশু খেলা করিতেছে।

রামতনু: [নিম্নকণ্ঠে] তুমি এখানে বস। আমি ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিয়া আসি।

গদাধর: [আবেগরুদ্ধ স্বরে] বোধ হয় কোনও জমিদার উহাদের উচ্ছেদ করিয়া গৃহহারা করিয়াছে।

রামতনু: অনুসন্ধান করিলেই বোঝা যাইবে।

রামতনু খুর্ খুর্ করিয়া চলিয়া গেলেন। গদাধর সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া নিজের ঝাঁকড়া-গোঁফে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ভাবাধিক্য হইলে গদাধর এইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজেকে তিনি আর সংযত করিতে পারিলেন না। খাতা পেন্সিল বাহির করিয়া লিখিতে শুরু করিয়া দিলেন।

"আজ দেখিলাম মিত্রদের বাগান-বাড়ির দেওয়ালের পাশে জনৈক শ্রমিক এবং জনৈকা শ্রমিকা বসিয়া আছে। শ্রমিকের চোখের দৃষ্টি অসহায়, শ্রমিকা কাঁদিতেছে। আহা, বোধ হয় উহারা ধনিক-সম্প্রদায় কর্তৃক অত্যাচারিত। বন্ধুবর রামতনু অনুসন্ধান করিতে গিয়াছে।..."

এই পর্যন্ত লিখিয়া গদাধরের চিন্তাধারা ভিন্নপথ ধরিল। সহসা ব্যাগ হইতে চিঁড়া বাহির করিয়া চট করিয়া একমুঠা মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং হাঁটু দোলাইয়া দোলাইয়া চিবাইতে লাগিলেন।

রামতনু ফিরিলেন মিনিট দশেক পরে।

গদাধর: কি, ব্যাপার কি?

রামতনু: বলিতেছি, শোন। যে লোকটি উবু হইয়া বসিয়া আছে তাহার নাম ভগ্‌গু। ভগবানের অপভ্রংশ সম্ভবতঃ। স্ত্রীলোকটির নাম বুধিয়া। বুধিয়াকে ভগ্‌গু তিন বৎসর পূর্বে 'চুমানা' অর্থাৎ 'নিকে' করিয়াছে। ভগ্‌গুর প্রথমা স্ত্রী বর্তমান। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় ভগ্‌গু বুধিয়াকে জীবনের দ্বিতীয়া সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভগ্‌গু বলিতেছে, প্রথমা স্ত্রী তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ওই যে ছোট মেয়েটি দেখিতেছ ওটি ভগ্‌গুর সন্তান নয়—ইহার গর্ভেও ভগ্‌গুর কোনও সন্তানাদি হয় নাই। এ মেয়েটি বুধিয়ার প্রথম স্বামীর। প্রথম স্বামীকে বুধিয়া ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কেন ত্যাগ করিয়াছে তাহা কিছুতেই বলিল না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলাম। কাল বুধিয়া মাঠে কাজ করিয়া নিজের মজুরি হইতে কিছু শকরকন্দ আলু কিনিয়া আনে। রাত্রে কয়েকটা খাইয়া বাকিগুলি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল সকালে খাইবে বলিয়া। সকালে উঠিয়া দেখে একটিও নাই।

ভগ্‌গুও নাই। বুধিয়ার সন্দেহ হইল তাহার সতীনই নিশ্চয় আলুগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু সতীনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভয়াবহ। সতীন (বুধিয়া উচ্চারণ করিতেছিল সৌতিন) তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঠাস ঠাস করিয়া তাহাকে চড়াইতে থাকে। বুধিয়া তাহার পেটে কামড়াইয়া না ধরিলে বোধ হয় চড়াইতে চড়াইতে মারিয়াই ফেলিত। চুলের ঝুঁটি ছাড়িয়া দিতেই বুধিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসে। তাহার শিশু কন্যাটিও তাহার পিছন পিছন দৌড়াইতে থাকে। পথের মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ভগ্‌গুর সহিত বুধিয়ার দেখা হইয়া গিয়াছে। বুধিয়া বলিতেছে—'আমার দুই চক্ষু আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে আমি সেইখানেই যাইব।' ভগ্‌গু বলিতেছে—'আমিও যাইব।' বুধিয়া ঝঙ্কার দিয়া যখন বলিল—'তোমার বড় বউ আমার শকরকন্দ কেন খাইবে?'

ভগ্‌গু উত্তর দিল—'বড় বউ খায় নাই, আমি খাইয়াছি। ক্ষুধার তাড়নায় ভোরেই ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়াই শকরকন্দগুলি দেখিতে পাইলাম। খাইয়া কাজ খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু কিছুই যোগাড় করিতে পারি নাই।'

ইহা শুনিয়া বুধিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। এই হইল ঘটনা, অবশ্য উহাদের মুখ হইতে যতটা শুনিলাম। তুমি কিছু লিখিয়াছ নাকি। না শুনিয়াই কি লিখিলে?

রামতনু খাতাটি তুলিয়া গদাধরের লেখাটুকু পড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন—"শ্রমিক শব্দটা কাটিয়া দাও। ভগ্‌গু শ্রমিক নয়।"

"কি তবে?"

"বাদশা"

"বল কি!"

"হ্যাঁ, কুঁড়ের বাদশা। দুইটা বিবাহ করিয়াছে এবং দুই স্ত্রীর উপার্জনে বসিয়া বসিয়া খায়। কুটাটি পর্যন্ত নাড়ে না।"

"তবু উহাকে আমি শ্রমিক বলিব। ওই ধরনের দুইটি স্ত্রীকে সামলানো কম শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়।"

গদাধর প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভগ্‌গুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। রামতনু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন গদাধরের উদ্ভাসিত মুখের উপর।

উপকরণ-সংগ্রহ (২)

কিশোর বালকেরা অনেক সময় বাড়িতে যেভাবে লেখে গদাধরও তাহাই করিতেছিলেন। একটি চৌকিতে উপুড় হইয়া শুইয়া উত্থিত বাম হস্তের উপর মুণ্ড-ভার রক্ষা করতঃ আপন মনে তন্ময় হইয়া লিখিয়া চলিয়াছিলেন। পদদ্বয় মধ্যে মধ্যে লম্বাকারে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কখনও বাঁকিয়া পৃষ্ঠচুম্বনের প্রয়াস পাইতেছিল, কখনও চৌকিতে শায়িত হইতেছিল। ডাক্তারবাবুর বাড়ির ঝি দুখিয়া সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন।

—"দুখিয়া অতিশয় নোংরা। সর্বদা ময়লা কাপড় পরিয়া থাকে। মাথার চুল রুক্ষ। গায়ে যে কুর্তাটি আছে সেটিও ময়লা—যদিও ছিটটি শৌখিন। মুখ বোধ হয় ভাল করিয়া ধোয় না। দাঁতগুলি হলুদ রঙের, চোখে সর্বদাই পিচুটি লাগিয়া আছে। কিছুদিন হইল তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে। গোলগাল নাদুসনুদুস শিশুটি। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে রূপের অভাব ঢাকিয়া গিয়াছে। গোল গোল চোখ দুইটি সর্বদাই যেন সবিস্ময়ে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। নাক নাই বলিলেই হয়। নাকের ছিদ্র দুটিই শুধু দেখা যায়, তাহাও সর্দিতে বোজা। হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয়। দুখিয়া কাজ করে আর দুখিয়ার বোন রুকমিনিয়া সেটাকে টাঙাইয়া লইয়া বেড়ায়। দুখিয়া যেখানে বসিয়া বাসন মাজে সেইখানেই ধুলার উপর মেয়েটাকে শোয়াইয়া দেয়। মেয়েটাও বেশ শুইয়া থাকে, বাসন মাজিতে মাজিতে দুখিয়া তাহার সহিত কথা কয়, তাহাতেই সে মহাখুশি। হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করে এবং ওং ওং বলিয়া মায়ের কথার জবাব দেয়। ক্ষুধা পাইলে কাঁদে। তখন দুখিয়া তাহাকে ময়লা হাতেই দুই কনুই ও বাহুর সাহায্যে বুকে তুলিয়া লইয়া দুধ খাওয়ায়। মেয়েটি বড়ই নোংরা। হাত ধুইয়া ছেলেকে লইলেই পারে। দুখিয়ার স্বামী রংলাল, দেহাত ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে। কারণ তাহার স্ত্রী (অর্থাৎ দুখিয়া) শহর ছাড়িয়া দেহাতে যাইতে রাজী নয়, অথচ দেহাতে তাহাদের কয়েক বিঘা জমি আছে। দুখিয়ার আর এক ভগ্নী সুখিয়ার বিবাহ হইয়াছে দুখিয়ারই ভাসুর চমকলালের সহিত। চমকলাল সুখিয়াকে লইয়া দেহাতেই থাকে। কিন্তু দুখিয়া বলে সুখিয়া সুখে নাই। স্বামীটি 'মারখুনডা', শাশুড়ী 'খান্‌ডারনী'। উহার উপর আছে 'জাড়াইয়া বোথার' এবং

পেটের অসুখ। কিছুদিন পূর্বে সুখিয়া ছেলে হইবার জন্য আসিয়াছিল। ছেলেটা বাঁচিল না, আঁতুড়েই মারা গেল। সুখিয়াও যায় যায় হইয়াছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার শরীর সারিতে না সারিতেই মহিষের শিঙের মত গোঁফ উঁচাইয়া লাঠি ঘাড়ে চমকলাল আসিয়া হাজির হইল এবং সুখিয়াকে লইয়া গেল। সুখিয়ার দুরবস্থা দেখিয়া দুখিয়া সাবধান হইয়াছে। সে আর দেহাতে যাইবে না। স্ত্রৈণ রংলালও স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া শহরে আসাতে দুখিয়ার সুবিধাই হইয়াছে। কিন্তু একটু মুশকিলও হইয়াছে। জামাই স্কন্ধারূঢ় হওয়াতে দুখিয়ার মা একটু ঘ্যানঘ্যান শুরু করিয়াছে। রংলাল একটু বাবু প্রকৃতির লোক, প্রায়ই দেখা যায় সে একটি ফরসা ফতুয়া গায়ে দিয়া গুজরাটি কন্ট্রাক্টারবাবুর মোটর ড্রাইভারটির সহিত গল্প করিতেছে। শ্রমসাধ্য কাজে বড় ভিড়িতে চায় না। কোদালপাড়া, মোট-বওয়া, রিক্সা টানা, রাজমিস্ত্রির সহিত জন-খাটা এসব করিতে পারিলে শহরে কাজের অভাব হয় না। কিন্তু রংলাল সে সব করিবে না। একটা মাড়োয়ারির রঙের কারখানায় দিনকতক ছাপার কাজ করিয়াছিল। কিন্তু বেশিদিন সেখানে টিকিতে পারিল না। বড় খাটুনি। তাছাড়া সর্বাঙ্গে রং লাগিয়া যায়। আজকাল মাড়োয়ারিরা গঙ্গার ধারে যজ্ঞ করাইতেছে, সেখানে তাহারা একটা জলসত্র খুলিয়াছে। রংলাল তাহাতেই ছোলা গুড় এবং জল বিতরণের চাকরি করিতেছে। দৈনিক দেড়টাকা মজুরি, তাহার উপর খাইতে পায়। কাজটি রংলালের মনোমত। বেশি পরিশ্রম নাই। তৃষ্ণার্ত ভিখারীদের উপর একটু আধটু 'তম্বি' করিবার সুযোগ আছে। যজ্ঞ কিন্তু অনন্তকাল চলিবে না। তখন যে রংলাল কি করিবে তাহা ভাবিয়া দুখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। মায়ের বাক্যবাণ ক্রমশ যেরূপ তীক্ষ্ণ হইয়া আসিতেছে তাহাতে বেকার রংলাল বেশিদিন যে শ্বশুরবাড়িতে থাকিতে পারিবে তাহা মনে হয় না—

গদাধর এই পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন এমন সময় রামতনু প্রবেশ করিলেন।

রামতনু। আজ বাহির হইবে না ?

গদাধর। নিশ্চয় হইব।

রামতনু। কি লিখিতেছিলে ?

গদাধর। কাল দুখিয়ার সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা লিখিয়া ফেলিলাম।

রামতনু তীব্র দৃষ্টিতে গদাধরের দিকে চাহিলেন।

রামতনু। এতক্ষণে লিখিলে? কালই সন্ধ্যায় লিখিয়া শেষ করা উচিত ছিল। কাল সন্ধ্যায় কি করিতেছিলে?

গদাধর। [কাচুমাচু] একজায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল, তাহাই রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। [সহসা উৎফুল্ল] বেশ ভাল খাওয়াইল।

রামতনু। খাওয়া কমাও, নতুবা বিপদে পড়িবে।

অপ্রতিভ গদাধর উঠিয়া পড়িলেন এবং রামতনুর দিকে পিছন ফিরিয়া জামা পরিতে লাগিলেন।

গদাধর। আজ কোন্ দিকে যাইবে?

রামতনু। নাক-বসা ভজুয়ার বাড়ির দিকে।

গদাধর। [উল্লসিত] ও! সে একজন আসল শ্রমিক। যে আগে তোমার বাড়ির চাকর ছিল সেই তো? এখন চানাচুর ফেরি করিয়া বেড়ায়?

রামতনু। হ্যাঁ সেই। সেই শ্রমিক ভজুয়ার অন্তঃপুর পরিদর্শন করিব মনস্থ করিয়াছি। ভিতরের খবর ঠিকমতো জানিতে হইলে অন্তঃপুর পরিদর্শন করা প্রয়োজন।

গদাধর। [বিস্মিত] তাহা কি করিয়া সম্ভব? সে তোমাকে অন্তঃপুরে ঢুকিতে দিবে কেন! দিলেও সব সামলাইয়া সুমলাইয়া ফেলিবে, তাহাদের স্বরূপ জানিতে পারিবে না।

রামতনু। চল না, সমস্ত ভাবিয়া রাখিয়াছি।

উভয়ে ভজুয়ার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া রামতনু গদাধরকে থামিতে বলিলেন। তাহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে বলিলেন। আঁদাড় পাঁদাড় ভাঙিয়া অবশেষে ভজুয়ার বাড়ির পিছন দিকে একটি গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন উভয়ে। গাছটি বিশাল এবং শাখাপত্রবহুল।

রামতনু। গাছে উঠিতে হইবে।

গদাধর। এই গাছে? বল কি?

রামতনু। [দৃঢ়কণ্ঠে] হাঁ।

গদাধর। আমি ভাই পারিব না।

রামতনু কঠোরদৃষ্টিতে একবার তাহার স্ফীতোদরের দিকে চাহিলেন। আড়চোখে রামতনুর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া গদাধরকে মুখ অন্য দিকে ফিরাইতে হইল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি ধীরে ধীরে গোঁফে আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

রামতনু। বেশ, আমিই উঠিব, তুমি গাছের নীচেই বসিয়া থাক।

রামতনু ক্ষিপ্রতা সহকারে মালকোচা মারিয়া গাছে উঠিয়া পড়িলেন এবং অবলীলাক্রমে শাখা হইতে শাখান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিস্মিত গদাধর কিছুক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে একটি বসিবার স্থান নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসা যাইবে না। গুঁড়িটি কুম্ভীর পৃষ্ঠের মতো অমসৃণ। গাছের ঠিক নীচে বসিবার উপায় নাই। টিনের কৌটা, ভাঙা শিশি, ভাঙা হাঁড়ি, কাঁটা গাছ প্রভৃতিতে স্থানটি পরিপূর্ণ! গদাধর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, নিকটেই আর একটি বাড়ির দেওয়ালের নীচে সবুজঘাসে ঢাকা একটি চমৎকার স্থান রহিয়াছে। ত্বরিতপদে সেখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। আরাম করিয়া সিগারেটটি ধরাইবেন এমন সময় মাথার উপর আচম্বিতে খানিকটা আবর্জনাবৃষ্টি হইয়া গেল। গদাধর ঘাড় ফিরাইয়া বুঝিলেন দেওয়ালের ওপার হইতে নিশ্চয় কেহ ফেলিয়াছে। উঠিয়া গা-মাথা ঝাড়িতেছেন এমন সময় রামতনুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—গদাধর, তুমি কোথায় গেলে—।

গদাধর দ্রুতপদে বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দেখিলেন রামতনু শূন্যে ঝুলিতেছেন। তাঁহার কাছা একটা ডালে আটকাইয়া গিয়াছে। সহসা গদাধরের দেহে ও মনে অপ্রত্যাশিত শক্তি সঞ্চারিত হইল। জীবন তুচ্ছ করিয়া তিনি গাছে উঠিয়া পড়িলেন।

রামতনু। [ঝুলিতে ঝুলিতে] তোমার মাথায় ছাই কেন?

গদাধর। দেওয়ালের ধারে বসিয়াছিলাম। দেওয়ালের ওপার হইতে কেহ ফেলিয়া থাকিবে।

রামতনু। তোমাকে গাছের তলায় বসিতে বলিয়াছিলাম।

গদাধর। তোমার এমন অবস্থা কি করিয়া হইল তাহাই আগে বল।

রামতনু। ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম। কাছা ডালে আটকাইয়া যাওয়াতে রক্ষা পাইয়াছি।

গদাধর। ঘাড়ে ভর দাও, আমি ডালটা ছাড়াই।

গদাধর সন্তর্পণে রামতনুকে গাছ হইতে নামাইয়া আনিলেন।

গদাধর। কি দেখিলে বল, টুকিয়া লই।

রামতনু। একটি জাঁতা, একটি উনুন, একটি উদুখল চোখে পড়িল। উনুনটি গোবরমাটি দিয়া নিকানো। একটি ছাগী আছে, তাহার দুইটি বাচ্চা হইয়াছে। একটি কালো, একটি বাদামী। আঙিনার একধারে রহিয়াছে ক্ষারসিদ্ধ কাপড়ের স্তূপ আর একধারে ভজুয়ার বড় মেয়ে লছমী সেজ মেয়ে হিরিয়ার মাথার উকুন বাছিতেছে। ভজুয়া কিংবা তাহার স্ত্রী বাড়িতে নাই। ইহার বেশি আর লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইলাম না। কারণ ঠিক ইহার পরেই যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহাতেই ধৈর্য হারাইলাম, মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। দ্রুতপদে নামিতে গিয়া পায়ের নীচের ডালটি ভাঙিল।

গদাধর। সে বস্তুটি কি?

রামতনু। গাড়ু। আমার গাড়ুটি হারাইয়াছিল, স্পষ্ট দেখিলাম তাহা ভজুয়ার ঘরের কোণে রহিয়াছে। আমি পুলিসে খবর দিব।

গদাধর। [আবেগকম্পিত কণ্ঠে] ভাই রামতনু, ও কাজ করিও না ভজুয়া বড় দুঃখী। একে অশিক্ষিত, তাহার উপর অভাবগ্রস্ত। শিক্ষিত ধনীরা দুই হাতে ডাকাতি করিতেছে, তাহাদের যদি ধরিতে পার পুলিসে খবর দিও। দুঃস্থ ভজুয়াকে কিছু বলিও না।

রামতনু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্তও বিগলিত হইতে লাগিল।

উপকরণ-সংগ্রহ (৩)

প্রতিবেশী মাণিক ভাদুড়ীর কাহিনী শুনিয়া রামতনু অদূরে উপবিষ্ট গদাধরের দিকে তাকাইলেন। পাড়ার সমস্ত চাকর পলাইয়াছে। এত বক্তৃতা সমস্ত ব্যর্থ হইল। নির্বাক গদাধরের নয়নযুগলে যে ভাষা জলজল করিতেছিল তাহা উত্তেজিত রামতনুর অন্তরকে উত্তপ্ততর করিল মাত্র।

মাণিক চলিয়া যাইবামাত্র তিনি বলিলেন—"আমি মাথা খুঁড়িব!"

ভাগ্যে তিনি গদাধরের বিছানায় বসিয়া ছিলেন। নিকটেই যে তাকিয়াটা ছিল তাহার উপরেই তিনি মাথা খুঁড়িতে শুরু করিয়া দিলেন। নিমেষে গদাধরের জলমান চক্ষু শঙ্কাতুর হইয়া উঠিল, তিনি ছুটিয়া গিয়া রামতনুকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল রামতনুর মাথা যদিও ফাটিবে না, কিন্তু এই বাজারে তাকিয়া ফাটাও তো কম শোচনীয় ব্যাপার নয়।

রামতনু। না, আমাকে বাধা দিও না। আমি—

গদাধর। হঠকারিতা করিও না। এই বাজারে তোমার মাথা কিংবা আমার তাকিয়া কোনটাই তুচ্ছ করিবার মতো বস্তু নয়। আমার কথা শোন, যুক্তিযুক্ত কথাই বলিব—

রামতনু। বল।

গদাধর। তোমার ক্ষোভের কারণ আছে তাহা স্বীকার করিতেছি। নবাগত ঘুষখোর দারোগাটার বিরুদ্ধে সেদিন চাকরদের আড্ডায় গিয়া যে বক্তৃতাটা দিয়াছিলে তাহা খুবই ওজস্বিনী হইয়াছিল একথাও আমি মানি এবং সেই দারোগাটা 'তু' করিয়া ডাকিবামাত্র এত বক্তৃতাসত্ত্বেও তোমার, মাণিকবাবুর এবং পাড়ার প্রায় সকলেরই চাকর সেই দারোগাটার কাজ করিবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে চলিয়া গেল এ ঘটনাও খুব হৃদয়বিদারক তাহাতে সন্দেহ নাই, কেবল একটি বিষয়ে তোমাকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

রামতনু। কি বিষয়ে বল?

গদাধর। দেখ, আমাদের উদ্দেশ্য উপকরণ সংগ্রহ করা, উপকরণ দেখিয়া বিচলিত হওয়া নয়। বৈজ্ঞানিকের মতো নিষ্কাম নিষ্ঠাভরে ...

রামতনু। তুমি কদলী অথবা কচু খাও।

অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা পাওয়াতে গদাধরের চক্ষু দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবার মতো হইল। রামতনু দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন।

গদাধর। কদলী বা কচু! খাইব!!

রামতনু। কি করা উচিত সহজ কথায় সেটা বলিতে পারো না রাকোস, কেবল কথার মারপ্যাঁচ কসিতেছ!

রামতনু মাঝে মাঝে গদাধরকে রাকোস (রাক্ষস) বলেন, সম্ভবত তাহার ভোজনপটুতার জন্য।

গদাধর। [অপ্রতিভ] মানে, আমি বলিতেছিলাম—

রামতনু। সংক্ষেপে সহজ ভাষায় বল এখন কি করা উচিত।

গদাধর। যেখানে আমাদের চাকরেরা গিয়েছে সেইখানে যাওয়া উচিত।

রামতনু। থানায়?

গদাধর। তোমার বক্তৃতা শুনিলে দারোগা হয়তো—

রামতনু। বেশ চল।

রামতনু যুক্তির দাস। অবিলম্বে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দুই

পদব্রজে দুইক্রোশ দূরবর্তী থানায় যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পদদ্বয় ধূলি-ধূসরিত, দেহ অবসন্ন, অন্তর তৃষ্ণা-পিপাসাকাতর। রামতনুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, গদাধরের ভ্রূক্ষেপ করিবার সাহস নাই। আর একটা ব্যাপারেও উভয়েই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এটা থানা কিনা তাহাই তাঁহারা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। মনে হইতেছিল যেন জমিদারের কাছারি। কানে কলম গুঁজিয়া বারান্দায় সারি সারি যাঁহারা খেরোর খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের গোমস্তা বলিয়া মনে হয়। পুলিস কর্মচারীর এরূপ মূর্তি কল্পনা করা শক্ত। সম্মুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গণটা বহুলোক মিলিয়া পরিষ্কার করিতেছে। প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা খাটাইবারও আয়োজন চলিতেছে। থানার সহিত কোনও সাদৃশ্যই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল যেন কোন জমিদার-বাড়িতে বৃহৎ একটা উৎসবের আয়োজন চলিতেছে।

থানার কোন চিহ্ন নাই। অথচ সকলেই বলিতেছে এইটাই না কি থানা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উভয়ে উভয়ের বহুবার দৃষ্ট মুখচ্ছবি পুনরায় অবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময় সমবেতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"সেলাম হুজুর।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন ভগ্‌গু, ফৈজু, চমকলাল, ছেদি, ছক্কু, বানার্সি অর্থাৎ পাড়ার সমস্ত পলাতক ভৃত্য সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিতেছে।

রামতনু ভাঙা হিন্দিতে রুক্ষকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন তাহারা এমনভাবে একযোগে পলাইয়া আসিল কেন।

ছেদি (মাণিক ভাদুড়ীর চাকর) শুদ্ধ-হিন্দিতে সবিনয়ে যে উত্তর দিল তাহার সংযত বাংলা অনুবাদ করিলেও দাঁড়াইয়া যায়—"পালাইয়া আসিব কেন হুজুর, কোন পাপ তো করি নাই। এখানে দৈনিক তিনটাকা মজুরি এবং একবেলা খাওয়া পাইতেছি, আসিব না কেন?"

ছেদিকে সরাইয়া দিয়া রামতনুর পুরাতন ভৃত্য নাক-বসা ফৈজু আগাইয়া আসিল। তাঁহার সহিত রামতনু নিম্নলিখিতরূপে আলাপ করিলেন।

রামতনু। তোমাদের কি কাজ করিতে হয়?

ফৈজু। থানার হাতা পরিষ্কার।

রামতনু। এ কাজে তোমাদের কে বাহাল করিয়াছেন?

ফৈজু। দারোগাবাবু নিজে।

রামতনু। এতগুলি লোককে তিনিই মজুরি দিতেছেন?

ফৈজু। হাঁ, হুজুর।

রামতনু। তিনি কোথায়?

ফৈজু। ভিতরে আছেন। না, না, ওই যে আসিতেছেন।

—ভৃত্যের দল নিমেষের মধ্যে সরিয়া গিয়া স্ব স্ব কর্মে মনোনিবেশ করিল। দারোগা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। বিশাল বপু, বিশাল গোঁফ। তিনি আসিয়াই যাহা করিলেন তাহা আরও চমকপ্রদ। গদাধরের দিকে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া সোচ্ছ্বাসে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "একি, পণ্ডিত মহাশয়, আপনি এখানে কি করে এলেন—?"

গদাধরের উদীয়মান ক্রোধ আচমকা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হওয়াতে তাঁহার বাকরোধ হইল। শুধু তাই নয়, অতীত জীবনের কয়েকটি আলেখ্যও দ্রুতভাবে

মানসপটে প্রকট হইয়া পড়াতে তিনি রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রথম যৌবনে মালদহ জেলায় একটি গ্রামে যখন তিনি মাইনর স্কুলে হেড-পণ্ডিতি করিতেন তখন এই রাম-বনস্পতি পাণ্ডে তাঁহার ছাত্র ছিল। সে-ই দারোগা হইয়াছে। এত বড় গোঁফ তাঁহার। ব্যাকুল গদাধরকে ব্যাকুলতর করিয়া রাম-বনস্পতি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহার পর যে সব আলোচনা অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়ে সে সবও আসিয়া পড়িল।

রামতনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া হঠাৎ তিনি দারোগাকে বলিলেন, "আপনার সহিত আমাদের কয়েকটি কথা আছে। আপনি যখন গদাধরের ছাত্র তখন আমারও ছাত্রস্থানীয়, আশা করি আমার প্রশ্নগুলির সরল উত্তর দিবেন।"

দারোগা। [স-সম্ভ্রমে] নিশ্চয় দিব। আগে হাত-পা ধুন, আহারাদি করুন, বিশ্রাম করুন, তাহার পর—

রামতনু। কথা না বলিয়া কিছুই করিব না।

দারোগা। বেশ। আসুন তবে—

তিনজনে একটি ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

রামতনু। গদাধর, তুমিই প্রশ্ন কর।

গদাধর। আচ্ছা, রাম, তুমি কি ঘুষ লও?

দারোগা। লই বই কি, না লইলে চাকরি থাকে না। উহাই আজকাল নিয়ম।

গদাধর। কি রকম?

দারোগা। এই দেখুন না আজকাল আইন করিয়া বিহার হইতে বাঙ্গলাদেশে লবণ পাঠানো নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের লোক লবণ খাইবেই, বিহারের ব্যবসায়ীরাও লবণ বিক্রয় করিবেই। সুতরাং প্রতিদিন নৌকা করিয়া হাজার হাজার মণ লবণ পাঠানো হইতেছে। আমি আমার এলাকায় ঘাটে ঘাটে পুলিস মোতায়েন করিয়া নৌকাগুলি ধরিতেছি এবং মণ পিছু একটাকা করিয়া আদায় করিতেছি। ইচ্ছা করিলে বেশিও লইতে পারিতাম। লই নাই। ইহাতেই আমার দৈনিক গড়ে এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা আয় হইতেছে। কিছুটা উপরওয়ালাদের দিতে হয়। বারান্দায় যাহারা বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে তাহারা এই সবেরই হিসাবপত্র করিতেছে। সব টাকাটা আমি লই না। দেশের আজকাল

দুর্দিন, কিছু টাকা আমি এখানকার গরীবদের দিই, অবশ্য মজুরি হিসাবে। যে কোনও একটা ওজুহাতে তাহাদের নিযুক্ত করিয়া মোটা মজুরি দিই। এখানকার সমস্ত জঙ্গল, পুষ্করিণী পরিষ্কার করাইব মনস্থ করিয়াছি। আজ একটা খ্যামটা নাচের দল আসিয়া আমাকে ধরিয়াছে। দেশের এই দুর্দিনে তাহাদের নাকি অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহাদের নাচিতে বলিয়াছি। আমার হাত দিয়া যে যতটা পাইয়া যায় পাক—

গদাধর। ইহাদের সকলকে খাইতে দাও?

দারোগা। অনেক চোরাই চাল আটক করিয়াছি তাহাই খাইতে দিই। চালগুলো পচাইয়া কি হইবে?

রামতনুর চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল।

রামতনু। কিন্তু এসব কি অন্যায় নহে?

দারোগা। খুবই অন্যায়। কিন্তু—

রামতনু। তুমি পাষণ্ড!

দারোগা। খুব সম্ভব।

গদাধর গলা খাঁকারি দিলেন।

গদাধর। আসল কথাটা বলি শোন। বেশি মজুরির লোভে আমাদের সমস্ত চাকর তোমার কাজে চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের সংসার অচল—

দারোগা। আমি যতদিন আছি ভাবনা নাই। কে কে আপনাদের চাকর দেখাইয়া দিন তাহারা এখনই আপনাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইবে। মজুরি আমিই দিব।

রামতনু। কিন্তু এরকম করিলে—

দারোগা। [করজোড়ে] আপনারা গুরুজন, আপনাদের সহিত তর্ক করিতে আমি অপারগ। বাক্-বিতণ্ডা আমি করিব না।

তিন

ভূরিভোজনান্তে রামতনু ও গদাধর যখন পাল্কিযোগে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন তখন সন্ধ্যা আসন্ন। গরুরাও ধূলি উড়াইয়া গোহালে ফিরিতেছিল। পাল্কির পিছনে এক হাঁড়ি দই, এক কলসী দুধ এবং একটি প্রকাণ্ড মাছ লইয়া ফৈজু, ছেদি ও বানার্সি আসিতেছিল।

পালকির ভিতর রামতনু ও গদাধর নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিলেন।

উপকরণ-সংগ্রহ (৪)

দাঙ্গা বাধিয়া যাওয়াতে একটু মুশকিল হইল। স্থূলকায় গদাধর, ক্ষীণকান্তি রামতনু উভয়েই চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এ অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো সমীচীন কি-না। গদাধর গোঁফের ভিতর অঙ্গুলি-চালনা করিতেছিলেন এবং রামতনু গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া ললাটদেশ কুঞ্চিত হইতে কুঞ্চিততর করিতেছিলেন। উভয়সঙ্কটে পড়িলে রামতনু ইহাই করিয়া থাকেন। রামতনু বুঝিতেছিলেন যে প্রাণের ভয়ে কর্তব্যকর্ম হইতে বিরত হওয়া মহাপাপ। কিন্তু ভয় সত্যই করিতেছিল এবং অকপটে তাহা প্রকাশ করিতেও পারিতেছিলেন না। গদাধরের নিকটে খেলো হওয়া অসম্ভব। বরাবর তাহার কাছে নিজেকে তিনি নির্ভীক প্রাণ-তুচ্ছকারী কর্মীরূপে পরিচিত করিয়াছেন।

গদাধরের প্রকৃত মনোভাব জানিবার জন্য রামতনু অবশেষে একটি টোপ ফেলিলেন।

রামতনু। শ্রমিক-চরিত্রের একটি দিক হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে খুলিয়া গিয়াছে। এ সুযোগ কি পরিত্যাগ করা উচিত?

গদাধর টোপ গিলিলেন না।

কোন উত্তর না দিয়া গোঁফে আঙ্গুল চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

রামতনুর কোটরস্থ অক্ষিযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল।

রামতনু। তুমি কি মনে কর না, এই দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-জীবনের একটা নূতন দিক দেখা যাইবে? তাহাদের এই দাঙ্গা-উন্মত্ত রূপটা কি তুচ্ছ করিবার মতো? রাস্তায় রিক্‌শা নাই, কুলি নাই, বাজারে মাছ নাই, তরকারি নাই। উপর্যুপরি নিরামিষ আহার করিয়া জীবনে বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে এবং এ সকলের কারণ কি শ্রমিকদের দাঙ্গা-লোলুপতা নয়?

গোঁফের ভিতর গদাধরের চলমান অঙ্গুলিদ্বয় থামিয়া গেল।

গদাধর। শ্রমিকেরা দাঙ্গা করিতেছে না।

রামতনু। [বিস্মিত] কাহারা করিতেছে তবে?

গদাধর। ধনিকরা। [সহসা আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে] ধনিকদের হিংসা-লালসার বহ্নিতে শ্রমিকেরা এতদিন ধীরে ধীরে পুড়িতেছিল, এবার হু হু করিয়া

পুড়িয়া যাইতেছে। ভাই রামতনু, ভুল করিও না, শ্রমিকেরা ইন্ধন মাত্র। চিন্তা কর।

চিন্তা করিবার অবসর কিন্তু পাওয়া গেল না।

"হুজুর গেট খোলিয়ে···" উচ্চকণ্ঠে নিঃসৃত এই আবেদনে উভয়েই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন লম্বা-লাঠি-ঘাড়ে নাক-বসা ভজুয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পিছনে বিরাট মোট মাথায় লইয়া নানা বয়সের বালক-বালিকা। কাহারও হাতে খনতা, কাহারও হাতে বঁটি, কাহারও হাতে কুঠার।

গদাধরের মুখ শুকাইয়া গেল। রামতনুর তালুও।

"কি মাংতা হ্যায়···" ক্ষীণকণ্ঠে গদাধর প্রশ্ন করিলেন।

"গেট খোল দিজিয়ে—"

বাড়ি রামতনুর। সে বাড়ির গেট খুলিবার অধিকারও স্বভাবতঃই রামতনুর। সুতরাং গদাধর রামতনুর মুখের দিকে তাকাইলেন। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রামতনুর ভ্রূযুগল আরও কুঁচকাইয়া গেল। কয়েকদিন পূর্বেই ইহার বাড়ির পিছনের গাছে তিনি চড়িয়াছিলেন। ব্যাটা হয়তো এই সুযোগে প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল সটান উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিতে। গদাধর না থাকিলে হয়তো তাহাই করিতেন। কিন্তু চরিত্রের সামান্যতম দুর্বলতার জন্য যে গদাধরকে সর্বদা তিনি যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া থাকেন তাহার সম্মুখে এমন ভীরুতা প্রকাশ করা অপেক্ষা ভজুয়ার লাঠির তলায় মাথা পাতিয়া দেওয়া তাঁহার নিকট সহজ বলিয়া মনে হইল। তবু মনে বল পাইতেছিলেন না। কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাওয়াতে বল পাইলেন। হঠাৎ প্রতাপাদিত্য হইতে শুরু করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালী বীরবৃন্দের কাহিনী নিমেষ-মধ্যে তাঁহার মস্তিষ্কটাকে যেন ঝড়ের বেগে নাড়া দিয়া গেল। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন গদাধর তখনও স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া অকম্পিত হস্তে গেট খুলিয়া দিলেন।

ভজুয়া লাঠি মারিল না।

উপরন্তু সে যাহা বলিল তাহাতে রামতনুর চিত্ত বিগলিত হইয়া গেল। তাহার বাড়ির নিকটেই মুসলমান বস্তি। তাহারা রাত্রে যদি অতর্কিতে আক্রমণ করে এই ভয়ে ভজুয়া তাহার পুরাতন মনিবের বাড়িতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। সপরিবারে

আসিয়াছে, সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া। রামতনু খুশি হইলেন। ভজুয়া চোর, তাড়ি খায়, উপদংশ-জর্জরিত—এ সবই রামতনু জানেন, তবু খুশি হইলেন। গদাধরের অন্তরেও পুলক জাগিল, কারণ বাড়ির বাহিরে পদক্ষেপ না করিয়াও নানারূপ উপকরণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া গেল।

দিন দুই মন্দ কাটিল না।

গদাধর লক্ষ্য করিলেন ভজুয়ার কন্যা হিরিয়ার রোজ জর হয়, পেটে প্লীহা বাড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পাড়ার ডাক্তারবাবুটি করুণা-পরবশ হইয়া বিনামূল্যে যদিও তাহার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন, কালাজরের দুই একটি ইন্‌জেক্‌শনও দিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি হিরিয়া তাঁহার কাছে আর যায় না। কারণ অন্য কিছু নয়, সুইয়া (ইন্‌জেক্‌শন) লইতে তাহারা বড় ভয় করে। রামতনু তাহাকে নির্ভয় করিবার জন্য ভাঙা হিন্দীতে অনেক কথা বলিলেন, হিরিয়া ঘাড় বেঁকাইয়া মুচকি হাসিতে হাসিতে সব শুনিল, কিন্তু গদাধর এবং রামতনু উভয়েই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে ও কিছুতেই ইন্‌জেক্‌শন লইবে না। মরিয়া যাইবে, তবু লইবে না। গদাধর আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলেন। ইহাদের চুল দাঁত চোখ চামড়া কাপড় জামা তো নোংরা বটেই, ভাষাও অত্যন্ত নোংরা। মা মেয়েকে যে ভাষায় গালি দিতেছে, এমন কি, যে ভাষায় আদরও করিতেছে তাহা লেখা যায় না। সমস্তই কাঁচা খিস্তি, অনেক ক্ষেত্রে যদিও ব্যাকরণ-সম্মত সমাসবদ্ধ। এ বিষয়ে রামতনুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হঠাৎ তিনি বলিলেন—"তোমার কাছে যাহা অশ্লীল মনে হইতেছে উহাদের কাছে সেটা স্বাভাবিক, অশ্লীল নয়।" রামতনুর দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া গদাধর থামিয়া গেলেন। রামতনুও দুইটি ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা গদাধরকে 'নোট' করিয়া লইতে বলিলেন। প্রথম—ভজুয়ার বউ কাল তাঁহার বাথরুমে ঢুকিয়া তাঁহার সাবান ব্যবহার করিয়া স্নান করিয়াছে। দ্বিতীয়—হিরিয়ার রুক্ষকেশ সহসা তেল-জবজবে হইয়া উঠিয়াছে যে-তৈল-সহযোগে, তাহা তাঁহারই কেশরঞ্জন তৈল। ভজুয়ার অবশ্য এ সব বিষয়ে লক্ষ্য নাই। সে একটি খুরপি লইয়া হাতা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় রামতনুকে সেলাম করিতেছে। গদাধরকেও। কিছুক্ষণের জন্য মাঝে সে বাহিরে যায় এবং দাঙ্গার লোমহর্ষণ খবর সংগ্রহ করিয়া আনে। এইভাবে দিন দুই মন্দ কাটিল না।

তৃতীয় দিন সকালে যাহা ঘটিল তাহাতে রামতনুর চিন্তা আবার হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া গেল। উপর্যুপরি কয়েকদিন নিরামিষ আহার করিয়া তিনি দুর্বল বোধ করিতেছিলেন। প্রতিবেশী বকুবাবুর কাছে সংবাদটি পাইয়া তিনি আরও দুর্বল বোধ করিতে লাগিলেন।

বকুবাবু প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন, "ভজুয়াকে আশ্রয় দিয়া আপনি ভুল করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সুযোগ লইয়া এইবার শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করিবে শুনিতেছি। আমাদের মতো পেটি বুর্জোয়াদের ঘরে প্রথমে উহারা পূর্ব পরিচয়ের সুযোগে ঢুকিবে, তাহার পর হঠাৎ একদিন একযোগে আক্রমণ করিবে।"

খবরটি বলিয়া বকুবাবু চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ভজুয়া নাই। সমস্ত দিন আসিল না। সন্ধ্যায় গদাধরের দিকে রামতনু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

রামতনু। সমস্ত দিন যখন আসিল না তখন গতিক খারাপ। তুমি আজ রাত্রে আমার কাছে শুইবে কি ?

গদাধর। বল তো শুইতে পারি।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। রামতনু ও গদাধর মুখোমুখি বসিয়া আছেন। রামতনুর ঠাকুর ভাতে ভাত নামাইয়া আসিয়া রামতনুকে বলিল—"এখনই খাইবেন কি ?"

"থোড়া ঠহর যাইয়ে ঠাকুর জি—"

বারান্দায় ভজুয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রামতনু চমকাইয়া উঠিলেন। গদাধরের অঙ্গুলিদ্বয় গুম্ফ মধ্যে অনড় হইয়া গেল।

ঠাকুর আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কি বলছ ?

কাঁচুমাচু ভজুয়া হিন্দী ভাষায় যাহা বলিল তার মর্ম এই যে, সে দুইদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল যে, মৎস্যাভাবে বাবুর খাওয়া হইতেছে না। তাই সে একটি ছিপ যোগাড় করিয়া নিকটবর্তী খালটায় মাছ ধরিতে গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে একটি রোহিত ধরা পড়িয়াছে। ঠাকুর যেন সেটির ঝোল বানাইয়া তবে বাবুকে খাইতে দেয়। সে মাছটি এখনই কুটিয়া দিতেছে। কুঞ্চিতভ্রূ রামতনু গদাধরের দিকে চাহিলেন। গদাধরের চক্ষু দুইটি হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

উপকরণ-সংগ্রহ (৫)

"ভুজঙ্গী নামটাই খুব খারাপ!"

কথাটা বলিয়া রামতনু গদাধরের দিকে চাহিলেন এবং কোনও উত্তর না পাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। গদাধর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কথাটা প্রণিধান করিতে লাগিলেন। সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ প্রণিধান করিবার পরও দেখিলেন বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। কথাটা শুনিবামাত্র তাঁহার বিবেক যে কথা বলিয়াছিল, এতক্ষণ প্রণিধান করিবার পরও সেই কথাই বলিতেছে। যাহা বলিতেছে তাহা সাহস করিয়া রামতনুকে বলা যায় না। বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করাও দুরূহ কাজ। সুতরাং মোলায়েম করিবার চেষ্টা করিলেন।

গদাধর। ভুজঙ্গী নামটা হয়তো শ্রুতিমধুর নয়, কিন্তু চাকরের নাম শ্রুতিমধুর না-ই বা হইল ভাই, কাজ লইয়া কথা—

রামতনু। কাজের প্রসঙ্গেই কথাটা বলিয়াছি। ইতিপূর্বে আমি দুইজন ভুজঙ্গীর সংস্রবে আসিয়াছি। দুইজনেই দাগা দিয়াছে। প্রথমটি ভুজঙ্গী মিস্ত্রী। লোকটা তিলক ফোঁটা কাটে, লম্বা টিকি আছে, ভাবিয়াছিলাম ভাল লোকই হইবে। আমার চৌকিটি মেরামত করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। করিবামাত্রই অগ্রিম টাকা চাহিয়া বসিল। বলিল, জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দিলাম তাহাকে দশটা টাকা। টাকাটি হস্তগত করিয়াই ডুব মারিল। দুই দিন দেখা নাই। তৃতীয় দিনে আসিল একেবারে চিতাবাঘটি সাজিয়া। তাহার পর এমনভাবে চৌকিটি মেরামত করিল যে খড়ম লইয়া তাহাকে তাড়া করিতে বাধ্য হইলাম। ক্রোধে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে মুক্তকচ্ছ হইয়া হোঁচট খাইতে হইল। যন্ত্রপাতি ফেলিয়া সেই যে পলাইয়াছে এখনও পর্যন্ত তাহার পাত্তা নাই। দ্বিতীয় ভুজঙ্গীকে তো তুমি দেখিয়াছ। যতদিন আমার কাছে ছিল ঘুমানো ছাড়া দ্বিতীয় কাজ সে করে নাই। যখন ঘুমাইত না, তখন বসিয়া ঢুলিত কিম্বা হাই তুলিত।

গদাধর। সে বেচারা যে রুগ্ন ছিল; পরে তাহা তো প্রমাণিত হইল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, উহার পেটে ক্রিমি আছে। উহার আলস্যের কারণ ভুজঙ্গী নাম নয় ভাই, হুকওয়ার্ম।

রামতনু যুক্তির নিকট চিরকাল নতমস্তক। চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রটি চাপিয়া বাম নাসারন্ধ্র-পথে সশব্দে বায়ু নিঃসারিত করিয়া ফেলিলেন। মাথা কিন্তু সাফ হইল না। কারণ ইহা করিবার পরও দ্বিতীয় ভুজঙ্গীর বিরুদ্ধে তিনি নূতন কোনও যুক্তি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। কিন্তু একটি সুফল ফলিল। প্রথম ভুজঙ্গীর বিরুদ্ধে আর একটি কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। এটি এতক্ষণ মনে পড়ে নাই।

রামতনু। পরে খোঁজ লইয়া জানিয়াছি ভুজঙ্গী মিস্ত্রী না কি টেটনের বউকে লইয়া সরিয়াছে।

গদাধর। হয়তো সে-ও অসুস্থ। কোনও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক পরীক্ষা করিলে হয়তো তাহার মনের ভিতরও কোনও ক্রিমি আবিষ্কার করিতে পারিবেন। [সহসা আবেগ ভরে] ভাই রামতনু, উহারা সকলেই অসুস্থ। উহাদের উপর রাগ করিও না।

রামতনু। রাগের কথা নয় গদাই, অভিজ্ঞতার কথা—

গদাধর। মাত্র দুইটি ভুজঙ্গী দেখিয়া যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা তোমার হইয়াছে আজকালকার ভৃত্যসঙ্কটের দিনে যদি কেবলমাত্র তদ্দ্বারাই তুমি চালিত হইতে চাও তোমার মনের জোরের আর একটি অকাট্য প্রমাণ পাইব—

এই পর্যন্ত বলিয়া গদাধর সহসা থামিয়া গেলেন। "কিন্তু ইহা তোমার বুদ্ধির সূক্ষ্মতার নিদর্শন হইবে না"—এই বাক্যটিও তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু জোর করিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিলেন। সামান্য ব্যাপার লইয়া বন্ধুর হৃদয়ে এতটা আঘাত দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

গদাধরের যে ছাত্রটি দারোগা হইয়া আসাতে ইহাদের ভৃত্য সমস্যার সমাধান হইয়াছিল, তিনি সম্প্রতি বদলি হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে সে সমস্যা পুনরায় গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। রামতনুর বিপদ আরও বেশি। কারণ খাঁটি দুধ খাইবার লোভে তিনি গরুও পুষিয়া থাকেন। তাঁহার গোয়ালা চাকরটিও কয়েক-দিন হইতে অন্তর্ধান হইয়াছে। কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া রামতনু অবশেষে একটি বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক গদাধর-পরামর্শ-ভেলা সম্বল করিয়াই তিনি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। তাঁহার মনে হইল ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রামতনু। স্পষ্ট করিয়া বল। এই ভুজঙ্গীকে আমি বহাল করিব কি না?

গদাধর। আমার মতে করা উচিত। এ লোকটা জাতিতে গোয়ালা, তোমার গরুর সেবাও করিতে পারিবে।

রামতনু। বেশ। তোমার পরামর্শ বরাবরই শুনি, এবারও শুনিব।

একমাস কাটিয়া গেল।

একদিন প্রভাতে সহসা রামতনু পুনরায় গদাধরের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামতনু। গদাধর, তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছ কি?

গদাধর। কি বল।

রামতনু। আমি রোগা হইয়া যাইতেছি। এই দেখ—

রামতনু নিজের কোট কামিজ গেঞ্জি পটাপট খুলিয়া ফেলিলেন। গদাধর দেখিলেন সত্যই কৃশ রামতনু কৃশতর হইয়াছেন।

গদাধর। হাঁ রোগা হইয়াছ। হেতুটা কি?

রামতনু। ভুজঙ্গীকে দেখ তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে।

ভুজঙ্গীকে রামতনু সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ডাকিতেই সে ভিতরে প্রবেশ করিল। এতক্ষণ সে বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল।

রামতনু। [ভুজঙ্গীকে] জামা খোল্—

ভুজঙ্গী জামা খুলিল। গদাধর সবিস্ময়ে দেখিলেন ভুজঙ্গী মোটা হইয়াছে।

রামতনু। [ভুজঙ্গীকে] এইবার বাড়ি যা—

ভুজঙ্গী চলিয়া গেল।

গদাধর। ভাই রামতনু, তোমার দেহের মেদমাংস ভুজঙ্গীর দেহে গেল কি করিয়া!

রামতনু। প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছিলাম ভুজঙ্গী নামটা সুবিধার নয়, ও নামের চাকর আমি রাখিতে চাই না, কেবল তোমার অনুরোধেই বিবেকবাক্য লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। ভুজঙ্গী এখন কি করিতেছে জান?

গদাধর। বল—

রামতনু। প্রত্যহ গভীর রাত্রে উঠিয়া আমার গাইটি দুহিয়া দুগ্ধপান করিতেছে। সকালে সুতরাং দুধ হয় না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল

বাছুর বড় হইয়া গিয়াছে। আমার কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হইল। রাত্রি জাগরণ করিয়া একদিন পর্যবেক্ষণ করিলাম। দেখিলাম ভুজঙ্গী দুধ দুহিয়া খাইতেছে। তোমার বাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধ দমন করিয়া রাখিলাম। [তর্জনী আস্ফালন পূর্বক] হাঁ, কেবল তোমার বাক্য স্মরণ করিয়া। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চিন্তা করিলাম কি করা উচিত। অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলাম, বাছুরটা সরাইয়া রাখিব। তাহাই রাখিলাম এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া পুনরায় ভুজঙ্গীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যাহা আবিষ্কার করিয়াছি তাহা যুগপৎ চমকপ্রদ ও আতঙ্কজনক।

গদাধর। কি!

রামতনু। দেখিলাম ভুজঙ্গী বাছুরের মতো বাঁটে মুখ লাগাইয়া দুধ খাইতেছে! আমার গাইটি কত শান্ত তাহা তুমি তো জান, সে কোনও বাধা দিতেছে না।

গদাধর গোঁফে আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

রামতনু। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] ভুজঙ্গী নামের চাকর এই জন্যই আমি রাখিতে চাহি নাই। তুমিই আমাকে এই প্যাঁচে ফেলিয়াছ, ভুজঙ্গী নামটাই খারাপ—

গদাধর। ভাই রামতনু, যদি অভয় দাও, তাহা হইলে তোমাকেও একটি ঘটনা বলি।

রামতনু। বল।

গদাধর। আগে জিনিসটা দেখ।

গদাধর উঠিয়া গেলেন ও পাশের ঘর হইতে অতিকষ্টে একটি ঝুড়ি বহিয়া আনিলেন। ঝুড়ির মুখটি কাপড় দিয়া ঢাকা।

গদাধর। ঢাকা খুলিয়া দেখ।

রামতনু ঢাকা খুলিয়া দেখিলেন ঝুড়িটি ইট পাটকেলে পরিপূর্ণ!

রামতনু। ইহার অর্থ কি!

গদাধর। অর্থ আজ বুঝিয়াছি। আমার ভগ্নীপতির একটি বাগান আছে। তিনি আমার জন্য কিছু ল্যাংড়া আম পাঠাইয়াছিলেন। ফরসা-জামা-কাপড়-পরা একজন ভদ্রলোকের হাতেই পাঠাইয়াছিলেন। ভদ্রলোক আমার পরিচিত।

তিনি ঝুড়িটি নামাইয়া দিয়াই চলিয়া গেলেন। খুলিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আজ এইমাত্র ভগ্নীপতির পত্র আসাতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়াছে। ভদ্রলোকটি ভগ্নীপতিরও তেমন পরিচিত লোক নন। তিনি এই দিকে আসিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার হাতে ঝুড়িটি দিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের নাম কি শুনিবে?

রামতনু। কি বল।

গদাধর। ভুজঙ্গী নয়, বুদ্ধদেব।

পরী

মাথার উপর পাখাটা বনবন করিয়া ঘুরিতেছিল। কুমার সুমিত্রানন্দনের অবিন্যস্ত তৈলহীন কেশরাশি হাওয়ার আবর্তে আরও অবিন্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ঠিক পাশেই মর্মর-নির্মিত তেপায়ার উপর রক্ষিত সুরাপাত্রের ফেনবুদ্‌বুদমালাও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল সে হাওয়ার বেগে। কুমার সুমিত্রানন্দন কম্পিত হস্তে সুরাপাত্রটি তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিলেন। তাহার পর সম্মুখের দেওয়ালে বিলম্বিত ছবিটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মদিরাক্ষী তরুণীর ছবি। চোখের দৃষ্টিতে স-কৌতুক হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে। কুমার আর এক চুমুক সুরা পান করিলেন। তাঁহার বিহ্বল চোখের দৃষ্টি আবেশময় হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন।

কে, নিখিলবাবু না কি ?

হ্যাঁ।

স-সঙ্কোচে প্রৌঢ় ম্যানেজার নিখিলনাথ প্রবেশ করিলেন।

সব ঠিক হয়ে গেল ?

হ্যাঁ। বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে, তবে তিনি টাকা দেবেন বলছেন !

মাত্র এক লক্ষ টাকার জন্যে দশ লক্ষ টাকা দামের বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে ?

ম্যানেজার চুপ করিয়া রহিলেন।

কুছ পরোয়া নেই। কাগজপত্তর ঠিক করুন। দেরি করবেন না।

সব ঠিক ক'রে রেখেছি, আপনি সই ক'রে দিলেই হবে খালি।

বেশ, রেখে যান আপনি। আমি সই ক'রে দিচ্ছি একটু পরে। হাতটা এখন স্টেডি নেই।

দলিলটি লইয়া নিখিলনাথ বাহির হইয়া গেলেন।

পুনরায় ছবিটির দিকে চাহিয়া সুমিত্রানন্দন আপন মনে বলিলেন, তোমার দাম দশ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি—ঢের বেশি।

বাহিরে পদশব্দ হইল। কুমার সুমিত্রানন্দন আবার দ্বারের দিকে চাহিলেন।

নিখিলবাবু না কি ?

না, আমি।

ও, বীরু ! এস, এস।

বয়স্ক বীরেন্দ্রনাথ সোফায় বসিতে বসিতে বলিলেন, তোমার পরীর খবর কি ?

আকাশলোক থেকে আজই নেবে আসবে মনে হচ্ছে।

মনে হওয়ার কারণ ?

হীরের হারটা আজই কিনে দেব।

লক্ষ টাকা খরচ ক'রে! অত টাকা পেলে কোথা ? তোমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স তো—

বাড়িটা বাঁধা রেখে টাকা ধার করছি।

ও !

বীরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চোখের দৃষ্টিতেও একটি সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কুমার সুমিত্রানন্দন তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বলিলেন, তোমার মনে কিছু একটা জেগেছে বুঝতে পারছি। ব'লে ফেলো। তবে মর‍্যাল লেকচার দিও না।

বীরেন্দ্রনাথ ইতিহাসের ছাত্র।

না, মর‍্যাল লেকচার দেব না। আমি খুশিই হয়েছি।

তোমার খুশি হবার কারণ ?

মানব নামক পশুর প্রগতি দেখে।

কি রকম ? খুলে বল, বুঝতে পারলাম না।

সুমিত্রানন্দন আর এক চুমুক সুরাপান করিয়া বলিলেন, আমার তো ধারণা কিস্‌সু হয় নি। হা-হা-হা-হা—

অট্টহাস্য করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেলেন সুমিত্রানন্দন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কি রকম প্রগতি হয়েছে, শুনি।

তা হ'লে একটা গল্প শোন। আর কিছু নয়, ব্যাপারটা একটু নীট হয়েছে।

বল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক রাজকুমার যে রমণীটির প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করবার জন্যে কি করেছিলেন জান ?

কি ?

দশ হাজার মানুষকে বলিদান দিয়েছিলেন।

কেন ?

তাঁর প্রেয়সীর সখ হয়েছিল লোধ্রফুলের রেণু মাখতে। তিনি বলেছিলেন লোধ্রফুলের একটি বাগান ক'রে দাও আমাকে। রাজা কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও লোধ্রফুলের একটি চারাও বাঁচাতে পারলেন না তাঁর জমিতে। হয়তো সে জমিতে লোধ্রফুলের উপযোগী সার ছিল না। তাঁর পুরোহিত তাঁকে বললেন যে, ওই জমিতে যদি দশ হাজার মানুষ বলিদান দিতে পার, তা হলে লোধ্রফুলের চারা বাঁচবে। রাজার অসংখ্য দাস ছিল। পরদিনই দশ হাজার মানবপশুর রক্তে সে জমিতে কাদা হয়ে গেল। ব্যাপারটা একটু স্থূল, এই আর কি। এখনকার ব্যাপার একটু সূক্ষ্ম হয়েছে। ওই এক লক্ষ টাকা ওই মারোয়াড়ীর ব্যাঙ্কে জমেছে হয়তো দশ হাজার লোকের বুকের রক্ত শোষণ করেই, কিন্তু তার প্রকাশ হয়েছে ওই হীরের হারে।

সুমিত্রানন্দনের চোখের দৃষ্টিতেও কৌতুক ঝলমল করিয়া উঠিল।

ও ব্যাপারে মানব-পশুর বলিদান দেখতে পাচ্ছ না তুমি ?

পাচ্ছি, কিন্তু সে একটিমাত্র পশুর।

সুমিত্রানন্দন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, লোধ্রফুল কোথায় পাওয়া যায়, দেখেছ কখনও ?

না, দেখি নি। কালিদাসের কাব্যে পড়েছি। উজ্জয়িনীর আশে-পাশেই পাওয়া যায় সম্ভবত। আমি এখন চলি ভাই, সন্ধ্যেবেলা আসব আবার।

বীরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। সুমিত্রানন্দন পরীর ছবির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

পরক্ষণেই ফোনটা বাজিয়া উঠিল।

কে, পরী ?···তোমার হার নিয়ে আজ যাচ্ছি সন্ধ্যের সময়···হ্যাঁ, বীরেন এখুনি এসেছিল। ভারি মজার একটা গল্প বলে গেল। শুনবে, ফোনটা ধরে থাক তা হলে—

স্থমিত্রানন্দন গল্পটি আগাগোড়া বলিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার মুখভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

সত্যি বলছ? নিশ্চয়, যেমন করে পারি যোগাড় করব।

ম্যানেজার নিখিলনাথ দলিলপত্র লইয়া প্রবেশ করিলেন।

নিখিলবাবু, টাকার আর দরকার নেই। আমি এখখুনি উজ্জয়িনী যাব। লোধ্রফুল যোগাড় করতে হবে। ফোন করে এখ্খুনি বার্থ রিজার্ভ করুন।

নিখিলনাথ সবিস্ময়ে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গন্ধমূষিক শর্মার আত্মজীবনী

ঈজি-চেয়ারে শুয়ে চালের বাতা গুনছিলাম। আমি যে ঘরটিতে লেখাপড়া করি সেটির ছাদ পাকা নয়, সুতরাং কড়িকাঠ গোনবার সুযোগ নেই। অতিশয় বোকার মত আমি আশা করছিলাম যে, ওই ঘুন-ধরা চালের বাতাগুলির মধ্যেই হয়তো কোনও গল্পের প্লট পেয়ে যাব। মিনিট কয়েক পরে কিন্তু ঘরের মধ্যে একটি নূতন ঘটনা ঘটাতে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হ'ল। দৃষ্টি বা মনকে আর চালের বাতায় নিবদ্ধ রাখতে পারলাম না। কোথা থেকে একটা ছুঁচো বেরিয়ে ঘরের মধ্যে কিচকিচ ক'রে বেড়াতে লাগল। শব্দে আর গন্ধে অস্থির হয়ে উঠলাম। চেয়ারের উপর পা-টা গুটিয়ে নিলাম ভাল করে। আমার বন্ধু অমর সামান্য একটা ইঁদুরের কামড়ে মর-মর হয়েছিল মনে পড়ল। জ্বর হয়ে বুকে সর্দি ব'সে যায় আর কি বেচারা! ছুঁচো যদি কামড়ায় না-জানি কি কাণ্ড হবে! পা-টা ভাল ক'রে গুটিয়েই বসলাম! তার পরই আবার কপাটে ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে আওয়াজ আরম্ভ হ'ল! কপাটে খিল বন্ধ ছিল। ভাবলাম কি আপদ, আজ আর লিখতে দেবে না দেখছি! ঠুক্‌ঠুক্ শব্দ সমানে চলতে লাগল। ছুঁচোটাই শব্দ করছে নাকি? কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, ছুঁচো নয়। বাইরে থেকে কেউ কড়া নাড়ছে। উঠে কপাটটা খুলে দিলাম। খুলে যা দেখলাম, তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। অপরূপ সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছেন একজন। রাত-দুপুরে কে এল এ! মিঠ্‌ঠু মজুমদার নামে যে মেয়েটি চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছে ক্রমাগত, সে-ই সশরীরে এসে হাজির হ'ল নাকি শেষ পর্যন্ত! আসবে ব'লে শাসিয়েছিল। মিঠ্‌ঠু আমার লেখার একজন ভক্ত—সে যা লেখে তার কিয়দংশও যদি সত্য হয় তা হ'লে খুব প্রগাঢ় ভক্তই বলতে হবে; কিন্তু তবু এই রাত-দুপুরে বিনা আমন্ত্রণে সে আমার দ্বারস্থ হবে এতটা বাড়াবাড়ি ভক্তি কল্পনা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম। কিন্তু আমার চিন্তা আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পেল না। মহিলাটি সহাস্য দৃষ্টি তুলে নিজেই বললেন, অনেকক্ষণ থেকে কাতরভাবে ডাকছ, তাই এলাম।

অনেকক্ষণ থেকে তো মেধো চাকরকে ডাকছি এক পেয়ালা কফি দিয়ে যাবার জন্যে! আর কাউকে ডেকেছি ব'লে তো মনে পড়ল না।

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, কে আপনি?

আমি সরস্বতী। আমি আরও বিশেষ ক'রে এলাম আর একটা কারণে। এই পুজোর হিড়িকে তোমরা অনেকেই যা-তা লিখছ। তাই ঠিক করেছি, তোমাদের লেখাগুলো একবার দেখে দেব। চল—

সরস্বতী দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন এবং ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমার জন্যে তোমায় কিছু ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি আপন মনে যা লিখতে চাও লিখে ফেল। লেখাটা শেষ হ'লে দেখে আমি ব'লে দেব, ছাপাবার উপযুক্ত হয়েছে কি না!

তার পর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, আমি চেয়ারটা আর একটু কোণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি সামনে ব'সে থাকলে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে।

চেয়ারটা টেনে তিনি অন্ধকার কোণটায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি যে কি করব, কি বলব—কিছুই ভেবে পেলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর নিজের চেয়ারটাতে গিয়ে বসলাম।

যে ছুঁচোটা কিচকিচ ক'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। গন্ধটা কিন্তু গেল না, বরং মনে হল, সেটা যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। তার পরই দেখতে পেলাম, ছুঁচোটা আমার টেবিলের উপর উঠে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সামনের পা দুটো জোড় ক'রে আমার দিকে চাইছে। ঠিক মনে হ'ল, যেন কোন প্রার্থী হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করছে কিছু। অদ্ভুত কাণ্ড! পর-মুহূর্তে যা হ'ল, তা আরও অদ্ভুত। মানুষের ভাষায় কথা কইতে আরম্ভ করলে সে।

বলতে লাগল, আমি ছুঁচো নই, ছুঁচী। আমি সুবিখ্যাত গন্ধমূষিক শর্মার কনিষ্ঠা পত্নী কস্তুরী দেবী। ছুঁচো-সমাজে তিনিই প্রথম বিদ্রোহী, তিনিই প্রথম পৈতে নিয়েছেন, তিনিই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন, তিনিই প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এতবড় একজন মহাপুরুষের মহজ্জীবনী কি আপনারা প্রচার করবেন না? শুনেছি, আপনারা সুন্দরের উপাসক, মহানের পূজারী—

বিস্ময় সীমা অতিক্রম করেছিল। তবু যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে বললাম, যা শুনেছেন তা ঠিক। শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক শর্মার জীবনীর উপকরণ যদি পাই, তা হ'লে

তা নিশ্চয়ই ব্যবহার করব। কিন্তু উপকরণ পাব কোথা? আপনি সরবরাহ করবেন কি?

শ্রীমতী কস্তুরী মুচকি হেসে বললেন, (বিশ্বাস করুন, ছুঁচীর ছুঁচলো মুখের মুচকি হাসি সত্যই মনোরম) আমি তাঁর জীবনের কতটুকু আর জানি! মাত্র দিন কুড়ি আগে তো ওঁর কাছে এসেছি। আমার আগে উনি অন্তত শ দুই ছুঁচীকে নিয়ে ঘর করেছেন। তারা হয়তো অনেক কিছু উপকরণ দিতে পারত আপনাকে। কিন্তু তাদের সে সব খেয়ালই হয় নি। আমি আধুনিকা, এসেই বুঝেছি যে উনি সাধারণ ছুঁচো নন, ওঁর জীবনী জনসমাজে প্রচার না করলে জনসমাজের প্রতিই অবিচার করা হবে।

কিন্তু সে জীবনীর উপকরণ পাই কি ক'রে?

উনি নিজেই বলবেন আপনাকে। প্রথম প্রথম উনি রাজী হচ্ছিলেন না। বলছিলেন—নিজের কথা, বিশেষ ক'রে নিজের প্রশংসা কি নিজের মুখে বলাটা ভাল দেখাবে? আমি তখন নজীর দেখালাম, কত বড় বড় লোক এ যুগে আত্মজীবনী লিখেছেন। বর্তমান যুগে ওইটেই ফ্যাশন। ওতে দোষের কিছু নেই।

অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। উনি যদি সব খুলে বলেন, তা হ'লে দেখবেন, কি অত ওঁর জীবন! অনেক বড়লোক শুনেছি নিজের শৈশব জীবন বা কৈশোর-জীবন থেকে আত্মচরিত শুরু করেন। শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক যদি ইচ্ছে করেন, তা হ'লে নিজের পূর্বজীবন থেকেই আরম্ভ করতে পারেন। কারণ পূর্বজীবনেরও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ওঁর চমৎকার মনে আছে। ওঁর বর্তমান-জীবনও রোমাঞ্চকর। কি ক'রে একবার একটা নিষ্ঠুর সাপ ওঁকে প্রায় গিলে ফেলেছিল, কি ভাবে একবার এক গৃহস্থের 'মীট-সেফে' উনি বন্দী হয়েছিলেন, প্রকাণ্ড একটা দুধের কড়ায় প'ড়ে গিয়ে কি ক'রে হাবুডুবু খেতে খেতে শেষে উনি বাঁচেন—এ সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করবার মতো। উনি যদি প্রাণ খুলে সব বলেন আর আপনি যদি ভাল ক'রে লিখতে পারেন, আপনাদের সমাজে হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে দেখবেন। ওঁর যৌবন-জীবনও অনবদ্য। সবটা বোধ হয় খুলে বলবেন না উনি। কিন্তু একটুও যদি বলেন, দেখবেন, কি দুর্দমই না ছিল ওঁর যৌবন! এখনও তার রেশ আছে। আশা করি, এটাকে আপনি নিছক যৌন-লালসা ব'লে ভুল করবেন না। এর মধ্যে প্রাণপ্রবাহের যে অস্থির চঞ্চলতা আছে তা আপনার মত রসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না আশা করি।

আর একটা জিনিসও আপনাকে ব'লে দিচ্ছি। ওঁর গলায় দেখবেন পৈতে রয়েছে, ওঁকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলবেন যে, একবার একটা জালে নাকি আটকে পড়েছিলেন, সেই জাল কেটে যখন পালিয়ে আসেন তখন ওই সুতোটুকু নাকি ওঁর গলায় আটকে থেকে গিয়েছিল। এই মিথ্যাভাষণটুকু উনি করেন, কারণ উনি নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের নিগূঢ় ইতিহাস প্রকাশ করতে চান না। আপনি কিন্তু বিশ্বাস করবেন না এ কথা, বুঝলেন।

ক্রমশই আমি কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। বললাম, বেশ, নিয়ে আসুন তাঁকে।

আমার টেবিলের উপর ছোট যে বইয়ের শেল্‌ফ্‌টা ছিল, শ্রীমতী কস্তুরী দেবী তার পাশে অন্তর্হিত হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হলেন শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক শর্মা। বেশ কেঁদো ছুঁচো একটি। তিনিও এসে পিছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং সামনের পা দুটি বুকের কাছে জোড় ক'রে মিটমিট ক'রে চাইতে লাগলেন আমার দিকে। গলার সুতোটি দেখতে পেলাম। আরও দেখলাম তাঁর একটি কান একটু মোড়া, গায়ের লোমও উঠে গেছে মাঝে মাঝে, মুখটা খুব বেশি ছুঁচলো নয়, একটু যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

বললাম, নমস্কার, আপনার আত্মজীবনী শুনব বলে অপেক্ষা করছি।

ক্ষণকাল ইতস্তত করে গন্ধমূষিক বললেন, আমি ছুঁচো।

ব'লেই থেমে গেলেন তিনি। আমি আরও কিছু শোনবার আশায় চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু গন্ধমূষিক আর কিছু না বলে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন শুধু।

বললাম, বলুন।

আজ্ঞে, আমি ছুঁচো।

আবার থেমে গেলেন।

হ্যাঁ, বলুন।

আজ্ঞে, আমি ছুঁচো ছাড়া আর কিছু নই!

বলেই তিনি পট্‌ করে শেল্‌ফের পাশে অন্তর্ধান করলেন। পরমুহূর্তেই টেবিলের নীচে আবার কিচকিচ শব্দ শুনতে পেলাম, মনে হল কলহ শুরু হয়েছে। ক্ষণকাল পরে তাও থেমে গেল।

● দ্বিতীয় শতক

উপরোক্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করে চুপ করে বসে আছি, এমন সময় অন্ধকার কোণ থেকে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হলেন আবার।

কই, দেখি?

খাতাখানা এগিয়ে দিলাম। পড়তে পড়তে তাঁর মুখে মৃদুহাস্য ফুটে উঠল একটা। খাতাখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ছাপতে দিতে পার।

ছাপতে দেব? কি আছে ওতে?

একটা জিনিস অন্তত আছে।

কি?

শ্রীযুক্ত গন্ধেশ্বর শর্মা তাঁর আত্মজীবনীটি বেশ সংক্ষেপে বলেছেন। সমস্ত বক্তব্যটা খুব কম কথায় গুছিয়ে বলা মস্ত বড় একটা আর্ট। উনি যে একটি ছুঁচো ছাড়া আর কিছু নন—এই কথাটাই উনি ভ্যানর ভ্যানর করে দশ হাজার পাতাতেও বলতে পারতেন; কিন্তু সে লোভ উনি সংবরণ করেছেন। আচ্ছা, আমি চললুম।

দেবী অন্তর্হিতা হলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

দুই নারী

আমাদের মধ্যে যে পশুটা সর্বক্ষণ উদ্যত হয়ে থাকে, সেই পশুটাকে দমন করে রাখবার শিক্ষা ভাগ্যক্রমে আমি পেয়েছিলাম বলে প্রথমবার বেঁচে গিয়েছিলাম। তখন আমি বি-এ পাশ করেছি। ভর্তি হয়েছি এম-এ ক্লাসে। আমার দূর-সম্পর্কের এক দাদা তখন তিনপাহাড়ে ছিলেন। পুজোর ছুটিতে তাঁর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার দেহ-মনে তখন দুর্বার যৌবন প্রতি মুহূর্তে বাঁধ ভাঙবার চেষ্টা করছে। আর আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি সে বাঁধকে দৃঢ় করবার। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' সর্বদা সঙ্গে থাকে। শান্তিশতকের সেই শ্লোকটা প্রায়ই আওড়াই মনে মনে, যার অর্থ—যে যুবতীটি একদিন কত মোহের জাল বিস্তার করেছিল, চেয়ে দেখ এখন সে শ্মশানে। খট্টাঙ্গের একপ্রান্তে তার মাথার খুলিটা পড়ে আছে, দাঁত বেরিয়ে রয়েছে, শ্মশানের হাওয়া হু হু করে তার মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। সে হাওয়া সবাইকে ডেকে যেন বলছে—কোথায় সেই মুখপদ্ম, কোথায় সেই অধর-মধু, কোথায় সেই বিশাল কটাক্ষ? কোথায় গেল কোমল আলাপ, মদনধনুর মত কুটিল ভ্রূবিলাস? কোথায় সে সব এখন? যোগোপনিষদে শুকদেব যা বলেছেন তা স্মরণ করি রোজ, এই শরীর ব্রণমুখ, দুর্গন্ধ-চর্ম-জড়িত, শত শত কৃমিপূর্ণ, মূত্রবিষ্ঠালিপ্ত, পরিবর্তনশীল, সর্বভোগের বাসস্থান, মরণের কারণ··। মনের যখন এই অবস্থা তখন তিনপাহাড়ে গেলাম। দাদার ঠিক মাসছয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল। বউদিকে সেই প্রথম দেখলাম আমি। আমাকেও বউদি দেখলেন। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে নির্নিমেষ হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। বউদিকে রূপসী বললে কিছুই বলা হয় না, পরমাসুন্দরী বললেও না, ঠিক কি বললে যে তাঁর রূপটি বোঝানো যায় তা আজও ঠিক করতে পারিনি আমি। তাঁকে দেখে একটি মাত্র কথা আমার মনে হয়েছিল, সে কথাটি হচ্ছে 'চুম্বক'।

শিকারী খেলোয়াড় বড় মাছকে বঁড়শিতে গেঁথে অনেকক্ষণ খেলিয়ে তারপর যেমন টেনে তোলে, টেনে তোলবার আগে আমাকেও তেমনি খেলাচ্ছিলেন বউদি দৃষ্টির বঁড়শিতে গেঁথে। যখনই তাঁর দিকে চাইতাম, চোখাচোখি হয়ে যেত। মনে হত, আমি যখন তাঁকে দেখছি না তখনও যেন তিনি চেয়ে আছেন আমার দিকে।

পিঠের কাছে অস্বস্তি বোধ করতাম একটা। ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেই চোখাচোখি হয়ে যেত, বউদির মুখে ফুটত মুচকি হাসি।

আমার যতীনদা ছিলেন শিবটি। বউদির এই চটুলতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করলে সদ্য-বিবাহিত স্বামীর অন্তরে যা যা হওয়া স্বাভাবিক তা তাঁর হয় নি। তার কোনও লক্ষণ অন্তত দেখি নি। তিনি বেশ প্রসন্ন মনে ভোরে উঠতেন, স্নান করতেন, পুজো করতেন, সকাল সকাল খেয়ে আপিসে চলে যেতেন। মাঝে মাঝে বউদির দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বলতেন, তোমারই মজা হয়েছে দেখছি। একা একা কি করবে ভেবে পেতে না, মণ্টু আসাতে বেশ একটি সঙ্গী জুটে গেছে তোমার। একদিন যাও না দুজনে, মতিঝরনায় বেড়িয়ে এস।

আমি কিন্তু বৌদিদির ব্যবহারে বিব্রত হয়ে পড়ছিলাম। খুব ভোরে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমার গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে ঠেলে ওঠাতেন তিনি।

ওঠ ওঠ, কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুবে! চা যে জুড়িয়ে গেল—

ঘুমের ঘোরে কাপড়-চোপড় সব সময় ঠিক থাকত না, বিব্রত হয়ে উঠে বসতাম। বউদি মুচকি হেসে বলতেন, আহা, বেচারী! সারারাত একলাটি শুয়ে থাকতে কষ্ট হয় নিশ্চয়। একটেরে ঘর তো—

একদিন দুপুর বেলা ব'সে তেল মাখছি, বৌদি একটা মোড়ায় এসে বসলেন উঠোনে। আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, তুমি বোধ হয় একসারসাইজ কর, নয়?

কুস্তি করি।

কার সঙ্গে?

আমাদের আখড়ার লোকের সঙ্গে।

এখানে কুস্তি করবার লোক পাচ্ছ না বুঝি? এখানে কে তোমার মত অসুরের সঙ্গে লড়বে, বল! ও কি, হয়ে গেল তেল-মাখা? পিঠটাতে তো কিছুই হ'ল না! দেব মাখিয়ে?

না না, থাক্।

বউদি শুনলেন না। উঠে এলেন, আমার মানা করা সত্ত্বেও আমার পিঠে তেল মাখাতে লাগলেন। মুচকি হেসে বললেন, পুরুষ মানুষের অত লজ্জা কিসের?

নির্বাক হয়ে রইলাম। ঠিক করলাম, সেইদিনই স'রে পড়ব। 'ভক্তিযোগে'র অশ্বিনী দত্ত সেই পরামর্শই দিতে লাগলেন আমাকে। যাওয়া কিন্তু হ'ল না। যতীনদা আপিস থেকে এসে বললেন, কাল তোমরা মতিঝরনা ঘুরে এস, ট্রলি ঠিক করেছি।

যতীনদা রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কি একটা কাজ করতেন। ট্রলি এসে হাজির হ'ল তার পরদিন ভোরে। যতীনদা যেতে পারলেন না, তাঁর আপিস ছিল। বউদিকে নিয়ে আমিই গেলাম। যেতে হ'ল। রেল থেকে কিছুদূরে মতিঝরনা। বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। গিয়ে যখন হাজির হলাম, মনে হ'ল না এলে ঠকতাম। অদ্ভুত নির্জনতা। মনে হ'ল অন্য একটা জগতে এসেছি। একটা কুলি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে বললে, আমি হুজুর খাবার নিয়ে আসি। আপনারা স্নান করেন তো ক'রে নিন।

বউদিদি কাপড়-গামছা এনেছিলেন। শুধু নিজের নয়, আমারও। আমি বললাম, আমি স্নান করব না। শরীরটা ভাল নেই।

আমি কিন্তু করব।—মুচকি হেসে বউদিদি বললেন।

কুলিটা চ'লে গেল। আমি দূরে একটা পাথরের ওপর ব'সে রইলাম। বউদিদি স্নান করতে লাগলেন। তাঁর স্নানলীলা অবর্ণনীয়। প্রতিজ্ঞা করলাম, ফিরে এসে রাত্রের ট্রেনেই চ'লে যাব।

যাওয়া কিন্তু হ'ল না। যতীনদাই বাধা দিলেন। বললেন, আজ আমাদের এখানে যাত্রা হবে। আজ যাত্রাটা দেখে কাল যেও।

কত রাত হয়েছিল জানি না। যাত্রা দেখছিলাম ব'সে ব'সে। খানিকক্ষণ পরে কিন্তু ভাল লাগল না। ঘুম পেতে লাগল। উঠে এলাম। বাইরের ঘরে আমার বিছানা পাতাই ছিল, শুয়ে পড়লাম। ঠিক তন্দ্রাটি এসেছে, খুট্ করে শব্দ হ'ল একটা। ঘরে কেউ এসেছে না কি? পরমুহূর্তেই আমার হাতটা চেপে ধরলেন বউদি! উষ্ণ স্পর্শ!

কে?

কোন উত্তর নেই।

আমি তড়াক্ করে বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ভোরেই একটা ট্রেন ছিল, সেই ট্রেনেই ত্যাগ করলাম তিনপাহাড়।

● দ্বিতীয় শতক ●

দুই

চ'লে এলাম বটে, কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। সেই উষ্ণ স্পর্শটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। আমার সংযমের হিমালয় গলতে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর নতুন বইও পড়লাম কয়েকটা পর পর। 'নষ্টনীড়', 'নানা', 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার', 'মাস্টার প্যাশন', 'রেন্‌স্‌'। দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে লাগল। মনে হতে লাগল 'ভক্তিযোগ' আর 'গীতা'র রসাস্বাদন করবার যোগ্যই হই নি আমি। রাজসিক জীবন যাপন না করলে আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত মর্ম বোঝা যায় না। আগে ভোগ, তারপর ত্যাগ। পিপাসা না পেলে কখনও শীতল জলের মূল্য বুঝতে পারে কেউ? ইংরেজী বাংলা দু' রকম 'ওমর খৈয়াম' কিনে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের গানগুলোর নূতন অর্থ প্রতিভাত হ'ল মনে। আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেললাম, বায়রন কীটস শেলী বার্ন্‌স্‌। মনে হ'ল, জীবনের ঐশ্বর্যকে ত্যাগ ক'রে কোন্ মরুভূমির দিকে ছুটছি আমি। অনুতাপ হতে লাগল। আমি শুকদেব নই, পাথরও নই, উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করতে গেলাম কেন? উর্বশী তো জীবনে বার বার আসে না, একবার এসেছিল, আর আসবে কি? কবিতা লিখতে সুরু করলাম। কাগজে সেগুলো ছাপাও হতে লাগল। অনেকগুলো কাগজ বউদিকে পাঠিয়েও দিলাম। আশা করতে লাগলাম, উত্তর আসবে একটা। নিশ্চয়ই আসবে। উষ্ণ স্পর্শটা উষ্ণতর হতে লাগল প্রতিদিন। উত্তর কিন্তু এল না। তারপর আর একটা বই হাতে এল। বেট্‌সের লেখা কয়েকটা গল্প। মনে হ'ল, এই তো জীবনের স্বরূপ। এস্‌থারের ছবিটা আঁকা হয়ে গেল মানসপটে। ছলনাময়ী নারী উদ্দাম পুরুষকে যুগে যুগে আমন্ত্রণ করেছে, উদ্দাম পুরুষ যুগে যুগে বাঁধা পড়েছে তার আলিঙ্গন-পাশে। এই-ই নিয়ম। আমি সে নিয়মের ব্যতিক্রম হব কেন? অনুতাপ হতে লাগল—হায়, হায়, কি সুযোগই হারিয়েছি!

তিন

সুযোগ কিন্তু পেলাম আর একবার। বছর দুই পরে। যতীনদা তখন জামালপুরে। তিনিই আমন্ত্রণ করলেন আমাকে। গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বউদি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন একটু। যতীনদা বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি সকালের ট্রেনে আসবে। তা ভালই হ'ল। লাইন খারাপ

হয়েছে, আমাকে বেরুতে হবে এখুনি। অমিতাকে আর একা থাকতে হ'ল না, আমি একটা কুলি রেখে যাব ভাবছিলাম।

যতীনদা চ'লে গেলেন। মুচকি মুচকি হেসে বউদি আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। গরম গরম ফুলকো লুচি আর ডিমের ডালনা। খাওয়া শেষ হলে বিছানা পেতে দিয়ে বললেন, সমস্তদিন ট্রেনে এসেছ, শুয়ে পড়।

ঘুম পায় নি। ব'স না তুমি এইখানটায়। আমার কবিতাগুলো পড়েছিলে?

পড়েছি। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে তুমি ওগুলো লিখেছিলে সে চ'লে গেছে!

চ'লে গেছে?

ম'রে গেছে।

তার মানে?

তোমার দাদাটিকে চেন না? অমন পরশপাথরের কাছে লোহা কতক্ষণ লোহা থাকতে পারে বল? সোনা তাকে হতেই হবে। দেখলে না কেমন বিশ্বাস ক'রে নির্ভয়ে চ'লে গেলেন? আমি আর সে নেই, আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি। ঘুমোও। পাখাটা খুলে দিচ্ছি।

পাখাটা খুলে কপাটটা বন্ধ ক'রে বউদি চ'লে গেল।

আমি নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলাম। পাখাটা বনবন ক'রে ঘুরতে লাগল।

নুড়ি ও তালগাছ

বিরাট প্রান্তর। তার মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক তালগাছ। কতদিন থেকে কেউ জানে না। আশে-পাশে কোনো গাছ নেই। চতুর্দিকে কেবল মাঠ আর মাঠ, দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিশাল একটা বিস্তৃতি কেবল।

তালগাছের ঠিক নীচে প'ড়ে আছে ছোট একটি পাথরের নুড়ি। কতদিন থেকে তা-ও কেউ জানে না। আশে-পাশে তার ছোট ছোট ঘাস। নুড়ির যতদূর স্মরণ হয়, এই ঘাস ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নি। বর্ষাকালে গজায়, গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। ফের বর্ষা এলে আবার জেগে ওঠে, জড়িয়ে ধরে তাকে শ্যামল স্নেহ-ভরে। চিরকালই সে এই দেখেছে। মাটিতে ঘাস হয়, শুকিয়ে যায়, আবার হয়। এই তার অভিজ্ঞতা। মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, আমার দৃষ্টির বাইরে আরও কিছু ঘটে না-কি অন্যরকম।

হঠাৎ একদিন সে তালগাছটার সম্বন্ধে সচেতন হ'লো।

এই কালো মোটা জিনিসটা কি বস্তু। সোজা উপর দিকে উঠে গেছে। যতদূর মনে পড়ে, একে একই রকম দেখছে সে চিরকাল। ঋজু···বলিষ্ঠ···ঊর্ধ্বমুখী।

—"শুনছেন?"

তালগাছ নিরুত্তর।

—"শুনছেন?"

কোনো উত্তর নেই।

পাথরের নুড়ি ছোট, কিন্তু নাছোড়বান্দা। বহুবার ডেকে-ডেকে তালগাছকে অবশেষে বিচলিত করলে সে।

—"কি বলছ, কে তুমি?"

—"আমি আপনার পায়ের তলায় প'ড়ে আছি, ছোট পাথরের নুড়ি। আপনি কে?"

"আমি তালগাছ।"

—"ও!"

যদিও তালগাছের তলাতেই সে প'ড়ে আছে এতকাল, তবু তালগাছের নাম শোনেনি সে। একটু অবাক হ'লো। সোজা উঠে গেছে কত উঁচুতে! হঠাৎ মনে হ'লো, ওর অভিজ্ঞতা হয়তো নূতন রকম। একটু থেমে প্রশ্ন করলে :

—"আচ্ছা আপনি অত উঁচুতে কি দেখেন রোজ?"

—"আকাশে সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়"

—"তারপর?"

—"আবার ওঠে"

টোপ

মাছ-ধরা সম্বন্ধে গল্প হচ্ছিল। ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। এক প্রস্থ চা নিম্‌কি হয়ে গেছে, প্রবীণ মৎস্য শিকারী বিপিন বোস তাঁর প্রাত্যহিক হুইস্কি-সোডাটি ধীরে ধীরে "সিপ" করছেন, গলির ভিতর লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, নিবিড় অন্ধকার থমথম করছে চতুর্দিকে। গল্প জমাবার মতো পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু গল্প জমছিল না ঠিক।

সান্ধ্য বৈঠকটি বসেছিল কানুবাবুকে কেন্দ্র ক'রে। কানুবাবু গয়া-নিবাসী এবং ও অঞ্চলের একজন নামজাদা মৎস্য শিকারী। তিনি এসেছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি অতুলের কাছে। অতুল বিপিন বোসের সাকরেদ। বিপিন বোস যখনই মাছ ধরতে বেরোন অতুল তাঁর তলপি-তলপা বহন করে। তাঁর পাশে একটা ছিপ নিয়ে বসেও প্রত্যেকবার। পুঁটি-মাছ, ন্যাটা মাছ, বাটা মাছ ধরেওছে অনেকবার। কিন্তু যা তার স্বপ্ন তা তখনও অগাধ জলের তলায়। বড় মাছ একটাও ধরতে পারেনি বেচারি।

এক্ষেত্রে যা চিরকাল হয় তাই হচ্ছিল। অতুলচন্দ্র তার নামজাদা ভগ্নীপতি কানুবাবুর কাছে সালঙ্কারে বর্ণনা করছিল কিভাবে একবার একটা দশ-সেরি রুই 'একটু'র জন্যে ফসকে গিয়েছিল তার ছিপ থেকে।

"মাইরি বলছি, প্রায় টেনে তুলেছিলাম, পট করে সুতোটা গেল ছিঁড়ে। বিপিনদাকে জিজ্ঞেস করুন—"

বিপিন বোস স্মিতমুখে মাথা নাড়লেন। বাইরের লোকের কাছে নিজের শিষ্যকে খেলো করবার লোক তিনি নন।

"প্রায় দশসের হবে মাছটা, নয় বিপিনদা ?"

"বেশী"

কানুবাবু তাঁর কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সূচালো অংশটি পাকাতে পাকাতে বললেন, "আসল জিনিষ হচ্ছে টোপ। টোপটি যদি মুখরোচক হয় মাছ হ্যাঁচকা টান মারবেই না। গলায় বঁড়শি বেঁধা সত্ত্বেও মারবে না, এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা" .

বিপিন বোস খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন কানুবাবুর মুখের দিকে, তারপর একমুখ হেসে সমর্থন করলেন কথাটা।

"তাতে আর সন্দেহ আছে? আমারও অভিজ্ঞতা তাই। কি ধরণের টোপ আপনি ব্যবহার করেন?"

"আমি নানারকম টোপ ব্যবহার করি। কেঁচো, গুগলি, ছোট কাঁকড়া, বোলতার চাক। কিন্তু আমি আর একটা জিনিস ব্যবহার করি!"

খুব রহস্যময়ভাবে দাড়ির ডগাটি পাকাতে লাগলেন কানুবাবু।

"আর কি করেন?"

"আমি বেশ করে' আচার মাখিয়ে নি তাতে।"

"আচার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরোনো আমের আচার। ব্যবহার ক'রে দেখবেন, খুব ভাল ফল হবে।"

বিপিন বোস গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। অতুল চকিতে একবার চেয়ে দেখলেন তাঁর মুখের দিকে। মাছ-ধরা সম্বন্ধে বিপিন বোসকে নূতন কথা শেখাবে এমন লোক জন্মায় নি, অতুলের এই ধারণা। কানুবাবুর আচারের কথা শুনে বেচারা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল মনে মনে। বিপিন বোস কিন্তু সামলে নিলেন। বললেন, "খোট্টার দেশের মাছেরা আচার দেখে ভুলে যেতে পারে, এদেশের মাছেরা ভুলবে না। আমার একটা কি ধারণা হয়েছে জানেন? পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুসারে মাছেরদেরও স্বভাব বদলায়, রুচি বদলায়। আমার জীবনে একবার নয়, দু' দুবার প্রমাণ পেয়েছি এর।"

"কি রকম?"

"আমি তখন ইন্‌কম্‌ট্যাক্স অফিসার। বরাবরই তো মাছধরার বাতিক, যেখানে যখন গেছি খবর নিয়েছি কোন্ পুকুরে মাছ আছে। একবার খবর পেলাম শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার গোঁসাইজির পুকুরে মাছ আছে অনেক। কিন্তু কাউকে তিনি পুকুরে ছিপ ফেলতে দেন না। কিন্তু আমি ইন্‌কম্‌ট্যাক্স অফিসার আমাকে 'না' বলা শক্ত। খবর পাঠাতেই সাদরে আহ্বান করলেন। গেলাম এক রবিবারে। গিয়ে দেখি বিরাট পুকুর। পুকুর নয় তো যমুনা যেন। টলমল করছে কালো জল। পুকুরের পাড়েই রাধাবল্লভজীর প্রকাণ্ড মন্দির। নানরকম চার আর টোপ নিয়ে গিয়েছিলাম,

বাগিয়ে ছিপটি ফেললাম। ও মশাই, আধঘণ্টা, একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা কেটে গেল একটি মাছ ঠোকরাল না। আশে-পাশে বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে বুঝতে পারছি, কিন্তু টোপের কাছাকাছি এসেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। কেঁচো, কাঁকড়ার বাচ্চা, মাছের নাড়িভুঁড়ি, মাংসের কিমা—সব আমার সঙ্গে ছিল। একের পর এক টোপ বদলাতে লাগলাম কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, একটি মাছ ঠোকরাল না। সমস্ত দুপুর রোদে ঠায় বসে রইলাম, কিছু হ'ল না। অথচ মাছ প্রচুর। ঠিক করলাম আর একদিন আসব। মন্দিরের একটা রোগা গোছের চাকর ছিল। তাকে কিছু বকশিশ দিলাম, আর বললাম—আসছে রবিবারে সকাল থেকেই চার ফেলে রাখিস। আমি দুপুরের দিকে আসব। চাকরটা এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি আমাকে বললে—হুজুর, এবার কিছু মালপো সঙ্গে করে আনবেন। এ পুকুরের মাছ কেঁচো টেঁচো খায় না, কোনরকম আমিষ খায় না। রাধাবল্লভজীর পুকুরের মাছ কি না। তাছাড়া এ বাড়ির সবাই বৈষ্ণব, মাছ মাংসের পাটই নেই—। অবাক হয়ে বললাম —মালপো খাবে? তুই জানলি কি করে? মুচকি হেসে সে বললে—আমি মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে ধরি যে। কাউকে বলবেন না যেন হুজুর। আসছে রবিবারে মালপো নিয়ে আসবেন, গপগপ ক'রে খাবে দেখবেন। তাই হ'ল। পরের রবিবারে মালপো টোপ ফেলে চারটি বড় বড় বৈষ্ণব রুই কাৎলা গেঁথে নিয়ে এলাম।

এতক্ষণে গল্প জমল। কান্থবাবু 'থ' হয়ে গেলেন। অতুলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল্ করে উঠল। বিপিন বোস হুইস্কি-সোডায় আর একটি 'সিপ' দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে দ্বিতীয় গল্পটি বললেন তিনি।

"দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে লক্ষ্ণৌয়ে। লক্ষ্ণৌ শহর থেকে বেশ কিছু দূরে মফঃস্বলে ছিল পুকুরটা। কোন এক নবাবজাদার পুকুর। পুকুরের নাম বেগম তালাও। খোঁজ পেয়ে মোটরে ক'রে গেলাম একদিন। দেখি বিরাট একটা পোড়ো বাগান বাড়ি। শ্বেতপাথরের তৈরি ভাঙ্গা মতি-মন্‌জিল্ আর তার সামনে শ্বেতপাথরে বাঁধানো প্রকাণ্ড বেগম তালাও। দেখলাম পুকুরের মাঝখান পর্যন্ত শ্বেতপাথরে বাঁধানো চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্মের মত রয়েছে। তার উপর রয়েছে শ্বেতপাথরেরই ছত্র একটি। রোদ লাগবে না। জলের রংও অদ্ভুত—ঠিক ব্র্যাণ্ডির রঙের মতো। নবাবজাদারা অনেকদিন আগেই নির্বংশ হয়েছেন। থাকবার মধ্যে ছিল একটি পুরানো চাকর। সেই এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল এবং আমার অভিপ্রায় শুনে বললে

যে যেদিন খুশী যতক্ষণ খুশী আমি এখানে এসে মাছ ধরতে পারি, সে আমার যথা-সাধ্য খিদমৎ করবে। তোড়-জোড় করে গেলাম একদিন। কিছুক্ষণ বসবার পর সেদিনও বেকুব হতে হোল মশাই। বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে, কিন্তু কাছে আসে না কেউ। মালপো ইনসিডেন্টটা মনে পড়ল, ভাবলাম এখানে পোলাও টোলাও আনতে হবে নাকি! ঘণ্টা দুই বেকার বসে থাকার পর সেই বুড়ো চাকরটাকে ডাকলাম। বললাম, কি রকম চার, কি রকম টোপ দিলে মাছ আসবে বলতে পার? সে কুর্নিশ করে বললে, হুজুর যদি গোস্তাকি মাপ করেন তাহলে হদিশ বাতলাতে পারি। বললাম, বাতলাও, বকশিশ করব তোমাকে। সে বললে, হুজুর, এ বেগম তালাওয়ের মাছ এমনিতে ধরা দেবে না। দুটি খপসুরৎ বাঈজি আনতে হবে। তারা এসে আপনার দু' পাশে বসবে, তাদের ছায়া জলে পড়বে, তবে মাছ আসবে। বলাবাহুল্য, এতটা আমি প্রত্যাশা করি নি। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে আর একবার সেলাম করে বললে, গরীব পরবর, যা বলছি তা করে দেখুন। আমি আপনার সঙ্গে কি দিল্লগি করতে পারি?"

বিপিন বোস হুইস্কি-সোডাতে আর এক সিপ দিয়ে চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়তে লাগল কেবল।

"তারপর?"

"পরের রবিবার দুটো বাইজি নিয়েই গেলাম মশাই। বললে বিশ্বাস করবেন না, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসতে লাগল। ময়দার টোপ দিয়েই ধ'রে ফেললাম গোটা আস্টেক কেঁদো কেঁদো মাছ। আমার বুইক গাড়ির কেরিয়ারটা ভরে গেল—"

বিপিন বোস চুপ করতেই কানুবাবু ভক্তিভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "রাত অনেক হল, এবার উঠি—"

অতুলের মুখের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়।

ভুতের প্রেম

"এই দেখ ইন্দুর ডায়েরি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি পড়ে দেখ দিকি, কিছু মানে বার করতে পার কিনা।"

বলিষ্ঠকায় ভুজঙ্গধর মরক্কো-চামড়া দিয়া বাঁধানো সুদৃশ্য খাতাখানি আমার দিকে আগাইয়া দিল।

"উনত্রিশে তারিখে যেটা লিখেছে সেইটে পড়। আরও পাতা উলটে যাও —হ্যাঁ, ওইখান থেকে পড়।"

পড়িতে লাগিলাম। ভুজঙ্গধর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভুজঙ্গধর আমার বাল্যবন্ধু এবং ইন্দুমতীর স্বামী।

ইন্দুমতী লিখিয়াছেন, "কাল রাত্রে যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছে তা এতই অসম্ভব যে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি কাউকে বলিওনি, এমন কি মাণিককেও না। মাণিককে বলতে খুবই লোভ হচ্ছে, কিন্তু ভয় হচ্ছে পাছে সে আমাকে ভীতু ব'লে ঠাট্টা করে। তার চক্ষে নিজেকে ভীতু প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে নেই। সত্যি সত্যি ভীতু আমি নইও। ভীতু হলে জনমানব বর্জ্জিত এই পোড়ো বাড়িতে এসে থাকতেই রাজি হতাম না কি? ঘটনাটা তবু লিখে রাখছি। লিখে রাখবার মতো ঘটনা ক'টাই বা ঘটে জীবনে! ভবিষ্যতে, কোনও পাঠক বা পাঠিকা হয়তো এটা পড়ে পাগল ভাববেন আমাকে; কিংবা হয়তো কোনও উৎসাহী মনস্তাত্ত্বিক এর থেকে কোনও তথ্য উদ্ধার করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করবেন আমার স্বামীকে। সত্যই অদ্ভুত ঘটনাটা।"

কাল রাত দশটার সময় মাণিক হঠাৎ বলল—"ওহো, একটা বড় ভুল হয়েছে, পেট্রোলটা কেনা হয়নি। চল কিনে আনি গিয়ে। দশ মাইল যেতে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

আমার শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, কোমরটা ব্যথা করছিল সন্ধ্যে থেকেই। তাছাড়া আগাথা ক্রিষ্টির একখানা বই এমন পেয়ে বসেছিল আমাকে যে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করছিল না।

বললাম, "আমি আর যাব না, থাক না কাল কিনলেই হবে।"

মাণিক বললে, "ওটা হল স্ত্রীবুদ্ধি। আমরা যেরকম অবস্থায় আছি তাতে মোটরে সদাসর্বদা পুরো পেট্রোল থাকা চাই।"

"তাহলে তুমিই গিয়ে নিয়ে এস"

"তুমি থাকতে পারবে একা? ভয় করবে না তো!"

"আমি যদি ভীতু হতাম তাহলে যা করেছি তা করতে পারতাম নাকি!"

মাণিক হঠাৎ ঝুঁকে আমার গালে চপাৎ করে চুম খেল একটা। এমন দুষ্টু আর অসভ্য হয়েছে আজকাল!

"আমি পেট্রোলটা নিয়ে আসি তাহলে। যাব আর আসব"

মাণিক চলে গেল। আমরা যে বাড়িটাতে এসে ছিলাম সেটা কোন এক মৈথিল জমিদারের বাগান বাড়ি। যদিও এখন পোড়ো বাড়ির মতো হয়ে গেছে, কিন্তু একদিন যে এর মহিমা ছিল তা একনজরেই বোঝা যায়। জমিদারের বংশধর জীমূতবাহন সিংয়ের সঙ্গে মাণিকের বন্ধুত্ব আছে বলেই বাড়িটা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বাড়ির চাবিটা মাণিককে দিয়ে জীমূতবাহন লণ্ডনে পাড়ি দিয়েছেন সম্প্রতি। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। আমরা দোতলার যে ঘরখানা নিয়ে আছি, তার ঠিক সামনেই গাড়িবারান্দা, গাড়ি-বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সুবিস্তৃত বাগানটা। বাড়ির সামনেই বাগান। এখন অবশ্য বাগানের পূর্বশ্রী নেই। ফাঁকা মাঠের মতো খানিকটা জমি পড়ে আছে খালি। বাগানের ওপারে গেট। গেটেরও ভগ্নদশা। কপাট নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম দুটো দাঁড়িয়ে আছে কেবল।

সেদিন জ্যোৎস্না উঠেছিল খুব। ফিনিক ফুটছিল যেন চতুর্দিকে! ইজি-চেয়ারটায় শুয়ে শুয়েই আমি টের পেলাম মাণিক মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর কতক্ষণ কেটেছিল, আমার মনে নেই ঠিক। আমি তন্ময় হয়ে বই পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হল ঘোড়ার পায়ের শব্দ, অনেকগুলো ঘোড়া যেন টগবগ করে ছুটে আসছে। মনে হল অনেক দূর থেকে আসছে, কেন জানি না হঠাৎ মনে হল অনেকদিন ধ'রে আসছে! শব্দটা প্রথমে ক্ষীণ ছিল, তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। খটবট খটবট খটবট খটবট—ক্রমশই যেন এগিয়ে আসছে। আমি বইটার দিকে

চেয়ে বসেছিলাম কিন্তু পড়ছিলাম না। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। কার বা কিসের, তা জানি না, কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছিল চরাচরও যেন অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। কি হয় তা দেখবার জন্যে সবাই যেন উৎসুক। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিটি পদক্ষেপ-ধ্বনি সবাই যেন শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। এগিয়ে আসছিল শব্দটা...কাছে...আরও কাছে...গেট দিয়ে ঢুকল। তারপরই আমি ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠলাম। মনে হল ঘোড়াগুলো বুঝি হুড়মুড় ক'রে আমার ঘাড়েই লাফিয়ে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে ওঠামাত্র শব্দটা কিন্তু থেমে গেল হঠাৎ। হলের দরজাটা খোলা ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড লম্বা লোক।

"আমি তোমাকে নিতে এসেছি ইন্দুমতী।"

"কে ?"

ঘরের ভিতর ঢুকল এসে। শালপ্রাংশু মহাভুজ চেহারা। মাথায় স্বর্ণমুকুট, অঙ্গে কারুকার্য খচিত অঙ্গচ্ছদ, কর্ণে মণিকুণ্ডল, বাহুতে কেয়ুর। চোখ দুটো যেন জলজল করছে। কুচকুচে কালো গোঁফ, কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো এক মাথা চুল। আমি তো অবাক!

"কে আপনি—?"

"অয়ি মানস-সরোবর-বিহারিণী রাজহংসি, তুমি কি সত্যিই চিনতে পারছ না আমাকে!"

আমি নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কোথাও একে দেখেছি কি না। সে বলতে লাগল—"একটু ভেবে দেখ মনে পড়বে। নারদের বীণাচ্যুত মালার আঘাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে তো একদিনের জন্যও ভুলিনি। বারবার এসেছি তোমার কাছে। নানারূপে এসেছি। তুমিও তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করনি সখি। অয়ি রম্ভোরু, অয়ি অনবদ্যা ভোজনন্দিনি, ভুলে গেছ কি সব? অর্জুনরূপে এসেছিলাম সুভদ্রার কাছে, পৃথ্বীরাজরূপে এসেছিলাম সংযুক্তার কাছে ...আমাকে তো তুমি প্রতিবারই চিনেছ...।"

আমি তখন আত্মস্থ হয়েছি।

বললাম, "ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। স্পষ্ট ক'রে বলুন আপনি কে ?"

"আমি অজ"

"অজ ? সে আবার কে !"

"মহারাজ রঘুর পুত্র। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ—"

"কি চান আপনি—"

"তোমাকে চাই। তুমি আমার। স্বয়ংবর সভায় মলয়রাজের যে ঐশ্বর্য তোমাকে ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত করেছিল তা আমি আহরণ করেছি ইন্দুমতী। অয়ি মত্ত-চকোর-লোচনে, নিতম্বগুর্বি, আমিও তোমার জন্য তাম্বুললতাপরিবৃত, পূগতরুশোভিত, এলালতালিঙ্গিত, চন্দনবৃক্ষ-সুরভিত, তমালমালা-আকীর্ণ মনোরম কানন নির্মাণ করে রেখেছি নিষ্কলুষ মানসলোকের উত্তুঙ্গ মলয়-শিখরে। চল সখি সেখানে। আমি রথ এনেছি তোমার জন্যে। চল…"

লোকটা ঘরে ঢুকে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তার অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি সত্যিই চতুরশ্ববাহিত বিরাট এক রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে নীচে। ওরকম বলিষ্ঠ ঘোড়া আমি আর দেখিনি এর আগে। যেন মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী !

"আর বিলম্ব কোরো না, চল।"

লোকটা আমার হাত ধরতে যাচ্ছিল। আমি চীৎকার করে উঠলাম। মাণিকের কথা মনে পড়ল আমার !

"ভয় পেয়ো না, আমি ভদ্রবংশজাত, আমি বলাৎকার করব না। যাবে না তুমি আমার সঙ্গে ?"

"না—"

"কেন—"

"আমি মাণিককে ভালবাসি।"

"মাণিক ? সে কে !"

"আমাদের মোটর ড্রাইভার ছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু এখন সে-ই আমার সব—"

"ও। আচ্ছা আমি অপেক্ষা করব। একটা কথা শুধু বলে যাচ্ছি, আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। আবার আসব আমি…"

পরমুহূর্তেই সব অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এইখানেই ডায়েরি সমাপ্ত হইয়াছে। মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ভুজঙ্গধর তখনও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইন্দুকে তুমি ফিরিয়ে এনেছ ?"

"হ্যাঁ, চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে মারতে ফিরিয়ে এনেছি—"

"আর মাণিক ?"

"তাকে গুলি করে ওইখানকারই একটা ইঁদারায় ফেলে দিয়েছি"

"কি সর্বনাশ !"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ভুজঙ্গধর বলিল—"ইন্দুকে সত্যিই আমি ভালবাসি ভাই। ওর জন্যে ফাঁসি যেতেও আমার আপত্তি নেই।"

"এত রাত্রে তুমি আমার কাছে এসেছ কেন বল তো ?"

"পরামর্শ করতে। ইন্দুকে কি লুম্বিনী পার্কে পাঠাব ?"

"ডায়েরিটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো পাগল হয়ে গেছে।"

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল ভুজঙ্গধরের চাকর ঘনাই। বোঝা গেল ঘনাই ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়াছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, "বাবু, মাঠান আবার বেরিয়ে গেলেন—"

"সে কি রে !"

"হ্যাঁ বাবু। প্রকাণ্ড একটা চার ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে, কি বড় বড় ধবধবে সাদা ঘোড়াগুলো। গাড়ির ভিতর থেকে চৌগোঁপ্পা একটা লোক মুখ বার করে বললে—ইন্দুমতী, এস। মা ঠাকরুণ ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলেন, আর টগবগ টগবগ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে।"

"তাই নাকি !"

আমরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহ কোথাও নাই। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ইন্দুমতী আর ফেরে নাই।

মন্মথ

কয়েকটি ট্যাবলেট বিলটুর হাতে দিয়ে বললাম, "ছুটো ক'রে ট্যাবলেট তিন ঘণ্টা অন্তর খাবে। কাল এসে একবার খবর দিও। যদি দরকার হয় অন্য ওষুধ দেব। এতেই ভাল হয়ে যাবে আশা করি—"

"কি খাব ডাক্তারবাবু—"

"আজ শুধু জল খেয়ে থাক—"

"শুধু জল ?"

"শুধু জল না পার পাতলা ক'রে বার্লি খেও"

বিলটু মুখ বাঁকিয়ে বলল "বার্লি ? বার্লি একেবারেই সয় না আমার। খেলেই বমি হয়ে যাবে—"

"পেটের অসুখ করেছে, উপোস দেওয়াই তো ভাল—"

"উপোস দিতে পারি না যে !"

"তাহলে মাকে বোলো গরম ফ্যান একটু নুন আর লেবুর রস দিয়ে—"

"ফ্যান তো গরুতে খায়, আমি কি গরু—"

"গরু ভাতও খায়, তরকারিও খায়। তুমি ভাত তরকারি খাও না ?" বিলটু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"মাছের ঝোল চলবে ?"

"চলবে, যদি তোমার মা মশলা না দিয়ে ক'রে দেন। স্টু খেতে পার—"

"রসগোল্লা ?"

"না।"

"রসটা নিংড়ে ফেলে যদি ছানাটা খাই ?"

"না—"

বিলটু অপ্রতিভ মুখে বসে রইল। বিলটুর বয়স বারোর কাছাকাছি। আমাদের পাড়াতেই থাকে। কিছুদিন আগে পিতৃহীন হয়েছে। আমরা সবাই তাই গার্জেন হয়ে উঠেছি ওর। অসঙ্কোচে ফাই ফরমাশ করি, অসঙ্কোচে শাসন করি, অসঙ্কোচে উপদেশ দি। বিলটু আপত্তি করে না। সকলেরই ফরমাশ খাটে, ভান করে যেন

সকলেরই উপদেশ শুনছে। আমার নাতিকে যে প্রাইভেট টিউটারটি পড়ান তার কাছে বিলটুও এসে বসে মাঝে মাঝে, হাতের লেখা লেখে, অঙ্ক কষে। ওর মা আশা করে আছে আমি আগামী বছর ওকে স্কুলেও ভরতি ক'রে দেব। আমার কাছেই বিলটু একটু-আধটু আবদারও করে। কয়েকদিন আগেই তাকে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছি।

বিলটু নাকিস্বরে বললে—"কি খাব তাহলে বলুন না—"

"বললাম তো, স্টু খাও গে"

"মা অত হাঙ্গামা করতে রাজি হবে না"

"বেশ, আমাদের বাড়িতে এস, আমি ব্যবস্থা করব"

বিলটু হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু দ্বারের দিকে চেয়ে চট করে উঠে পড়ল সে। প্রবেশ করলেন পুরুষোত্তমবাবু। মনুষ্যরূপী মহিষ একটি। শুধু মহিষও নয়, মহিষ এবং শজারুর সমন্বয়। মাথায় একজোড়া শিং সর্বদা উদ্যত হয়ে থাকে ভদ্রলোকের, সর্বাঙ্গে নানারকম কাঁটাও। মনে মনে তিনি বাস করেন পবিত্র অতীত যুগে—যে যুগে সবই ভালো—যে যুগে চাল ডাল দুধ ঘি সস্তা ছিল, নারীদের সতীত্ব ছিল, পুরুষদের ধর্মজ্ঞান ছিল, ঠিক সময়ে বৃষ্টি হ'ত, ছেলেমেয়েদের ঠিক সময়ে বিয়ে হত, সন্তান হত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি ফের সশরীরে তাঁকে বর্তমান যুগে সজ্ঞানে বাস করতে হচ্ছে!

ঘরে ঢুকে আমার সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি ফেলে দিয়ে বললেন—"এই নিন। রুনতির বাক্স থেকে পেয়েছি। এর যদি ব্যবস্থা একটা না করেন—আই শ্যাল শূট হিম।"

পুরুষোত্তমবাবুর বন্দুক ছিল না, কিন্তু কথায় কথায় তিনি সকলকে 'শূট' করতে চাইতেন। চিঠিগুলি খুলে খুলে দেখলাম। গোলাপী রঙের শৌখীন কাগজ। কাগজে এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে। ভাষা আরও রঙীন, আরও সুরভিত। সামান্য একটু উদ্ধৃত করছি—"নিদ্মহলের আলোছায়ায় রজনীগন্ধার আবেশের মতো যে স্বপ্ন আমাকে উতলা করে তোলে তা কি তুমি জানো না? মর্মের মর্মর-শয্যায় যে রাজকন্যা শতদলের পাপড়ির উপর ঘুমিয়ে আছে তার ঘুম ভাঙাবার সোনার কাঠি কোথায় পাব। প্রাণের রুন্ত, তুমিই ব'লে দাও কোথায় পাব…।

এই ধরণের উচ্ছ্বাস পাতার পর পাতা।

লম্বা খুঁটকো গালের-হাড়-উঁচু মন্মথর মুখটা ভেসে উঠল মনে। বিবাহিত, চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে, বউটি আসন্ন-প্রসবা। ওই ছোকরার এই কাণ্ড। ও যে এমন ভাল বাংলা জানে তাই বা কে জানত!

"মন্মথ কোথায়, ডাকুন তাকে"

"সে একটা ইনজেকশন্ দিতে গেছে। আসবে একটু পরে। আপনি বাড়ি যান, আমি জিজ্ঞেস করব তাকে। এতে এত বিচলিত হবার কি আছে, চিঠিই তো লিখেছে আর তো কিছুই করে নি—"

"কিছুই করে নি? এ কথা আপনার মত বিজ্ঞ লোকের কাছে আশা করিনি। করবার আর বাকী কি রেখেছে। ভদ্রঘরের নিষ্পাপ কুমারীকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করাটা কিছুই নয় নাকি আপনার চক্ষে—!"

"না, না তা বলছি না, অন্যায় খুবই করেছে। আরও গড়াতে পারতো তো—"

"আমার বাড়িতে পারতো না। এখনও পারে না! কিন্তু চিঠি বন্ধ করি কি ক'রে বলুন। বাড়ির সব জানলা কপাট তো চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ ক'রে রাখতে পারি না। আপিস কামাই ক'রে বসেও থাকা যায় না মেয়েকে পাহারা দিয়ে—"

"তা তো বটেই—"

ইচ্ছে হ'ল বলি, কাউকেই কেউ পাহারা দিয়ে সৎপথে রাখতে পারে না, নিজেই নিজেকে পাহারা দিতে হয়। কিন্তু একথা বললে পুরুষোত্তম বোমার মত ফেটে পড়বেন। তাই বললাম, "আমি মন্মথকে শাসন করে দেব। আপনি আর এ নিয়ে বেশী হৈ-চৈ করবেন না। এ ধরণের কথা চাউর হয়ে গেলে বুঝছেন না—"

"চাউর হয়ে গেছে! তাই না আপনার কাছে এসেছি। বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত জেনেছে। এখন আর চাপা দেওয়া যাবে না, খোলাখুলি তদন্ত করতে হবে—"

"খোলাখুলি তদন্ত করার বিপদও আছে। ধরুন যদি ব্যাপারটা সত্যিই হয়, আপনি কি মন্মথর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন?"

"বিয়ে দেব? আই শ্যাল শূট হিম—"

"কিন্তু আপনার মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। এ রকম একটা খোলাখুলি তদন্ত হওয়ার পর কোনও ভদ্রঘরে কি তার আর বিয়ে দিতে পারবেন—"

"তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব যদি প্রমাণিত হয় যে সে-ও চিঠি লিখেছে, আপনার মন্মথকে সেইটেই জিজ্ঞেস করুন। আই ওয়াণ্ট প্রুফ, সলিড প্রুফ—"

পুরুষোত্তম হুঙ্কার দিয়ে টেবিলে ঘুসি মারলেন একটা। দেখলাম তার নাকের ফুটো খুব বড় হয়ে গেছে, ডগাটা কাঁপছে।

"বেশ, আপনি বাড়ি যান এখন। মন্মথ আসুক, তাকে জিজ্ঞেস করি। সন্ধ্যের পর আসবেন একবার, তখন বিচার করা যাবে—"

হঠাৎ পুরুষোত্তম আমার পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

"আমি গরীব কেরানী হতে পারি, তা বলে কি আমার মান ইজ্জত কিছুই নেই, কত বড় বংশের ছেলে আমি—"

"উঠুন, উঠুন, বাড়ি যান এখন। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবছেন কেন—"

পুরুষোত্তম চলে গেলেন।

দুই

মন্মথ দেখলাম আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। আমাকেও মাঝে মাঝে 'কলে' বেরুতে হয়েছে। দুপুরে যখন ফিরলাম তখন আড়াইটে বেজে গেছে। মন্মথ তখনও দেখলাম কাজে ব্যস্ত রয়েছে খুব। প্রসঙ্গটা তখন উত্থাপন করা সমীচীন মনে হ'ল না। কি জানি উত্তেজিত হয়ে বা অভিভূত হয়ে যদি প্রেসক্রিপশন সার্ভ করতে ভুল করে, মুশকিল হবে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডাকলাম তাকে।

"মন্মথ শোন, একটা কথা আছে—"

ডিসপেন্সারীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না, সুতরাং সুবিধে হ'ল।

"কি বলছেন?"

"পুরুষোত্তমবাবু আজ সকালে আমাকে এই চিঠিগুলো দিয়ে গেছেন। এগুলো তুমি লিখেছ?"

দেখলাম মন্মথর চোখমুখে একটা মরীয়া ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে—

"হ্যাঁ, এগুলো আমারই লেখা"

এ রকম সাফ জবাব প্রত্যাশা করিনি।

"ভদ্রলোকের মেয়েকে এরকম চিঠি লেখার মানে—?"

মন্মথ চুপ করে রইল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে— "

"আমি ওকে ভালবাসি, সার"

লক্ষ্য করলাম গলা একটু কেঁপে গেল।

"তুমি উগ্রক্ষত্রিয়, বিবাহিত, ছেলে-পিলে আছে তোমার, তুমি হঠাৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে ভালবাসতে গেলে কেন—"

"মাপ করবেন সার। এ 'কেন'র জবাব দিতে বড় বড় কবিরা পারেন নি, আমিও পারব না। কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি তাকে ভালবাসি"

"কিন্তু এরকম ভালবাসার পরিণাম কি জান?"

"জানি—"

"তবে—?"

মন্মথ চুপ ক'রে রইল। জবাব সে আগেই দিয়েছিল। বড় বড় কবিরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি, সে প্রশ্নের নিরুত্তরই উত্তর।

"ফনতুর সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল কি করে?"

"একদিন দেখলাম সে তাদের বাইরের বারান্দায় ব'সে কাঁদছে। আমি যাচ্ছিলাম সেদিক দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম কাঁদছ কেন। সে বললে বড্ড মাথা ব্যথা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম—ওষুধ খাওনি কিছু? বললে—বাবা এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন সাতদিন পরে আর এক ডোজ দেবেন। আমি ফিরে এসে তাকে অ্যাসপিরিনের গুলি পাঠিয়ে দিলাম একটা। তারপর মাঝে মাঝে লুকিয়ে সে অ্যাসপিরিনের গুলি নিতে আসত। বিলটুকেও পাঠাত মাঝে মাঝে। এই রকম করেই আলাপ শুরু হয়—"

"তারপর—?"

মন্মথ চুপ ক'রে রইল।

"চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে কবে থেকে?"

"তার কিছুদিন পর থেকে"

"চিঠি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসতে?"

"আজ্ঞে না"

"তবে—?"

"বিলটুর হাতে পাঠাতাম"

"তোমার চিঠির জবাব পেয়েছ কিছু ?"

"অনেক। রোজই পাই—"

"রোজই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় রোজই। ফনতুও আমাকে সত্যি ভালবাসে সার। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় দেখাচ্ছি আপনাকে তার চিঠি—"

মন্মথ চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে সে-ও এক বাণ্ডিল চিঠি নিয়ে এল। চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। প্রতি চিঠিতেই সম্বোধন—প্রাণেশ্বর! বানানটা অবশ্য ঠিক ক'রে লিখতে পারে নি, লিখেছে—"প্রাণেরসর"। অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। এই সব চিঠি যদি পুরুষোত্তম বাবু দেখেন তাহলে—!

মন্মথকে বললাম, "আচ্ছা, তুমি যাও, চিঠিগুলো থাক আমার কাছে—"

মন্মথ চিঠিগুলোর দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে চলে গেল।

ঠিক সন্ধ্যা বেলায় মন্মথ গেল ইনজেকশন দিতে। একটু পরে পুরুষোত্তমবাবু এলেন। আমি ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের ক'রে রেখেছিলাম।

"আপনার মেয়ের হাতের লেখা খানিকটা চাই। মন্মথের কাছ থেকে কোনও চিঠি যদি বেরোয় মিলিয়ে দেখতে হবে। আপনি বাড়ি গিয়ে তাকে দিয়ে খানিকটা বাংলা লিখিয়ে আনুন। নিজের সামনে লেখাবেন"

"নিশ্চয়ই"

পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে ফনতুর হস্তাক্ষর দাখিল করলেন আমার সামনে।

"আপনার সামনে লিখেছে তো—"

"নিশ্চয়ই। আমি 'ভক্তিযোগ' থেকে ডিকটেট করেছি সে লিখেছে—"

লেখা দেখে আশ্বস্ত হলাম। একেবারে, আলাদা হস্তাক্ষর। কিন্তু ও চিঠিগুলো কার লেখা তাহলে!

বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার মেয়ে মন্মথকে কোনও চিঠি লেখেনি"

"কি করে জানলেন—"

"মন্মথর কাছে যে চিঠি পেয়েছি তার হস্তাক্ষর একেবারে আলাদা"

"আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই সেটা—"

দেখালাম একখানা চিঠি।

পুরুষোত্তমবাবুর মুখের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। বললাম—"মন্মথকে শাসন করে দেব আমি। আর ও চিঠি লিখবে না। আমি গ্যারান্টি রইলাম। ফের যদি চিঠি পান, আমাকে এনে দেখাবেন, আমি দূর করে দেব ওকে—"

সন্তুষ্ট হয়ে পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন।

আমি কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ফনতির নাম দিয়ে ও চিঠিগুলো কে লিখলে!

বিলটুকে ডেকে পাঠালাম।

"আমাকে ডেকেছেন ?"

"হ্যাঁ। কেমন আছ তুমি"

"ভাল আছি। ও বেলা স্ট খুব ভাল লেগেছিল। এ বেলা দুখানা রুটি খাব ?"

"আগে একটা কাজ কর দেখি। তোমার পুরোনো বাংলা হাতের লেখার খাতা আছে—"

"এই খানেই তো আছে—"

"নিয়ে এসো"

"কি করবেন খাতা নিয়ে—"

"দরকার আছে। আন না—"

বিলটু এক ছুটে গিয়ে খাতা নিয়ে এল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিলটুই যে চিঠিগুলির লেখক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। মন্মথ ইনজেকশন দিতে গিয়েছিল, সে-ও এসে ঢুকল।

বললাম—"মন্মথ, তোমার চিঠির একখানাও ফনতির লেখা নয়—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিলটুর মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

"ফনতুরই লেখা, স্যার। বিলটুকে জিজ্ঞাসা করুন"

একখানা চিঠি বার করে' বিলটুকে দেখালাম।

"এসব চিঠি কে লিখেছে—"

বিলটু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"সত্যি কথা বল—"

"আমি লিখেছি। শৈলদি, আভাদি, পুষ্পদি যা যা বলে দিত আমি লিখে দিতুম। ফনতিদি একদিনও লেথায় নি—"

"তুমি লিখতে কেন—"

"উত্তর এনে দিলে কম্পাউণ্ডারবাবু আট আনা পয়সা দিতেন যে। সেই পয়সা দিয়ে আমরা সবাই মিলে রসগোল্লা খেতাম।"

মন্মথকে বকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে আর বকতে পারলাম না।

বর্ণে বর্ণে

একটি বাদামী, অপরটি কালো। দুইটিই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সতেজ এবং কচি। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা দুইটিকেই দেখিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাদামী বলিল, "আমাকেই পছন্দ করবে দেখিস"

কালো উত্তর দিল, "কি ক'রে জানলি সেটা?"

"দেখলি না আমার দিকে কেমন ক'রে চাইছিল?"

"তোর দিকে যে ভাবে চাইছিল তা আমি দেখেছি। কিন্তু তুই শুধু চাউনিটাই দেখেছিস, ঠোঁটের কোণে যে হাসিটা উঁকি দিচ্ছিল তা দেখিস নি"

উভয়ে তর্ক করিতে লাগিল।

যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন কাহাকে পছন্দ হইল খবর পাঠাইবেন।

দুই

ঠিক পাশের বাড়িতে আর একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। সে বাড়িতেও একটি বাদামী, আর একটি কালো। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা নানাভাবে দুইটিকে দেখিলেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তাঁহারাও যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে পরে খবর পাঠাইবেন কাহাকে পছন্দ হইল।

দ্বিতীয় বাড়ির বাদামী এবং কালো তর্ক করিল না। তাহারা তাহাদের অভিমত আপন আপন অন্তরেই নিবদ্ধ রাখিল।

বাদামী ভাবিল, "পছন্দ আমাকেই করবে, ওই কুচকুচে কালোকে কেউ আবার পছন্দ করে না কি—"

কালো ভাবিল, "রং আমার কালো বটে কিন্তু আমার চোখ, আমার নাক, আমার মুখের গড়ন এ সবের কি কোন দাম নেই? ওর রংটা হয় তো একটু ফিকে কিন্তু ওই থ্যাবড়া নাক, বসা চোখ, প্রকাণ্ড হাঁ কি কি পছন্দ করবার মতো?"

তিন

প্রথম বাড়িতে পছন্দ হইল কালোটিকে। কারণ শ্যামাপূজায় কালো পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম।

দ্বিতীয় বাড়িতে পছন্দ হইল বাদামীকে। কারণ যিনি তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিবেন তিনি কালো মেয়ে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না।

পক্ষী বদল

ইন্দুবালার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

ইন্দুবালা যা বলছে সেটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আমি নিজের চোখে যেটা রোজ দেখছি সেটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। জিতেনবাবুর, (মানে ইন্দুবালার স্বামীর,) স্বভাব সত্যিই বদলেছে খুব। বিলেত যাবার আগে যে জিতেনবাবুকে আমি চিনতাম তাঁর সঙ্গে সত্যিই এঁর আকাশ-পাতাল তফাত। তিনি সিগারেট দূরের কথা, পানটি পর্যন্ত খেতেন না, অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী নির্বিবাদী লোক ছিলেন, কারও সাতে-পাঁচে থাকতে দেখিনি কখনও তাঁকে। খুট্-খুট্ ক'রে নিজের কাজকর্ম করতেন, আর অবসর পেলে দাওয়ায় বসে কৃত্তিবাসী রামায়ণটি পড়তেন। রাস্তায় দেখা হ'লে মৃদু হেসে সসঙ্কোচে স'রে দাঁড়াতেন এক ধারে, যেন রাস্তায় সামনা-সামনি দেখা হ'য়ে যাওয়াটা মস্ত অপরাধ। কোন বিষয়ে তাঁকে প্রতিবাদ করতেও শুনিনি, জীবনের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ঝামেলাকে তিনি সবিনয়ে মেনে নিয়েছিলেন, সমস্ত অত্যাচার অবিচারকেও। অর্থাৎ তিনি জীবন-যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন না। জীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটা স্টেশন প্ল্যাটফর্মের যাত্রীর মনোভাবের মতো। একটু পরে ট্রেন এলেই তো চলে' যেতে হবে, প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বা প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রী-যাত্রিনীদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! যতক্ষণ ট্রেনটা না আসছে ততক্ষণ ভদ্রতা বজায় রেখে কোন রকমে গা বাঁচিয়ে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। এই ছিল তাঁর মনোভাব।

কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে এসে যে জিতেনবাবুকে আমি দেখলাম, তিনি একেবারে অন্যলোক। টিন টিন সিগারেট ওড়াচ্ছেন, ক্রমাগত পান জরদা খাচ্ছেন, হাফশার্ট প'রে বাটারফ্লাই গোঁফ রেখে একটা মোটর সাইকেলে চ'ড়ে দামড়ে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে। নেতাও হয়েছেন একটা উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের। বিলেত যাবার আগে আমি যে জিতেনবাবুকে চিনতাম তিনি সসঙ্কোচে সব কিছুই মেনে নিতেন, এ ভদ্রলোক যেন কিছুই মানতে চান না। এখানকার প্রবীণ উকিল গোলকবাবুই ছিলেন আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির

চেয়ারম্যান। তাঁকে সরাবার কল্পনাও কেউ কখনও করিনি আমরা। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি তাঁকে পদচ্যুত ক'রে জিতেনবাবু নিজেই চেয়ারম্যান হয়েছেন। যে লোক ধীর স্থির বিনয়ী নির্বিবাদী ছিল, সে যে এমন অশান্ত চঞ্চল উগ্র একগুঁয়ে হয়ে উঠতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত। এ যা ধরবে তা করবেই। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে চরিত্রের এ রকম পরিবর্তন হয় শুনেছি। গল্পে উপন্যাসে পড়েছি, সিনেমাতেও তো হরদম দেখছি অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, বোবা কথা কইছে, শয়তান দেবতা হয়ে যাচ্ছে। জিতেনবাবুও মাথায় গুরুতর আঘাতই পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে একবার তিনি গ্রামান্তর থেকে ফিরছিলেন। গাছের প্রকাণ্ড একটা ডাল ভেঙে নাকি তাঁর মাথায় পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাতও হয় একটা। জিতেনবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জিতেনবাবুর সঙ্গে ছিল জিতেনবাবুরই চাকর হারু। সে-ই দৌড়ে গিয়ে লোকজন ডেকে আনে। সবাই ধরাধরি ক'রে অজ্ঞান অবস্থাতেই বাড়িতে তুলে আনে তাঁকে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। চোখ বন্ধ, নিশ্বাস পড়ছে না, নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সবাই ভেবেছিল সে মরেই গেছে। এমন কি বিনোদ ডাক্তার পর্যন্ত। জিতেনকে খাটিয়ায় তুলে শ্মশানের উদ্দেশ্যেও নাকি যাত্রা করেছিল সবাই। পথের মাঝে এক গাছতলায় খাটিয়া নামাবার পর দেখা গেল জিতেনের হাত-পা নড়ছে, নিশ্বাস পড়ছে একটু একটু। তারপর চোখ খুলে চাইলেন। শুনেছি একটু হেসেও ছিলেন না কি! তখন সবাই আবার তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। যে আঘাত তাকে মৃতবৎ ক'রে ফেলেছিল তা যে খুবই সাংঘাতিক তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই, তাতে চারিত্রিক পরিবর্তন হতেও পারে। চারিত্রিক পরিবর্তন যে হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তার স্ত্রী ইন্দুবালা যা বলছে তা কি বিশ্বাস্য? আদালত তা বিশ্বাস করবে? আমার মনে হয় না। কিন্তু জিতেনবাবুও না-ছোড়, তিনি আদালতে কেস ঠুকে দিয়েছেন। মকদ্দমায় শেষ পর্যন্ত কি হবে তা বলা শক্ত।

জিতেনবাবুকে একদিন বলেছিলাম, "ইন্দু যখন আপনাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চ'লে গেছে তখন আপনি আবার একটা বিয়ে করুন না। আপনার যখন ছেলেপিলে হয় নি করতে বাধাটা কি। কেউ দোষ দেবে না আপনাকে"

জিতেনবাবু কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তারপর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "ইন্দুকেই আমার চাই। এর জন্য যদি সর্বস্ব পণ করতে হয় তাও করব"

ইন্দু দূর সম্পর্কের বোন হয় আমার। মরা জিতেনবাবু বেঁচে ওঠবার পরেই যে সে কোলকাতায় তার বাপের বাড়ি চলে গেছে, আর ফেরেনি। আর ফিরবেও না চিঠিতে লিখেছে। জিতেনবাবু কিন্তু ছাড়বেন না। আইনত ল'ড়ে দেখতে চান তিনি। তাঁর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আইনত যদি তিনি ইন্দুকে আনতে না পারেন, বে-আইনী উপায় অবলম্বন করতেও ইতস্তত করবেন না।

মনে করলাম নিজেই একবার কোলকাতা চলে যাই, ইন্দুকে বুঝিয়ে দেখি সে যদি আসতে রাজি হয়। আদালতে এ নিয়ে কেলেঙ্কারি করাটা সব দিক থেকেই অশোভন। ইন্দুর বাবাকে চিঠি লিখে কোনও ফল হয় নি। তিনি উত্তর দিয়েছেন, "ইন্দু তার স্বামীর ঘর করুক এটা আমারও কম কাম্য নয়। তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, কি করব বল। মেয়েকে তো আর বাড়ি থেকে দূর করে দিতে পারি না। তুমি এসে যদি বুঝিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পার আমি আনন্দিতই হব!"

একদিন চলেই গেলাম। গিয়ে দেখি ইন্দু বিধবার বেশ প'রে আছে। আড়ালে ডেকে বললাম, "ব্যাপার কি বল দেখি! স্বামী থাকতে বিধবার বেশ কেন?"

"উনি আমার স্বামী নন"

"স্বামী নন তো কে?"

"উনি বীরেনবাবু—"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে ইন্দু বললে, "আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন বীরেনবাবু ব'লে একজন ভদ্রলোক আমাকে বিয়ে করবার জন্যে খুব ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তিনি কায়স্থ ছিলেন বলে বাবা বিয়ে দেন নি! বীরেনবাবু তারপর আমাকে চিঠি লেখেন যে আমি তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি আছি কি না। লোকটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারতাম না। কড়া গোছের একটা উত্তর লিখে দিলাম। চিঠি পেয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন। আমার বিশ্বাস তারই প্রেতাত্মা আমার মৃত স্বামীর দেহে ভর ক'রে আছে।"

আমি সবিস্ময়ে ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

পাগল টাগল হয়ে যায়নি তো!

"হঠাৎ তোমার এমন আজগুবি ধারণা হল কেন?"

"এঁর চাল-চলন কথাবার্তা, চোখের চাউনি ঠিক বীরেনবাবুর মতো, আমার স্বামীর মতো একটুও নয়। তা ছাড়া আর একটা কাণ্ড যা ঘটেছিল তা শুনলে আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না"

"কি কাণ্ড?"

"গত মাঘ মাসে একদিন অনেক রাত ক'রে উনি বাড়ি ফিরলেন। ওঁর খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, আমি জেগেছিলাম খালি। আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফিরে এসে উনি বসে খাচ্ছিলেন, আমি সামনে বসে ছিলাম। খেতে খেতে হঠাৎ বললেন, আমাকে একটু পেয়ারার জেলি এনে দাও তো। জেলি ছিল ভাঁড়ার ঘরে। প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে সেই শীতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে জেলি আনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বললাম, কাল এনে রাখব। আজ গুড় দিয়ে ওই রুটিখানা খেয়ে নাও না। উনি বললেন, জেলি আমার এখনই চাই, কাল পর্যন্ত তর সইবে না। জীবনে যখনই যা চেয়েছি না নিয়ে ছাড়িনি। জান ত' কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে। আমারও যায়নি। জাস্তিভেদের ওজুহাতে বীরেন মিত্তিরকে তোমরা ঠেকিয়ে রাখবে ভেবেছিলে, কিন্তু তা যে পারনি সেটা তুমি অন্তত বুঝেছ এতদিনে"

ইন্দুর কথা শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। আপনারাও হচ্ছেন নিশ্চয়।

বললাম, "তার মানে তুমি বলতে চাও খাঁচাটা ঠিক আছে, পাখীটা বদলে গেছে?"

ম্লান হেসে ইন্দু বললে, "তাই তো মনে হচ্ছে"

কার্য্যকারণ

বৃষ্টি পড়িলে এখনও আমার পীরু মিঞা এবং কৃত্তনাথের কথা মনে পড়ে। কার্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যাঁহারা কেবল স্থূল স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু হিসাবের মধ্যে ধরিতে চান না, তাঁহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। হয়তো পীরু মিঞা এবং কৃত্তনাথের আচরণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন স্বার্থ নিহিত ছিল, বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই, কারণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

দুই

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

দুইদিন হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। মুষলধারা বৃষ্টির সহিত উন্মত্ত পবন মিলিয়া যে কাণ্ড করিতেছিল, তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। সভ্যতা হইতে বেশ কিছু দূরে (স্টেশন হইতে দশ ক্রোশ, পোস্টাপিস হইতে দুই ক্রোশ) যে গ্রামে তখন আমাদের বাস ছিল, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অকথ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একটি গাছ খাড়া ছিল না, খড়ের চাল উড়িয়া গিয়াছিল, মাটির দেওয়ালগুলি ভূশায়ী হইয়াছিল, নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট জলে কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হইয়া যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, তাহা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের চিত্তে কি ভাব উদ্রিক্ত করিত জানি না, আমার হৃদয়ে তাহা এক অপ্রত্যাশিত ভাব সঞ্চার করিয়াছিল, মনে পড়িতেছে। আমি মুগ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। বর্ষার শোভা দেখিয়া নয়, ইট, চুন, সুরকি ও সিমেন্টের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া। গ্রামের মধ্যে একমাত্র আমাদের বাড়িই পাকা। ঝড়বৃষ্টির বিপুল তাণ্ডবে সেটি অক্ষত ছিল।

আমার সেই মুগ্ধ ভাবও কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিঘ্নিত হইতেছিল। আমি একজনের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। প্রিয়ার নয়, পিওনের। তখন প্রিয়া-বিরহে ব্যাকুল হইবার বয়স হয় নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিলাম। কলিকাতায় বন্ধু ছকুকে টাকা দিয়া আসিয়াছিলাম, পরীক্ষার ফল বাহির হইবামাত্র তারযোগে যেন আমাকে জানায়। সে জানাইবে ঠিক, কিন্তু এই দুর্যোগে এক্সপ্রেস তারও কি এই সুদূর মফঃস্বলে পৌঁছিবে? পোস্টাপিস দুই ক্রোশ

দূরে, টেলিগ্রাম যদি পৌঁছিয়াও থাকে, এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া পিওন কি আসিতে পারিবে? পিওনকে অবশ্য বারবার বলিয়া আসিয়াছি, বকশিশের লোভও দেখাইয়াছি, কিন্তু যে রকম দুর্যোগ···

আর একটা কারণে আশা করিতেছিলাম যে, পিওন হয়তো আসিতে পারে। আমি এবং ওপারের ভূতনাথ এ অঞ্চলের মাত্র এই দুইটি বালকই এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিবার সুযোগ পাইয়াছি। দশ ক্রোশের ভিতর একটি লোয়ার প্রাইমারি স্কুল ছাড়া আর কোনও বিদ্যালয় সেকালে ছিল না। সুতরাং আমাদের পরীক্ষার ফল কি হয়, জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছিল, আমরা এ অঞ্চলের মান রাখিতে পারি কি না।

বাহিরের ঘরটিতে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া ছিলাম। বৃষ্টির বিরাম নাই। ভেক-কুলের আনন্দ-কলরবে চতুর্দিক মুখরিত। বাতায়ন দিয়া যতটুকু দেখিতে পাইতে-ছিলাম, তাহাতে হতাশই হইতেছিলাম। জনপ্রাণী কেহ নাই, কেবল বাতাসের বেগে সদ্যচ্ছিন্ন পত্ররাশি মাঝে মাঝে উড়িয়া আসিয়া কাদায় লুটাইয়া পড়িতেছে। ডোবার ধারে কয়েকটি বক চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে। এই দুর্যোগেও তাহাদের ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। মাঝে মাঝে ছাগলের ডাকের মতো শব্দ পাইতেছিলাম, আমাদের চাকরটা বলিল যে, উহাও ব্যাঙের ডাক।

সূর্যদেবের দেখা নাই। আকাশ মেঘময়। সকাল এবং বিকালের একই রূপ। কিন্তু সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন সে-রূপ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বাতাসের বেগ আরও বাড়িল, আকাশে আরও মেঘ ঘনাইয়া আসিল, বিদ্যুৎস্ফুরণে বজ্রগর্জনে চতুর্দিক সচকিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, বুঝি প্রলয়ের কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে।···ঠিক করিলাম বাহিরের ঘরেই শুইব। পিওনের আসিবার আশা নাই। কিন্তু যদি আসে···

তিন

গভীর রাত্রে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। জোরে শব্দ হইল। বাজ পড়িল না কি? কান পাতিয়া রহিলাম। বাহিরে বাতাস ও বৃষ্টির মাতামাতি সমানে চলিয়াছে। আবার শব্দ হইল। কড়া-নাড়ার শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাট খুলিলাম। তবে কি···

কপাট খুলিতেই কিন্তু আপাদমস্তকসিক্ত কর্দমাক্ত যে ব্যক্তিটি হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, সে পিওন নয়, পীরু মিঞা। তাহার বাঁকা নাক এবং সামনের ফোকলা দাঁত ভুল হইবার নয়। কিন্তু এ সময়ে, এই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে জমিদার জবরদস্ত খাঁর গোমস্তা পীরু মিঞাকে দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই।

"আরে খোকাবাবু তুমি বাইরে আছ, ভালই হয়েছে, তোমার কাছেই এসেছি, বড় জরুরি দরকার—"

"কি বলুন তো ?"

"এই চিঠিখানা পড়। চেঁচিয়েই পড়—"

পড়িলাম—কে একজন বিনোদ সিংহ লিখিতেছে—"মিঞা সাহেব, আদাব জানিবেন। খোদার মরজিতে আশা করি খুশমেজাজে আছেন। আপনার মনিব শেখ জবরদস্ত খাঁ আগামী শুক্রবার ফিরিবেন। তাঁহার জন্য ঘাটে প্রত্যূষে যেন নৌকা প্রস্তুত থাকে। তাঁহার হুকুমে এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি।"

চিঠি পড়া শেষ হইবামাত্র পীরু মিঞা প্রশ্ন করিলেন—"প্রত্যূষ মানে কি ?"

"প্রত্যূষ মানে ভোর"

"ভোর মানে কি ?"

"ভোর মানে সকাল"

"কি বিপদ! সকাল মানে কি! যখন পহেলা মোরগ ডাকে, তখনও সকাল, যখন দোসরা মোরগ ডাকে, তখনও সকাল। প্রত্যূষ মানে কোন্ সকাল ?"

বিব্রত হইলাম। অভিধান খুঁজিলেও এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলিবে কিনা সন্দেহ। পীরু মিঞার কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধিল। বলিয়া দিলাম—"যখন পহেলা মোরগ ডাকে তখনই প্রত্যূষ।"

"ঠিক তো ?"

"ঠিক"

"যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। জানতাম, তোমার কাছে এলেই হদিস পাব।"

"এই জন্যেই আপনি এসেছিলেন ?"

"এই জন্যেই—"

বিস্মিত হইলাম।

"এই দুর্যোগ মাথায় করে একটা কথার মানে জানতে এসেছেন !"

"কাল ঠিক 'প্রত্যূষে' যদি নৌকা হাজির না থাকে, তাহলে দুর্যোগ আরও ভয়ানক হবে। জবরদস্ত খাঁকে তুমি চেন না খোকাবাবু"

পীরু মিঞার চোখে একটা গর্ব যেন জলজল করিয়া উঠিল।

"কেন, কি করবেন তিনি ?"

"একদিন কি করেছিলেন দেখ—"

পীরু মিঞা তাঁহার বাঁকা নাক ও ফোকলা দাঁতের দিকে এমনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রহিলেন, যেন আমাকে কাহারও মহৎ কীর্তি দেখাইতেছেন।

"তখন আমারও জোয়ান বয়েস, খাঁ-সাহেবরও জোয়ান বয়েস। তোমাদের তখন জন্ম হয়নি। কুনশিয়ার মাঠে বগেরি শিকার করতে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, আমি যেন ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে হাজির হই। আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল আমার। ঠিক মুখের উপর বুটসুদ্ধ এইসা লাথি ঝাড়লেন যে—"

পীরু মিঞা বাক্য শেষ করিলেন না। ফোকলা দাঁত দুইটি আরও প্রকটিত করিয়া একটু হাসিলেন শুধু।

"কিসে ক'রে এলেন এতদূরে আপনি ?"

"মোষের গাড়িতে। হাঁটতেও হয়েছে একটু। গাছ পড়ে রাস্তাই বন্ধ হ'য়ে গেছে যে। আচ্ছা, আমি আর বসব না। নৌকোর ব্যবস্থা করতে হবে গিয়ে—"

পীরু মিঞা চলিয়া গেলেন। আমি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই কি পীরু মিঞা প্রাণের ভয়েই এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ?

আধঘণ্টা পরে আর এক কাণ্ড ঘটিল। আপাদমস্তক ভিজিয়া ভূতনাথ আসিয়া হাজির হইল। তাহার বাড়ি নদীর ওপারে। সাঁতরাইয়া আসিয়াছে !

"তুই ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিস"

"কি করে জানলি ?"

"কোলকাতার চিঠি পেলাম একটু আগে। পিওনটা সন্ধ্যের পর এল। তোর টেলিগ্রাম নিশ্চয় আসে নি। আসবে কি করে ? টেলিগ্রামের তারই ছিঁড়ে গেছে। আমি ভাবলাম, তোকে সুখবরটা দিয়ে আসি।"

"তুই ?"

"আমি ফেল মেরেছি"

ভূতনাথের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া গেল।

"আমি আর বসব না ভাই। মা ভাববে। মাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

মুচকি হাসিয়া ভূতনাথও চলিয়া গেল।

ভূতনাথের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ক্লাসের ওঁছা ছেলে বলিয়া তাহাকে ঘৃণাই করিতাম। গুণ্ডামি করিয়া বেড়ানোই তাহার কাজ ছিল। সে কেন···

কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। আজও পাই নাই।

অনেকদিন পরে পীরু মিঞার সম্বন্ধে খুব বিশ্বস্তসূত্রে আর একটি খবর শুনিয়া আরও বিস্মিত হইয়াছি। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াই নাকি পীরু মিঞার নাক বাঁকিয়াছিল, দাঁত ভাঙিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনিব জবরদস্ত খাঁ যে সত্য সত্যই জবরদস্ত, একথা সকলের কাছে সগর্বে প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে তিনি সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভবের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। প্রভু যে লাথি মারিয়া তাঁহার মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন, এই মিথ্যা কথা বলিয়া তিনি আনন্দিত হন, লজ্জিত হন না!

মহীয়সী মহিলা

ট্রেনে বেশ ভীড় ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলাম। থার্ড ক্লাশের টিকিট। আমি একটি কামরার এক কোণে অতি কষ্টে বসবার জায়গা ক'রে নিয়েছিলাম, কিন্তু আর বসবার জায়গা ছিল না। দাঁড়িয়েছিল অনেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একসঙ্গে জুটেছিলাম সেই কামরাটিতে। বাঙালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল, পাঞ্জাবী সরদার এবং আরও বহুপ্রকার ইতর অথবা ভদ্র চেহারার লোক কেবলমাত্র দেখে যাদের জাতিনির্ণয় করা অসম্ভব। পরস্পরের মধ্যে অমিল ছিল অনেক, মিলও হয়তো ছিলো। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সর্বতোভাবে একমত হয়েছিলাম। কামরায় আর যেন কেউ উঠতে না পারে। ওঠবার সম্ভাবনাও অবশ্য কম ছিল, কারণ, কামরার ডানদিকের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন একজন ভোজপুরী সিপাহী। তার মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, হাতে বিরাট লাঠি। চোখ মুখের দৃষ্টিও কমনীয় নয়। আর বাঁ দিকে দরজায় ছিলেন সরদারজি। ঘন ভ্রূ, ঘন চাপদাড়ি, গোঁফও মানানসই-রকম ঘন—মনুষ্যবেশী সিংহ একটি। প্রায় কোন স্টেশনেই কেউ উঠতে সাহস করছিল না। বড় বড় দুটো জংসন পেরিয়ে গেল, সিপাহিজি এবং সরদারজিকে দরজার কাছ থেকে একচুল নড়াতে পারলে না কেউ। সিপাহিজি এবং সরদারজির উপর সমস্ত কামরাটির ভার দিয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ দ্বারে অবশেষে শত্রু হানা দিল। স্টেশনটি খুব ছোট। সিপাহিজি ভাবতেই পারেন নি যে, এই স্টেশনে এমন একটা পল্টন এসে হাজির হতে পারে। তিনি তাই খৈনি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ বাম করতলের উপর কিছু তামাক পাতা এবং চুন রেখে দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে মর্দন করছিলেন সেগুলি। তাঁর দুটি হাত এবং মন—কোনটাই দ্বাররক্ষায় ব্যাপৃত ছিল না।

হঠাৎ বামাকণ্ঠে ভুল হিন্দিতে শোনা গেল—"রাস্তা ছোড়িয়ে না। কেবাড়িকা পাশ সংকা মাফিক খাড়া হ্যা কাহে—। হটিয়ে হটিয়ে—"

দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল একটি বলিষ্ঠা মহিলা গাড়ির হাতল ধ'রে ঝুলছেন। প্রকাণ্ড গোল মুখ, গোল গোল চোখ, চিবুকের তলায় দু' থাক চর্বি, নাকে নথ,

নখে টানা। মাথার কাপড় খুলে পড়েছে, আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে পিঠের উপর। সিঁথিতে জলজল করছে সিঁদুর।

"হটিয়ে হটিয়ে। ট্রেন বেশী নেই থামে গা, গার্ড সাহেব ঝণ্ডি দেখাতা হ্যায়। হটিয়ে না—"

সিপাহিজি এ মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন একটু। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং মুখভাবে একটু কোমলতার আমেজ পাওয়া গেল।

"কুছভি জঘা নেই হ্যায় মাইজি—"

"আপ খোলিয়ে না, হটিয়ে না, হামলোক খাড়া হোকে যাঙ্গে। ই ট্রেন ফেল করনে সে বাবুজিকা নোকরি চলা যাগা, কাল জয়েনিং তারিখ হ্যায়—হটিয়ে—"

"মগর—"

মহিলা আর অধিক বাক্যব্যয় না ক'রে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়লেন। সিপাহিজি আর তাঁকে বাধা দিতে সাহস করলেন না। তাঁর ঈষৎ অনুকম্পাও হয়েছিল বোধ হয়। কারণ পরে জানা গেল তিনিও ছুটির শেষে কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। ছুটির শেষে কাজে জয়েন না করলে যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে তা তাঁর জানা ছিল।

কপাটটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে ভোজপুরী পুরুষপ্রবরকে স্থানচ্যুত ক'রে ভদ্রমহিলা সমস্ত দরজাটি দখল ক'রে হাঁক দিলেন—"ওরে তোরা আয়, মণ্টু তুই আগে ওঠ, জিনিসপত্তরগুলো গোছাতে হবে, ঘণ্টু কোথা গেলি; শণ্টু মিণ্টু কানটু বানটু—আয় না তাড়াতাড়ি সব ওঠ, হাবলি ওদিকে হাঁ ক'রে দেখছিস কি, উঠে পড় না টপ ক'রে—"

পিল পিল ক'রে নানা বয়সের একদল ছেলেমেয়ে উঠে পড়লো। সরদারজি একটু এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—"ইয়ে তো জুলুম কি বাত হ্যায় মাতাজি,—"

"আপ চুপ রহিয়ে"

ভদ্রমহিলার ধমকে সরদারজি থতমত খেয়ে স'রে দাঁড়ালেন।

"এই কুলি, ইধার ইধার—"

তোরঙ্গ, স্যুটকেস, হোলড্-অল্, নানা আকারের পুঁটলি, ঝুড়ি গোটা দুই, প্রকাণ্ড একটা টিফিন কেরিয়ার, গোটা চারেক হাঁড়ি, গোটা তিনেক প্রকাণ্ড তরমুজ, একটা বঁটি, তা ছাড়া একটা মুখ বাঁধা প্রকাণ্ড বস্তা…! প্রকাণ্ড কুঁজো!

ভদ্রমহিলা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, কুলিরা এইসব তুলতে লাগল।

"আওর দো কুলি উপর চলা আও, চীজ বাস্ সরিয়াকে রাখ্খো। ওই উধারকা বাঙ্ক মে সব এলোমেলো হোকে হ্যায়, পহলে সব ঠিক কর দেও।…"

যে সব যাত্রীর জিনিস উক্ত বাঙ্কে ছিল তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুসলমান মৌলভীটি তাঁর ফেজ আর বদনাটি নামিয়ে নিজের কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করলেন। ফেজটি শিরে ধারণ করলেন, বদনাটি অঙ্কে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও তাঁর ছোট ট্রাঙ্কটি কোথায় রাখবেন ভেবে বিব্রত বোধ করছিলেন, ভদ্রমহিলা আশ্বস্ত করলেন সবাইকে।

"সব ঠিক করকে গুছায়কে রাখ দেঙ্গে, আপলোক ঘাবড়াইয়ে নেই—"

সত্যিই দেখা গেল বাঙ্কের জিনিসপত্রগুলো অগোছাল হয়েই ছিল। গুছিয়ে রাখাতে অনেকখানি জায়গা বেরোল। আমাকে সম্বোধন ক'রে ভদ্রমহিলা বললেন, "খোকা, তুমি বাবা পা-টা গুটিয়ে বোস তো, হ্যাঁ,—ওইখানে হোল্ড্-অল আর বোরাটা থাক, বেঞ্চি দুটোর ফাঁকে। ওগুলোর উপরেই তুমি পা রাখ। তুমি বাবা পা দুটো একটুখানি সরিয়ে নাও,—হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে"—

তারপর তিনি কামরাটার চারদিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"এই কুলি ট্রাঙ্কঠো ওই উধারকা কোণা মে লে চলো। দোনো বেঞ্চকা বিচ মে দে দেও। আপলোক মেহেরবানি করকে পয়ের মোড়কে বৈঠিয়ে—। শণ্ট, মণ্ট্, ট্রাঙ্কের উপর গিয়ে ব'স তোরা।"

শৌখীন পাঞ্জাবী-গায়ে নীল চশমা পরা একটি ছোকরা কোণে বসে' বসে' পা দুলিয়ে দুলিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। সে একটু ঝেঁজে ব'লে উঠল—"আপনি এমন ভাবে হুকুম করছেন যেন আমরা আপনার চাকর—"

"চাকর কেন হতে যাবে বাবা। তোমরা সব ছেলে। পা-টা গুটিয়ে বস লক্ষ্মীটি। হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেল। সবাইকেই তো যেতে হবে। সব গুছিয়ে দিচ্ছি দেখ না, কারও কোন কষ্ট হবে না—। হ্যাঁ, ওই কোণে কুঁজোটা থাক।"

তারপর একটু হেঁট হয়ে দেখলেন বেঞ্চির তলাগুলো সব খালি আছে কি না।

"মিণ্টু, পুঁটুলিগুলো আর তরমুজ তিনটে এই বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দে। আর ঘণ্টুকে কোলে ক'রে তুই ওই কোণটায় চলে যা। ও বাবা পাগড়ি, মেয়েটাকে একটু দাঁড়াতে জায়গা দাও বাবা—"

একটি ক্রিশ্চান দম্পতি একটু বেশী জায়গা নিয়ে একধারে বসেছিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের সাহেবী পোষাক দেখে তাঁকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে নি। ভদ্রমহিলা করলেন। তিনি কানটু আর বানটুকে চালান করে দিলেন সেদিকে।

"তোরা ওই দিকে গিয়ে মেম-মাসীমার কাছে বস গিয়ে। হাবলিও যা—"

ক্রিশ্চান দম্পতি আপত্তি করলেন না। ভ্যানিটি ব্যাগ, অ্যাটাশে কেস প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গা ক'রে দিলেন শিশুগুলির। ক্রিশ্চান ভদ্রমহিলা তো বানটুকে কোলেই বসিয়ে নিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকেরও শিভ্যলরি উদ্বুদ্ধ হ'ল সহসা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে' বললেন—"আপ ভি বৈঠ যাইয়ে। মায় খাড়া রহুঙ্গা।"

"না না, তুমি বাবা ব'স। আমার বসবার দরকার নেই। ওগো, তুমি কোথা গেলে, এইবার তুমি ওঠ না, ওঠ, ওঠ, ট্রেন আর কতক্ষণ দাঁড়াবে"

আড়ময়লা পাঞ্জাবীপরা ঝোলা-গোঁফ শীর্ণকান্তি একটি ভদ্রলোক উঠলেন।

"তুমি একটু জায়গা ক'রে নাও কোথাও—"

"ইউ কাম হিয়ার, দেয়ার ইজ্ এনাফ্ স্পেস—"

ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

আমি তখন ভদ্রমহিলাকে আহ্বান করলাম—"আপনি এসে এই হোল্ড্-অল্টার উপর বসুন। আমি পা গুটিয়েই বসছি—"

"তোমার কষ্ট হবে না তো বাবা"

"না, কিছুমাত্র না"

"আজকালকার ছেলেরা সোনার চাঁদ সব। হীরের টুকরো"

ভদ্রমহিলা এসে গদীয়ান হয়ে হোল্ড্-অল্টির উপর অধিষ্ঠিতা হলেন। সব যখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে তখন ভদ্রমহিলার নজরে পড়ল মিণ্টু ঘণ্টুকে কোলে ক'রে কোণঠাসা হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি—"মিণ্টু তুই এসে এখানে ব'স। আমি দাঁড়িয়ে থাকছি"

"আপনি দাঁড়াবেন কেন। ওদের জায়গাও ক'রে দিচ্ছি। শেঠজি আপ খোকা লে হাটকে বৈঠিয়ে।"

শেঠজির মুখে একটু বিরক্তভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তবু তিনি স'রে বসলেন একটু। এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হ'ল না। ওইটুকু জায়গায় খন্টুকে কোলে নিয়ে মিন্টুর বসা অসম্ভব। শেঠজির পাশেই বসেছিল একটি সাঁওতাল যুবক। বলিষ্ঠ কালো চেহারা, চোখে মুখে নির্ভীক সরলতা, একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। তার দিকে চাইতেই সে উঠে পড়ল এবং দরজার ধারে গিয়ে সরদারজির পাশে দাঁড়াল। খন্টুকে কোলে নিয়ে মিন্টু বসল তার জায়গায়। সকলেরই স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল। আমি একটু বিস্মিত হচ্ছিলাম ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে। এত ছোট স্টেশনে দু'তিন মিনিটের বেশী দাঁড়াবার কথা নয়। কুলীরা পয়সা নিয়ে নেমে গেল। তবু ট্রেন ছাড়ে না। হঠাৎ দেখলাম স্টেশনমাস্টার মশাই পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখছেন।

"ও, আপনারা এইখানে উঠেছেন বুঝি। জিনিসপত্তর সব উঠে গেছে? বড্ড 'রাশ' আজকে। ট্রেন তাহলে ছাড়ি?"

একমুখ হেসে ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ, আমরা গুছিয়ে বসেছি। অনেক কষ্ট দিলুম বাবা আপনাকে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

"না, না, কষ্ট আর কি।"

নেমে গেলেন স্টেশনমাস্টার।

তারপরই শোনা গেল—"অল্ রাইট, অল্ রাইট"

ট্রেন ছাড়ল।

ভদ্রমহিলার এই অতর্কিত আক্রমণে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন দু' একজন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সব ঠিক হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন—"ওই টিফিন কেরিয়ারটা বাঙ্ক থেকে নামিয়ে দাও তো বাবা—।"

নামালাম।

বিরাট টিফিন কেরিয়ার। বেশ ভারী।

টিফিন কেরিয়ারটি খুলে ফেললেন তিনি। দেখলাম, প্রচুর লুচি, তরকারি আর রসগোল্লা রয়েছে। ভদ্রমহিলা দু'খানি ক'রে লুচি, একটু ক'রে তরকারি এবং একটি

রসগোল্লা প্রত্যেককে বিতরণ করতে শুরু করলেন। দু' একজন নিতে আপত্তি করলে, কিন্তু কিছুতেই তিনি শুনলেন না।

"হায় আপকো মা-ই হ্যায়, লিজিয়ে, লজ্জা কি বেটা—" সকলকেই নিতে হল। নীল চশমী-পরা ছোকরাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—"তোমাকে বাবা একটু বেশী ক'রে দিচ্ছি। ছেলেমানুষ তুমি, দু'খানিতে তোমার কি হবে—"

ট্রেন চলছে। মুখও চলছে প্রত্যেকের। সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই আমরা সবাই আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে উঠলাম তাঁর এবং তিনিও অসংকোচে হুকুম করতে লাগলেন সকলকে। কোনও স্টেশনে আমরা তাঁর পান কিনে দিলাম, একটা জংসনে সকলকে চা খাওয়ালেন তিনি। সিপাহিজি আর একটা স্টেশনে রসগোল্লা কিনে আনলেন আবার। সর্দারজি কুঁজো হাতে ছুটলেন জল ভরতে। চানাচুরওয়ালার কাছ থেকে চানাচুর কিনে আবার বিতরণ করতে লাগলেন তিনি সকলকে। সেই গরমে, সেই ভীড়ে, থার্ডক্লাস গাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল।
